ভারত-প্রদক্ষিণ।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত।

"আপনার চিন্তা গোপন রাখা অপেক্ষা প্রস্তর
মূর্ত্তির নিকট প্রকাশিত করা শান্তিপ্রদ

বেকন্।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, দি ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট্ হইতে
শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

দেওঘরের

ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান প্রবাসী

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু

যুগল বন্ধুকে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ

করিলাম।

বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়ান্তরে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকায় রচনা সমাপ্তির আশা সুদূরে গিয়াছে। ভারতী, নব্যভারত, বান্ধব, নবজীবন, দাসী ও সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি দৈনন্দিনলিপি সহযোগে একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। আপনার কার্য্য যে স্বয়ং না দেখিতে পারে, তাহার গ্রন্থে ওড্র স্থলে ঔড্র ইত্যাদি ভ্রম সহজে প্রবেশলাভ করিবে ইহা নিশ্চিত। নব-বার্ষিকী ও ভারতী হইতে গৃহীত কোন স্থান উদ্ধৃত করার চিহ্ন বর্জ্জিত হইয়াছে, সে জন্য আমি অনুতাপ করিতেছি। অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে বার চতুষ্টয়ে ভ্রমণ শেষ করি। বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য পথে পুনর্ব্বার তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, এই কারণে প্রদক্ষিণের ভাব উপলব্ধি হয়। উৎকল ভ্রমণ প্রথমে সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তদ্বৃত্তান্ত দক্ষিণাপথ দর্শনান্তে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীকাশী
ফলগূৎসব
সম্বৎ ১৯৫৯

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ওড্র (সাহিত্য)	১
বারাণসী (নব্যভারত)	১৬
হিমালয়	২২
কাশ্মীর (নব্যভারত)	২৮
পঞ্জাব	৩৭
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৪৪
কলিকাতা	৫১
রাজপুতানা	৫৩
আবুজী (ভারতী)	৫৬
গুর্জ্জর (ভারতী)	৬৪
মুম্বই (বান্ধব)	৭৪
মহারাষ্ট্র (নব্যভারত)	৯৫
দেবগিরি (নবজীবন)	১২১
জব্বলপুর	১৩০
সুরধুনী (ভারতী)	১৩২
কেরল (দাসী ও সাহিত্য)	১৪৯
স্মারক লিপি	১৮৩

ভারত-প্রদক্ষিণ।

উড়ু।

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে ঝড় উঠিল, নাবিকেরা পাল নামাইয়া ফেলিল। প্রকৃতির করাল মাধুরী দেখিবার জন্য জাহাজের ছাদে উঠিলাম। জাহাজ খুব দুলিতেছে, শরীর যেন ঘুরিয়া আসিল। আমি ক্যাবিনে গিয়া শয়ন করিলাম। ক্রমে বমন আরম্ভ হইল। শরীর অসাড় হইয়া গেল। একজন কহিল, 'পথ হইতে হাত খানি সরাইয়া লও।' আমি কহিলাম, 'তুমি সরাইয়া যাও।' আমার হাত নাড়িবার ক্ষমতাও ছিল না। প্রভাতে সমুদ্রের কি প্রশান্ত, মহান মধুর মূর্ত্তি! কবির বর্ণনায় চিরকাল সাগরের নাম শুনিয়া আসিতেছি, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। রবি-কিরণে নীলাম্বু তর তর করিতেছে। সমুদ্রের শ্যাম-রূপ দেখিতে কি সুন্দর!

"সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিক্কণ দেহা।"

অধিক-ক্ষণ সে সুখ সম্ভোগ আর ঘটিল না। নদীত্রয়সহযোগে উৎপন্না ধমরা ও সাগরের ভিন্ন বর্ণের মিলনরেখা দৃষ্টিগোচর হইল। চাঁদবালীতে বৈতরণী পার হইয়া গো-যানে উঠিলাম। পদমপুরে একটি দেউল আছে, নির্ম্মাতা দবিসা ভবানী শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার যেন বংশ না থাকে। কারণ, উত্তরাধিকারী থাকিলে সে দেবালয়ের স্বামী বলিয়া অভিমান করিতে পারে। মহানদী বা মহারালুকা পার হইয়া, কটক নগরের মধ্য-দেশ অতিক্রম করিয়া, কাটযুড়ীর পর পারে পান্থনিবাস পাওয়া গেল। সহর দেখিতে পুনর্ব্বার এ পারে আসিতে হইল। জলপ্লাবন বা শত্রুভয়নিবারণের

জন্য নির্ম্মিত মর্কট কেশরীর প্রাচীর অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বার-বাটী নামক দুর্গ কেবল ভগ্ন উপল ও ভগ্ন-গৃহের স্তূপ। কিন্তু এখনও তথায় বৃটীশ প্রহরী পদচারণা করিতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তৈলঙ্গী তন্তুবায়দিগের একটি পল্লী দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গালা ও তৈলঙ্গের মধ্যস্থলে উড়িষ্যা। উড়িয়ারা দেখিতে দক্ষিণী, ব্যবহারে বাঙ্গালী। উৎকল-রাজগণ হয় ত দক্ষিণী ছিলেন; বাঙ্গালার সেন-রাজ-বংশের সহিত কর্ণাটের সংস্রব আছে। এই কটকের পথে দ্রাবিড়-সভ্যতা বঙ্গে যায়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুম্ফ-হীনতা ও গোক্ষুরশিখা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশে একটি শ্রেণীর নাম আছে দাক্ষিণাত্য বৈদিক। যে তীর্থ পার হইয়া ভ্রমণে আসিয়াছিলাম, সে পথে না গিয়া আর এক ঘাটে পার হওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ভাবিলাম ঠিক যাইতেছি, কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়াও পরিচিত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। আমার দিক্‌নির্ণয়ে ভ্রম হইয়াছিল। প্রবল বাতাস বহিতেছে। অন্ধকারাবৃত বিজন পথে লতা গুল্ম গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। কদাচিৎ লোক সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; একজনও জিজ্ঞাসিত হইয়া আলাপ করিল না। সঙ্গে টাকা আছে,—লোকে আগন্তুক জ্ঞান করিবে, এজন্য কাহাকেও উদ্দিষ্ট স্থান জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অবশেষে, অবিশ্বাস অপেক্ষা লোকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল। দুইটি লোক মৎস্য ধরিতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে সহায় করিয়া, যেখানে আমার ভৃত্য দ্রব্যজাত লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলাম। তাহাদের সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না, অথচ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সহিত মমতার ভাব উদিত হইতেছিল।

প্রত্যূষে "মোকাম সহর" হইতে যাত্রা করিলাম। দুই প্রহরের সময় একাম্র-কাননের মন্দিরসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। অসংখ্য দেবালয়, যেন "কাশী"। মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভিখারী মহাপাত্রের সহিত কোটী-লিঙ্গেশ্বর দর্শন করিতে গেলাম। ভুবনেশ্বর দেখিতে প্রায় আমাদের কাশীর কেদারেশ্বরের মত; তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। বাসায় আসিয়া পাণ্ডার প্রদত্ত কড়মাবায়ী ধূপ আহার করা গেল। ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন অতি কদর্য্য। পাণ্ডা আমার সহিত এক পাত্রে আহার করিতে চাহিলেন।

প্রসাদগ্রহণে বর্ণভেদজনিত স্পর্শ-দোষ গ্রাহ্য নহে। কেন্দ্রাপাড়ায় দধি-বামন অর্থাৎ জগন্নাথদেবের প্রসাদসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। তৈলঙ্গে শেষগিরিস্থিত বেঙ্কট-রামের অন্নপ্রসাদভক্ষণের সময়ও পর্ব্বতের উপর বর্ণভেদ স্বীকার করা হয় না। দ্রাবিড়ে বিষ্ণু কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম ও মধুরাপুরীস্থ মীনাক্ষীর মন্দিরে ব্রাহ্মণে ভাতের পিণ্ড বিক্রয় করে। সুতরাং শ্রীক্ষেত্রে অন্ন বিচার নাই দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কল্পনা করা অনাবশ্যক। যেমন নদী শুষ্ক হইলে তাহার দুই এক খানি বাঁক "বামড়" রূপে অবশিষ্ট রহিয়া যায়, তদ্রূপ প্রাচীন প্রথা লোপ পাইলে, তাহার দুই একটি চিহ্নও ঘটনা বিশেষ বা স্থান বিশেষে পরিস্ফুট থাকে। হিন্দু আর্য্যগণ পূর্ব্বে এক বর্ণ ছিলেন, অদ্যাপি কাশ্মীরে তাহাই আছে। মানব-জাতির আদিম অবস্থায় বিবাহ ছিল না। এখনও মলয় প্রদেশে নাই। মনুতে এক স্থানে লিখিত আছে;—ব্রাহ্মণ যেমন বিবিধ কুক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবেন না, তেমনি শূদ্রান্নও গ্রহণীয় নহে। আবার আর এক স্থানে বলিতে-ছেন;—শূদ্র সূপকার্য্যাদি করিয়া ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। এই সকল দেখিয় বোধ হয়, পূর্ব্বে সকল জাতির সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল। এক্ষণেও স্থানবিশেষে নৈবেদ্যস্থলে সেই প্রাচীন প্রথা রক্ষিত হইতেছে।

ভাল করিয়া ভুবনেশ্বর দেখিবার সময় না থাকায়, রৌদ্রের তাপ হ্রাস না হইতেই দেউলে প্রবেশ করিতে হইল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গঠন কাশীর পঞ্চক্রোশী যাত্রাপথের চারি শত বৎসরের পুরাতন কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়। কিন্তু উপস্থিত মন্দিরের তুল্য বিশাল ও উচ্চ আয়তনের মন্দির পশ্চিম-উত্তর-ভারতে নাই। দক্ষিণাপথের পক্ষে ইহা বিশাল নহে; কেবল প্রারম্ভ-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। দেবালয়ের প্রস্তর নিতান্ত কোমল। ভোগ-মণ্ড-পের পাথরকে মৃত্তিকা বলিলেও ক্ষতি নাই। এজন্য বহু স্থান খণ্ডিত হওয়ায়, স্থূল চূর্ণের আবরণে বদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১২৯১ বৎসর হইল, রাজা ললাটেন্দু-কেশরী ইহা নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিন্দে একটি করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তরের বৃহৎ বিগ্রহ আছে। বিগ্রহগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কোনও কোনটি এমনি সুকুমার যে, রক্তমাংস-গঠিত বলিয়া ভ্রম হয়। পূর্ব্ব কালের মনুষ্য ব্যবহৃত বিবিধ বেশ ভূষা ক্ষোদিত করিয়া মূর্ত্তি সজ্জিত করা হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে অসংখ্য দেব দানব ও মানবের লীলা ক্ষোদিত; তাহা সুগঠিত বটে,

কিন্তু অনেকগুলি কুরুচিসম্ভূত তান্ত্রিক ভাবের প্রতিকৃতি দেখা গেল। তন্ত্র-শাস্ত্র কামরূপ হইতে হিমালয়ে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিলিত হয়। কলিকাতার পরপারে স্থিত ভোটের বাগানে, ভুটান হইতে আনীত বৌদ্ধ মহাকালের মূর্ত্তিও কুরুচিকল্পিত। সেই জন্যই কাশীর নেপালী খাপ্রার কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরে অশ্লীল আসনের অভাব নাই।

প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বর হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বনের মধ্য দিয়া পথ। স্থানে স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী পাষাণ আহরিত হইতেছে। দুই এক জন বন-চর কাষ্ঠভার বিক্রয়ের জন্য সহরের দিকে যাইতেছে। দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতপুঞ্জের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। সুন্দর বট-তরুর মূলে যান রাখিয়া, শ্যামদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়া স্নিগ্ধ কূপোদকে স্নান করিয়া, তাঁহার সহিত পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ক্ষুদ্র বলিয়াই হউক, অথবা খণ্ড জাতির আবাস বলিয়াই হউক, এই গিরির 'খণ্ড-গিরি' নাম হইয়াছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত; উদয়-গিরি ও অস্ত-গিরি। আমরা প্রথম উদয়-গিরিতে আরোহণ করিলাম। কতিপয় সোপান আরোহণ করিয়া দেহলী পাওয়া গেল, তাহার পার্শ্বে একটি গৃহ। গৃহ, অলিন্দ, স্তম্ভ সমস্তই পর্ব্বত বক্ষে ক্ষোদিত। ঐরূপ আর কতকগুলি ঘর বা কন্দর অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। একেবারে অদ্ভুত রসে ডুবিয়া গেলাম। পর্ব্বত খুদিয়া প্রকাণ্ড চতুঃশাল দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। গত কল্য চক্রক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া যে সুখ হইয়াছিল, তাহা পরিমিত; কিন্তু এ দর্শনসুখের তুলনা নাই। আমার উৎকলে আগমন সার্থক বোধ হইল। শ্যামদাস কহিলেন, এই বাটীর নাম "রাণীহংসপুর"। পর্ব্বতের অন্যান্য প্রকোষ্ঠ দেখিয়া হস্তীগুম্ফায় (গুহা) উপনীত হইলাম। অনেক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপির আকার দেখিয়া এই অদ্ভুত স্থাপত্যের বয়ঃক্রম বুঝা গেল। মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের অনুশাসনলিপির অক্ষরে ইহা লিখিত। সুতরাং এই কীর্ত্তি অন্যূন ২০০০ বৎসরের প্রাচীন; ইহার ভাষা পালি।

'দেবানাম্ পিয়ে: প্রিয়দর্শি রাজা সবত ইচ্ছতি
সবে পাষণ্ডবংসেয়ু সবেতে সয়মঞ্চ ভাবসিদ্ধিম চ ইচ্ছতি।" *

* দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শিং রাজা সর্ব্বতঃ ইচ্ছতি সর্ব্বে পাষণ্ডবংশজাঃ সর্ব্বত্র সংযমঞ্চ ভাবসিদ্ধিন্ চ ইচ্ছতি (?) "রাজা প্রিয়দর্শি ইচ্ছা করেন, অন্যমতাবলম্বিরাও সুখে থাকুক।"

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কথোপকথনে কি প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হইত, অশোকের পর্ব্বতক্ষোদিত লিপি পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্ত হয় না। প্রাকৃতের নামান্তর অপ ভ্রংশ আর্ষ, অর্থাৎ কোনও স্থানের মুনিগণের ভাষাকে পুরাণ প্রাকৃত কহে। স্থানবিশেষে মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও শৌরশেনী নামে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। মাগধীর অপর নাম পালি; সমগ্র ভারত-ব্যাপী অশোকের লিপি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম পাঞ্জাবী পালি, দ্বিতীয় উজ্জয়িনী পালি, তৃতীয় মাগধী পালি ইহার অবান্তর ভেদ এই যে, কোনও ভাগে র-কারের স্থানে ল-কার, কোথাও বা বিভক্তিতে এ-কারের পরিবর্ত্তে ও-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। খণ্ড-গিরি হইতে ধৌলি পর্ব্বত দেখা যায়; কিন্তু ধৌলি মাগধী শ্রেণীতে ও খণ্ড-গিরি উজ্জয়িনীর বিভাগে স্থান পাইয়াছে। ধৌলি উড্র দেশের অন্তর্গত; খণ্ড-গিরির নিকট হইতে কলিঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে।

আর কয়েকটি গুহা দেখিয়া আমরা অস্তগিরির শিখরে আরোহণ করিলাম। সাতবখুরা দালান নামক একটি প্রশস্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি,—অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ক্ষোদিত রহিয়াছে। শাক্য-মুনি শেষ বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও মায়া-দেবী সুতের সহিত অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কোনটি কাহার প্রতিকৃতি, আমি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়তলে কয়েকটি ক্ষোদিত প্রকোষ্ঠ ও কটকের একজন শ্রাবক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি আধুনিক জৈন মন্দির আছে। মাঘী সপ্তমীতে এখানে উৎসব হইয়া থাকে। বাবাজী এক স্থান দেখাইয়া কহিলেন, এ দেবসভা। তিন খানি পাষাণ উপর্য্যুপরি রাখিয়া দাও, রাত্রের মধ্যে দেউল হইয়া যাইবে। আমি তাঁহাকে দেখাইলাম;—অনেকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছে,—দেখা যাইতেছে; অথচ দেউল হয় নাই। অস্ত-গিরি হইতে অবরোহণ করিয়া আকাশ-গঙ্গা ও রাধাকুণ্ড দেখিলাম। বৃষ্টির জলে খাত পূর্ণ হয় বলিয়া বুঝি আকাশ-গঙ্গা নাম হইয়াছে।

আহারান্তে ভৃত্যকে রাণীহংসপুরে মছলন্দ ও মাদুর রাখিয়া আসিতে কহিলাম। যেখানে রাজাধিরাজ ও রাজমহিষী শ্রমবিনোদন করিতেন, আমারও আজ সেই স্থানে বিশ্রাম! প্রদর্শক শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। পুরাকালে কি প্রণা-

নীতে বাটী নির্ম্মিত হইত, গ্রন্থ-পাঠে তাহা ঠিক বুঝা যায় না। শুণাক্ষরে বুঝাইতে অনেক ভ্রম থাকিয়া যায়। এই পর্ব্বতক্ষোদিত ভবন ইদানীন্তন আদর্শের বাটীর মত, কিন্তু স্তম্ভের আকারে প্রভেদ আছে। বাড়ীটি পূর্ব্বদ্বারী, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে অলিন্দ-সংযুক্ত দ্বিতল গৃহশ্রেণী; পূর্ব্ব দিকে এখন কিছু নাই, বোধ হয় তোরণ ছিল। প্রবেশের মুখে দক্ষিণে বামে দুইটি ঘর উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত; উহার দ্বার প্রস্থের দিকে, ইহার সংলগ্ন একটি করিয়া দেহলী আছে; তন্মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী ক্ষোদিত হইয়াছে। উঠানের প্রায় শেষ সীমায় দরদালানের প্রহরীর পার্শ্বে বাটীর পশ্চিম দিকের গৃহশ্রেণী। চত্বরের নিম্নে উঠানের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছাদহীন দুইটি গৃহ; তাহার বেধ তিন হস্ত। এই গৃহ কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, বুঝিতে পারিলাম না। আধুনিক বাটীতে উঠানে এ প্রকার ঘর থাকে না। তাহার পর দুই হস্ত প্রশস্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চত্বর। চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি গৃহ, উহার দ্বার দক্ষিণে ও উত্তরে। তাহার পর বাটীর পশ্চিম দিকের গৃহশ্রেণী; ঐ গৃহাবলীর সম্মুখে চৌতারা আছে, কিন্তু বারাণ্ডা নাই। দ্বিতীয় তলে পশ্চিম ও উত্তর দিকে ঘর আছে; তাহার সম্মুখে প্রশস্ত দালান। দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় তলে গৃহ নাই। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় তলের গৃহসম্মুখস্থ দালানের স্তম্ভগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তদুপরি যে ছাদ ছিল, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমার পথ-প্রদর্শক পাণ্ডা কহিলেন,—পাঁচ ছয় বৎসর হইল, কথিত স্তম্ভগুলি ইংরাজেরা উড়াইয়া দিয়াছে। রাণী-হংসপুরের সমুদায় গৃহের বহিঃপ্রাচীরে খিলানের উপরে ও পার্শ্বে বিবিধ মনোরম বৃক্ষ, লতা ও নরনারীর ভাব শুদ্ধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। একটি শিল্প অত্যন্ত কৌতুকাবহ। শিল্পী টাঙ্গী দিয়া কবিতা খুদিয়াছেন। উহার প্রতি গতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি, হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। একদল মত্তহস্তীর সহিত কতকগুলি সুন্দরী যুদ্ধ করিতেছেন। একটা হস্তী শুণ্ড তুলিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক অবলা একগাছি ফুলের মালা লইয়া হস্তীকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিয়া মালা ছুঁড়িতেছেন। কেবল তাহাই নয়, অপর এক নারী সেই শূরসুন্দরীকে পলায়নের জন্য হস্তধারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। এক সুকুমারী একটি সনাল কমলকোরক গ্রহণ করিয়া হস্তী তাড়না করিতেছেন। আর কয়েক জন

রিক্ত-হস্তে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ অগ্রসর হইতেছেন, কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। এই সুন্দরীসমাজে একটি সাহসী পুরুষ নারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্র একগাছি ছড়ি। এই বাটীর চিত্রাবলী দেখিলে পূর্ব্বকালের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। পুরুষে মাল-কোঁচা করিয়া কাপড় পরিয়াছে। তাহার উপর কটীদেশে আর একখানি বস্ত্রখণ্ড বাঁধা আছে; তাহার অগ্রভাগ কোঁচার মত ঝুলিতেছে। গায়ে কাপড় নাই। মস্তকে দীর্ঘ কেশ ধম্মিল্ল করিয়া বস্ত্রখণ্ডসহযোগে আবদ্ধ। মুখে শ্মশ্রু বা গুম্ফ নাই। গলায় হার, হস্তে বলয়, কাহারও বা কর্ণে কুণ্ডল। স্ত্রীজাতি চিরকালই অলঙ্কারপ্রিয়। পাষাণ-চিত্রেও সুন্দরীদের হার, চিক, কর্ণভূষা, বলয় ও মল দেখিলাম। স্ত্রীলোকের বস্ত্রপরিধানপ্রণালী ঠিক পুরুষের মত না হউক, তাহার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মাল-কোঁচার উপরে একখানি দু-মুখা কিম্বা এক-মুখা কোঁচা ঝুলান। ঊর্দ্ধ অংশুকের বিশেষ ব্যবহার দেখিলাম না। মস্তকে নানাবিধ বেণী। চিত্রে ঢালের যে প্রতিকৃতি আছে, তাহার আকার সীঁতি-মৌড়ের মত। ছত্র-দণ্ডের গায়ে এক বৃহৎ সূত্রপুচ্ছ আলম্বিত। পুরুষের পদে পাদুকা নাই। এতগুলি মূর্ত্তির মধ্যে কেবল একটি দ্বাররক্ষকের জানুদেশ পর্য্যন্ত বৃহৎ উপানৎ দ্বারা আবৃত দেখিলাম। এই পাদাবরণ ধরিয়া গ্রীক শিল্পাধিপত্য কল্পিত হইতে পারে।

অগ্রে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইলে হেতু বা উদাহরণ সংগ্রহের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। সকল বিষয়েই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সত্য নির্ণয় করিতে হইলে, বিশ্বাসী না হইয়া সন্দিহান হওয়া উচিত। হৃদয় নিরপেক্ষ করা আবশ্যক। ন্যায়াবয়বের পথে উঠিয়া সাধারণ ভূমির স্বরূপ উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা না পাইলে সম্পাদ্য বাহির করা অবিধেয়। ফর্গুসন সাহেব স্থির করিয়াছেন, ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যা গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত। রাজেন্দ্র-লাল মিত্র মহাশয় অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা অপরাহ্ণে ফিরিলাম। কপিলেশ্বরের পুরোহিতগণ অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া কিছু দক্ষিণা লইলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রে হরেকৃষ্ণপুর পৌঁছি। সাগরের মন্ত্র আবার শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পুরীতে পৌঁছিয়া মন নিরতিশয় উদাস হইয়া উঠিল। আমার এই প্রথম

বিদেশে আসা। যাহার সঙ্গলিপ্সা প্রবল নহে এবং আত্মাভিমান অধিক, তাহার পক্ষে বন্ধুতা ঘটা কঠিন, ও তাহা ঘটিলেও সহজে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মানুষ মানুষের পক্ষে যে কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা আমি এখন উপলব্ধি করিতেছি। পথে যদি একটি বাঙ্গালী দেখি, তাহার সহিত বিনীত ভাবে আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। একদিন কোনও অপরিচিত ব্যক্তি কহিল,—মহানন্দ বাবু আপনার খোঁজ করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী কহিলেন,—তুমি বাজারে গিয়া থাক, সে বাবুটি—যিনি সে দিন আসিয়া কহিয়াছিলেন, তাঁহার এখানে কাহারও সহিত পরিচয় না থাকায় বড় কষ্ট হইতেছে—তাঁহাকে কি দেখিতে পাও? তিনি এত দিন হয় ত চলিয়া গিয়াছেন, নহিলে আসিতেন। ইহাতে আমার অকারণ-দুঃখপীড়া-গ্রস্ত মন মাতৃস্নেহের শীতলতা অনুভব করিল। দেশভ্রমণে নিত্য নূতন স্থান নূতন বিষয় পাওয়া যায় বলিয়া আহ্লাদিত হইবার কথা, কিন্তু সঙ্গে একখানি রঙ্গিন কাচ থাকা চাই। তাহার মধ্য দিয়া না দেখিলে কিছুই বিচিত্র বোধ হইবে না। সেই রঞ্জিত উপনেত্রের নাম অনুরাগ। অনুরাগ না থাকিলে কিছুই সুন্দর দেখায় না। আমরা নিত্য যাহা দর্শন করি, তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারি না; এজন্য তাহাতে মন মুগ্ধ হয় না। চেষ্টা করিয়া যদি নবীন প্রদেশে উপনীত হওয়া যায়, আগ্রহের সহিত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অতি সামান্য বিষয়টিও বিশেষ সুন্দর বোধ হইবে; তেমন মনোরম আর যেন কোথাও মিলিবে না। আমি বিদেশে আসিয়া রঙ্গিন কাচ খানি যখন হারাইয়া ফেলিয়াছি, তখনই সুখের পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

সমুদ্রের সহিত সম্ভাষণ করিবার জন্য প্রত্যহ সৈকতপুলিনে বিহার করিতে যাইতে হয়। কর্কটী দৌড়িয়া গর্ত্তে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া তরঙ্গের সহিত আমিও নামিয়া যাই। ঊর্ম্মি মস্তক অবনত করিয়া যেমন বেলাভূমিতে উঠিতে থাকে, আমি অমনি ছুটিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি। কিন্তু ফেনিল নীলাম্বু পাদুকা স্পর্শ করিয়া ফেলিল দেখিয়া হাসি আসে।

সমুদ্র-কূলে সিকতা-পল্লীর একখানি বাঙ্গালায় বাবু নবীনচন্দ্র সেন বাস করেন। "পলাশীর যুদ্ধের" মোহনলালের উক্তি তাঁহার মুখে কেমন শুনায়, জানিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। কবির নিবাস পূর্ব্ব-বঙ্গে, ইহা জানাইয়া আরম্ভ করিলেন;—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।
এ বিষাদ অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে ভারত-ভূমি যেও না তপন;
উঠিলে কি ভাব এঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া আজ! ডুবিছ এখন?
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন।"

ইত্যাদি।

পাঠকালে কবিকে অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শ্রোতা ও পাঠক উভয়েই রসোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গেলেন। গ্রন্থকার কহিলেন;—ভূদেব বাবু এই অংশ শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাব্যামৃতরসাস্বাদ যে সংসার-বিষবৃক্ষের দুইটি সরস ফলের অন্যতর, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। অতঃপর নবীন বাবুকে এক বিবাহসভায় দর্শন করি। তিনি যেন জীবন্ত কাব্য হইয়া বসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে বিবিধ ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। গঞ্জম হইতে আগতা তৈলঙ্গী অন্নপূর্ণা একটি সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ গাইয়া পৈশাচী ভাষায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সারঙ্গী তবলা ও মন্দিরার সহিত ব্যাসপাইপের সঙ্গত হইতে লাগিল। একজন বাদক কণ্ঠ-সঙ্গীতে যোগ দিয়া আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সভাভঙ্গ হইলে কর্ত্তার বাটীতে মহাপ্রসাদগ্রহণের জন্য যাইবার প্রস্তাব হইল। আমি তীর্থের কোনও প্রকার অনুষ্ঠানে রত নহি, সুতরাং সর্ব্বজনস্পৃষ্ট অন্ন-ভোজন করা অনুচিত বিবেচনা করিতেছি। বর শিবিকারোহণে যাত্রা করিয়াছেন। সম্মুখে এক থাল তণ্ডুল রক্ষিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে তৈলঙ্গী নটী পাল্কী ধরিয়া যাইতেছে। এটি বোধ হয়, পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধ্র-দেশীয় প্রথা। সামান্য লোকের বরের অগ্রে তরবারী খেলিতে খেলিতে যায়। স্নানযাত্রার দিন দেউলে পূর্ব্বপরিচিত কবিকে পাইলাম। তিনি রক্ত-পুষ্প-মালা শিরে ধারণ করিয়াছেন। একটি দালান দেখাইয়া কহিলেন, "ইহার নাম মুক্তি-মণ্ডপ।" কিন্তু কেহ যেন দীনবন্ধু বাবুর 'মুক্তিমণ্ডপ' জ্ঞান না করেন।

শ্রীমন্দির হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের মূর্ত্তি বাহির হইল। সুদর্শন ও সুভদ্রা নরস্কন্ধে মণ্ডপোপরি গমন করিলেন। জগন্নাথ বলরাম হাঁটিয়া যাইবেন। তাঁহাদের কটীদেশে ডুরী বন্ধন করিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করা হইতেছে। পশ্চাৎ ভাগে অন্য ব্যক্তি সাম্য রক্ষা করিতেছে। ইহাতে দারুব্রহ্ম লম্ফ প্রদান করিয়া চলিতেছেন। এই গমনের নাম পাণ্ডববিজয়। যাত্রীগণ তাঁহার অঙ্গ হইতে শ্রীকাপড়া (লোহিত-বস্ত্র) ছিন্ন করিয়া লইতেছে। স্থানে স্থানে আরত্রিক হইল। ধুনুচী দণ্ড-ধারী অগ্রে যাইতেছে। ভেরী তুরীর শব্দে জন-কোলাহল মিশ্রিত হইয়া প্রকাণ্ড দেব-পুরী কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। ছত্র ও আড়ানি উৎসবের সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। পঞ্চাশ প্রকারের সেবক সমভিব্যাহারে যাইতেছে। একজন দুই খণ্ড স্থূল বেত্র হস্তে ধারণ করিয়া শব্দ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি? উত্তর ;—এও এক প্রকারের সেবা। স্নান-মঞ্চ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়াছে। দেবালয়ের অভ্যন্তরস্থ সর্ব্ব-তীর্থ নামক কূপোদক এক শত আট স্বর্ণবালুকানির্ম্মিত কলসে পূর্ব্ব দিন অধিবাসের সহিত উত্তোলিত হইয়াছিল। অদ্য তাহা ষোড়শোপচারে পূজিত হইল। মুদীরথ উপস্থিত আছেন। শিরোবস্ত্রবিহীন উড়িয়াদের দলে তাঁহাকে শ্বেত শিরস্ত্রাণ ও ধবল অঙ্গরক্ষাপরিহিত দেখিয়া সহজেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে। রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে যাত্রা উৎসবাদি কর্ম্ম ইঁহা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে মুদীরথ উক্ত জল দ্বারা জগদীশকে স্নান করাইলেন, অমনি হুলহুলা শব্দ উপস্থিত হইল। ভক্তগণ পুষ্প উৎক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সকল পাণ্ডারা জলাভিষেক করিল। বৈরাগীরা চামর ব্যজন ও গান করিতে নিযুক্ত।

দ্রাবিড় প্রণালী অনুসারে জগন্নাথদেবের মন্দির দুইটি উচ্চ প্রস্তর প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকারের দৈর্ঘ্য ৪৫০, প্রস্থ ৪৩৬ হস্ত। ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গম নামক দেবালয় সপ্ত প্রাকার মধ্যে স্থাপিত। উচ্চ-দেউলের বিশেষত্ব তাহার পিরামিডাকার মণ্ডপ ও অধিকপ্রসারযুক্ত আমলাশীলার দ্বারা পরিচয় দিতেছে। কাশী-অঞ্চলের দেবালয়ে চূড়ার নিম্নে আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পল বিশিষ্ট শিলাখানি এত প্রশস্ত হয় না। মন্দিরের আকৃতির ন্যায় দেশকালভেদে স্তম্ভের আকারগত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোথাও চন্দ্রকাণ্ড, কোনও স্থানে ব্রহ্ম বা শিবকাণ্ড পাওয়া যাইবে। জগন্নাথের অংশরপিণ্ড ও ভোগমণ্ডপের, দ্রাবিড়

গোপুরমের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মাদুরার মীনাক্ষী সুন্দরেশ প্রভৃতির স্বস্তিক মন্দিরের ন্যায় ইহার প্রধান দ্বার পূর্ব্ব দিকে। তৎসন্নিকটে পদ্ম-ক্ষেত্র (কণারক) হইতে আনীত অরুণস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সিংহদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পতিতপাবন দর্শন করিয়া দ্বাবিংশতি সোপান উঠিতে হয়। এখানে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। দক্ষিণে স্নানমঞ্চ, বামে একটি কুণ্ড ও কাশীবিশ্বেশ্বরের মন্দির! পাকশালায় বৃত্তাকার মহানসের উপর মৃণ্ময় স্থালী (আটিকা) গুলি এক শ্রেণীর পশ্চাৎ আর এক শ্রেণী উর্দ্ধে সজ্জিত করিয়া অন্ন পাক হইতেছে। আনন্দবাজারে ক্রেতৃগণ স্বাদ গ্রহণ করিয়া ভোগ মনোনীত করিতেছে। দ্বিতীয় প্রাচীরাভ্যন্তরে শতাধিক দেবগৃহ; নৃসিংহ, সূর্য্য, শিব, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী সকলেই আছেন। সেবার আয়োজনের জন্য পক্ষি-ঘর, ভেটমণ্ডপ, চুনা-কুটাঘর প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ দেখা যাইতেছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে বহুধ্বজশোভিত চূর্ণপ্রস্তরগ্রথিত নানা ক্ষোদিত মূর্ত্তি-বিভূষিত বৃহৎ দেউল; দৈর্ঘ্য ১০০, প্রস্থ ৫৫, উর্দ্ধে ১২৬ হস্ত। মন্দিরটি চারি অংশে বিভক্ত; গর্ভস্থান, অংশরপিণ্ড জগমোহন ও ভোগমণ্ডপ। গর্ভস্থানে রত্নবেদী নামক কৃষ্ণ প্রস্তরবেদীতে শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করেন। মন্দিরের সম্মুখীন হইলেই বৃহৎ অশ্লীল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মস্তক অবনত করিতে হয়। ৬৯২ বৎসর অতীত হইল, বীরশ্রীগজপতি গৌড়কর্ণাটউৎকলবর্গেশ্বর অনঙ্গ-ভীম ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি কর্ণাটী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট হইতে ঔড্রে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তমলুক পর্য্যন্ত ইঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল, এজন্য ইঁহাদিগকে বাঙ্গালার গঙ্গাবংশীয় নৃপতি বলা হয়।

স্বহস্তে পাক করিয়া, আহারান্তে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জগমোহনের কৃষ্ণ-পাষাণ-তলে শয়নোপবেশন করিয়া যাপন করি। কত পাপী তাপী শ্রীমন্দিরে আসিতেছে। জগদীশ-সন্নিকটে আত্মনিবেদন করিয়া হৃদয়ের ভার অপনয়ন করিয়া যায়। যুক্তকর গরুড়মূর্ত্তির সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া গর্ভগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক একজন ঔড্রীয় "এ কলা শ্রীমুখ" সম্বোধন করিয়া করযোড়ে স্বকীয় কষ্ট জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পরিচারকের উচ্চ অথচ গম্ভীর আহ্বানধ্বনি বিমানের সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ তরঙ্গায়িত করিতেছে। কেহ বা যাত্রিদলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত। অন্নস্থালী-বাহকগণ মুখ বন্ধ করিয়া রন্ধনশালা হইতে

প্রচ্ছন্ন পথে ভোগমণ্ডপে অবিরত ভার আনয়ন করিতেছে। লক্ষ লোক হইলেও প্রসাদের অকুলান হইবে না। বল্লভভোগ, খিচুড়ীধুপ, সন্ধ্যাধুপ ও বড়সিঙ্গার-ধুপের অপেক্ষা দ্বিপ্রহর-ধুপের আয়োজন অধিক। পুরী সহর বা উপকণ্ঠের কোনও অধিবাসীর বাটীতে ভোজ হইলে, ভোগ পাইবার জন্য তথা যাত্রীকগণও রন্ধনশালায় অগ্রে দ্রব্যজাত পাঠাইয়া থাকেন। এত অন্নের ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। শ্রীক্ষেত্র এ বিষয়ে অতুল। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভের শয়ানমন্দিরে অন্নক্ষেত্র ইহা অপেক্ষা হীন। অক্ষয়বটতলে বন্ধ্যাগণ অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া বসিয়া আছে ;—যদি ফল পড়ে, ভক্ষণ করিবে। দেবস্থানের চতুর্দ্দিকে পুরদ্বার আছে। উত্তরের অন্তর দ্বার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে আটিকা-বন্ধনের ঘর, উহার নাম বৈকুণ্ঠ। এ জন্য তাহা দ্বিতলের উপর স্থাপিত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র তরুতলে দারুব্রহ্মের পুরাতন কলেবর পচিতেছে। যবন-আক্রমণে বারদ্বয় শ্রীমূর্ত্তিকে নূতন কলেবর ধারণ করিতে হইয়াছিল। রক্তবাহুর আক্রমণকালে জগন্নাথ ভূ-গর্ভে প্রোথিত হন। কালা পাহাড় নামধেয় মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণজাতীয় ব্যক্তি চিতা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দাহ করে।

জগন্নাথদেবের পুরী যেমন দক্ষিণী আদর্শে নির্ম্মিত, সেবকের মধ্যে তেমনি মান্দ্রাজী দেবালয়ের কঞ্চনী এখানে দেবদাসী নাম গ্রহণ করিয়া উৎসবকালে নৃত্য গীত করিয়া থাকে। জগন্নাথের চন্দন-যাত্রা মান্দ্রাজী উৎসব। সে দেশে যেমন ক্ষুদ্র ভোগমূর্ত্তিকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়, এখানেও সেই ব্যবস্থা। জগন্নাথের প্রতিনিধির নাম মদনমোহন রামকৃষ্ণ নৃসিংহ ও দোল-গোবিন্দ। সুভদ্রার স্বর্ণনির্ম্মিত শ্রী ও রৌপ্যনির্ম্মিত ভূ-দেবী প্রতিনিধিত্ব করেন। সুভদ্রা বলিলে কৃষ্ণের ভগিনী বুঝায়, এজন্য তিনি জগন্নাথের ভগিনী উল্লিখিত হন ; কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধির নাম যখন লক্ষ্মী পাইতেছি, তখন যুগ-ভেদে সুভদ্রাকে জগন্নাথের বনিতা কহিতে হয়। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় প্রতি-মূর্ত্তি গুলিকে বিমান আরোহণ করাইয়া নরেন্দ্র নামক সরোবরে লইয়া গিয়া থাকে। বিংশতি দিবস তড়াগ মধ্যে বারিপরিবেষ্টিত গৃহ কিম্বা নৌকায় দেবতা অবস্থিতি করেন। অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড় দেশে শৈব বা বৈষ্ণব দেবালয়ের সম্মু-খীন হইলেই, বিগ্রহের জলবিহার-উৎসবের জন্য উক্তপ্রকারের টেপ্পকোলম্ অর্থাৎ সরোবর এবং অভিযানের জন্য একখানি উচ্চ রথ দৃষ্ট হইবে। অতএব

জগন্নাথের রথযাত্রার সাদৃশ্য দেখিবার জন্য আমাদিগের ফাহিয়ানের সহিত খোটানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এবং বৌদ্ধ দন্তোৎসবই রথযাত্রা, এরূপ বলিবার আবশ্যক নাই। মাদ্রাজী রথের গঠনপ্রণালী বৃন্দাবনের শেঠের কুঞ্জের তোরণ বা গোপুরম সদৃশ। রথগুলি সম্পূর্ণরূপে খোদকারীতে পরিপূর্ণ। বহু দেবদেবীর লীলা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অশ্লীল চিত্রেরও অভাব নাই।

এক্ষণে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তিকে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নামক বৌদ্ধযন্ত্র বা স্তূপত্রয়ের অনুকরণ বলা অন্যায় বিবেচনা করিতেছি; সত্য বটে, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বৌদ্ধদেবালয় শৈব বা বৈষ্ণব দেবতার আশ্রয় হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য কি? বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিজাতীয় নহে, তিব্বত চীনের অধিবাসীকে হিন্দু বলিতে পারা যায় না, এ জন্য এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগকে হিন্দুর সহস্র প্রকার সম্প্রদায়ের অন্যতর বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ মত এই পদের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম কথাটি প্রচলিত হওয়ায়, বিষম ভ্রমের কারণ হইয়াছে। ইহাতেই হিন্দুর দশাবতারে বুদ্ধের নাম শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। আমাদের দেবতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈদিক, পৌরাণিক ও গ্রাম্য। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অধুনা পৌরাণিক শ্রেণীর অন্তর্গত দেখা যাইতেছে। আমার বোধ হয়, এই মূর্ত্তিত্রয় কলিঙ্গ দেশের পূর্ব্বতন গ্রাম্য দেবতা। নিকটবর্ত্তী জনপদের দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবগণ কি সাক্ষ্য প্রদান করেন, সাদৃশ্যের জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত।

মনর-স্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা।—বটবৃক্ষমূলে অতি ক্ষুদ্র গৃহে অসম্পূর্ণ অবয়বের এক খানি প্রস্তরের মূর্ত্তি, মুখে সিন্দূর মাখান, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বসন, ইঁহার নাম পচুম্মা, ব্রাহ্মণেতর জাতিতে ইনি রোগোপশমনের জন্য অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নীচ জাতি ইঁহার পূজারী। মৃণ্ময় ঘোটক, হস্তী ও দানবের মূর্ত্তি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া মনর-স্বামীর সম্মুখে রক্ষিত হয়। কোনও স্থানে দীর্ঘাকার ভীষণদর্শন রঞ্জিত পিশাচ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। মনর-স্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মাও ভূতযোনি। কিন্তু ইঁহারা বলি গ্রহণ করেন না। বল, সেম, ধয়দ ও মৃত্যু নামক অনুচর পিশাচের জন্য বলির ব্যবস্থা আছে। মরিমা ও পুতলিমা বলি গ্রহণ করেন। কোথাও কাষ্ঠের কুঁদা দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে।

জগন্নাথ-স্বামী ও তাঁহার ভগিনী সুভদ্রা।—ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রেরিত বিদ্যাপতি নীলগিরিনিবাসী বসু-শবরের গৃহে বাস করিয়া নীলকন্দরে বটবৃক্ষ-মূলে চণ্ডাল কর্তৃক পূজিত নীলমাধব দর্শন করেন। বসুশবরের পুত্র দৈতাপতি হইতে সেই বংশীয় লোকেরা, এক্ষণে দৈতা এবং পতি, এই দুই পৃথক্ উপাধি ধারণ করিয়া, জগন্নাথের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দৈতা এখনও শবর-জাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গরাগ করে। পতি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে। অঙ্গরাগকালে তাহার দ্বারা পূজাকার্য্য সমাধা হয়। শবর-শব্দ-বোধক শোয়ার-নামধারীগণ বলভদ্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। শোয়ার বড় পাকশালায় বাসন রক্ষা করে। শোয়ার রন্ধন ও মহাশোয়ার পিষ্টক প্রস্তুত ও ভোগ বহন করিয়া থাকে।

উল্লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, নিম্নলিখিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।

(১ ব্রাহ্মণ যে দেবতার পুরোহিত নহেন, নীচ জাতি যাহার পূজক, তাহাকে গ্রাম্য দেবতা কহিতে হইবে।

(২) গ্রাম্য দেবতার অধিষ্ঠাত্রী প্রায়শঃ ভূতযোনি, এজন্য মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

(৩) শবরের দেবতা যখন বিষ্ণুত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার ভগিনীকে সুভদ্রা নাম দেওয়া হইল! অপর সহচরটি বলভদ্র নামে আখ্যাত হইলেন। বৈষ্ণবগণ যুগলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকে, অতএব কিছু কাল পরে সুভদ্রাকে কৃষ্ণের বনিতা করিয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু নামের মধ্যে একটা রহস্য রহিয়া গেল। মূর্ত্তিতে গ্রাম্য ভাব লোপ পাইল না।

ভাস্করবিদ্যায় আদিম অবস্থায় ক্ষোদিত অবয়ব বিকটাকার হইতে পারে। পেরু দেশের টিটি-কাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াগুয়ানেকোর প্রস্তরক্ষোদিত নৃমুণ্ডের চিত্র দর্শন করিয়া একটি শিশু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"বাবা, ইহা কি জগন্নাথের মুখ?" দ্রাবিড় দেশে বৃহৎকায় অসুরের ব্যাঘ্রদানবসদৃশ রঞ্জিত মুখশ্রী দর্শন করিলে কলিঙ্গের ব্যাঘ্রদানব জগন্নাথ সহসা স্মৃতিপথে উদিত হন। জগন্নাথের গুহ্য নাম দধিবামন। ছত্রপতি শিবাজি ভোঁসলেবংশীয় নাগ-পুরাধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে, বৃটিসরাজ জগন্নাথের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয়

ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের উত্তেজনায়, তাঁহাদের উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক হওয়ায়, খুরদার রাজাকে মন্দিরের ভার দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি নরহত্যাপরাধে সেই রাজবংশীয় চলন্তি-বিষ্ণু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন। জগন্নাথের সেবাদিকার্য্যে বার্ষিক দ্বাত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে। রথ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কার্য্যে পুরুষোত্তমের মঠধারী মহন্তেরা উপকরণসামগ্রী প্রদান করিয়া থাকে। ঐ কার্য্যের জন্য জগন্নাথের ভূসম্পত্তির ন্যায় মোহন্তেরা জমিদারী ভোগ করিতেছেন। একবার পপরিয়ামঠের মোহন্ত নূতন কলেবর উপলক্ষে নিজ ব্যয়ে অযোধ্যা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেণে তের শত রামানন্দী বৈরাগীসমভিব্যাহারে পুরী যাইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে ভারতীয় সমস্ত উদাসীন সম্প্রদায়ের মঠ আছে। পুরীতে মোহন্ত ও পাণ্ডা প্রধান অধিবাসীর মধ্যে গণ্য।

বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব জন্য রথস্থ বামন দর্শন করিতে পাইলাম না। সামুদ্রিক পীড়ার ভয়ে বাষ্পীয় তরণী আরোহণ করিতে ইচ্ছা হইল না। গরুড়-ধ্বজ, পদ্ম-ধ্বজ ও লাঙ্গল-ধ্বজ রথ নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া, দোলমণ্ডপসাহী হইতে রাণীগঞ্জের দোতলা গো-শকট আরোহণে স্থলপথে যাত্রা করিলাম। কটকের পর বিরূপা পার হইয়া নূতন পথ আরম্ভ হইল। নীলগিরি শ্রেণীর বরুণী পাহাড়ে মেঘ ভ্রমণ করিতেছে। কর্থূয়া তীরে শকট পার করিবার জন্য নৌকার প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য শিক্ষা হইল। শ্রীক্ষেত্র হইতে কলিকাতার দূরত্ব ১৫০ ক্রোশ। বালেশ্বর অর্দ্ধ পথে অবস্থিত। রাজা সুখময়ের সতপথে অন্ধ ও মহা-ব্যাধিতে গলিতপাদ ব্যক্তি একাকী পুরুষোত্তম চলিয়াছে।

সুবর্ণরেখা নদী উৎকলের উত্তর সীমা। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে দৃষ্ট হইতেছে, পুরুষেরা দীর্ঘকেশ ধারণ করে না। জলেশ্বরে বাঙ্গালীর ন্যায় কর্ত্তিত কুন্তল দেখা দিল। কাহারও শিখা আছে। দাঁতন অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ বাঙ্গালীর মত চুড়ি পরিয়াছে। অনেকের হস্তে শঙ্খ-পরিহিত। শঙ্খের অনুকৃতি পিত্তল খাড়ুর ব্যবহার প্রায় ত্যক্ত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ হইল। স্থলপথে না আসিলে দেশের সন্ধি নয়নগোচর হইত না। উড়িয়া যে কেমন শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালীত্ব লাভ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি হইত না। দাঁতনবাসীরা আপনাদিগকে মধ্য-

দেশী কহে। এখানে পাঠশালায় একবেলা উড়িয়া, অন্য বেলা বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয়। উড়িয়া বর্ণমালা তেলুগু অক্ষরের ন্যায় গোলমাত্রা বিশিষ্ট, এবং উভয় লিপি তালপত্রোপরি লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। উড়িয়া বর্ণমালার উ-কার এবং ঠ ড ঢ তেলুগু, এবং অপর বর্ণের সহিত বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। উড়িয়া ঠ-কার অবিকল পালি অক্ষর, উহা সহিত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। কলিঙ্গ অন্ধ্রদেশের পারিপার্শ্বিক; এ জন্য পুরী বিভাগের ঔড্র নারী সীমন্তে সিন্দুর প্রদান করে না, এবং ধড়ার কচ্ছ লুকাইয়া সেই শাড়ীর দ্বারা উড়িয়া ঘের দিয়া থাকে। বালেশ্বরের উত্তর হইতে বস্ত্রপরিধান ক্রমে বাঙ্গালী রকম হইয়া আসিতেছে। দাঁতন হইতে যোজনদ্বয় অন্তরে বিহ্বচটিতে আসিয়া দেখি, পরিচ্ছদাদি একেবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে, ভাষা উড়িয়াই আছে। কিন্তু দুই একটি বাঙ্গালা শব্দ ও ভঙ্গী ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মকরামপুরে তদ্বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাষা বাঙ্গালা, অথচ দুই একটি উৎকল শব্দের ব্যবহার হইতেছে।

বারাণসী।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

১২৮৬ সালে কাশীধাম রাজমন্দিরঘাটস্থ যজ্ঞশালায় শ্রীযুক্ত বালশাস্ত্রী সোমযাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিয়া সাহ্লাদে নববস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলাম। এতদিনে আমার বহুকালপালিত একটী আশা পূর্ণ হইল। এই যাগের সার্দ্ধপক্ষব্যাপী অনুষ্ঠান আমি প্রথম হইতে দেখিতে পাই নাই, তন্নিবন্ধন পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়াছে, তাহা অন্য দর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইল। তদ্দিন-সাধ্য ক্রিয়ার অবসানে ঋত্বিক্‌গণ আহবনীয় অগ্নিকুণ্ড-সমীপে বসিয়া প্রশান্তভাবে যখন সামগান করিতে লাগিলেন, তখন আমার বোধ হইল, যেন আমি বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গিয়া পড়িয়াছি। সেই কালের গৃহ, মণ্ডপ, রথ, আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই যেন আমার সম্মুখে বিদ্যমান। সেই ঋষিগণ আমার সম্মুখে বসিয়া সামগান করিতেছেন। বেদি নির্ম্মাণ

করিবার জন্য ঋত্বিক্‌গণ স্বয়ং যখন কাষ্ঠের প্রহরণ লইয়া ভূমি সমতল করিতে লাগিলেন, তখন ঠিক সেই বৈদিক কাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেন এখনও লৌহের ব্যবহার মানুষে তত শিখে নাই. বা লৌহ সুপ্রাপ্য হয় নাই, অথবা শ্রম বিভাগ হইয়া নানা ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয় নাই। যিনি ঋত্বিক্‌, তিনি স্থপতি এবং তাঁহাকেই তক্ষার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইতেছে। আর্য্য-জাতির শৈশব অবস্থা যেন উত্তীর্ণ হয় নাই। সভ্যতা উপস্থিত হয় নাই।

যজমান শ্রীমৎ বালশাস্ত্রী ও তাঁহার পত্নী সদা যজ্ঞশালায় বিদ্যমান। যজমান পত্নীর মাথায় কাপড় নাই। মস্তকের কিয়ংদেশ ক্ষৌমসূত্র নির্ম্মিত রক্তবর্ণ জাল দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাচীন কালে যে অবরোধ-প্রথা চলিত ছিল না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল। বালশাস্ত্রী বৃদ্ধ, কিন্তু পত্নী যুবতী। দ্বিতীয় পক্ষের সংসার। দক্ষিণাপথের কঙ্কন-প্রদেশ-অধিবাসী চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ জাতির বর্ণ গৌর ও শরীর সুগঠিত, ইহাতেই যজমান-পত্নীর সৌন্দর্য্য অনুমিত হইতে পারে। পত্নীর পাঠ্য মন্ত্র তিনি স্বয়ং বলিতে লাগিলেন, এবং দেখিলাম, তিনি বেদ বুঝেন। যেখানে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে সুপুত্র কামনা করা হইতে লাগিল, সেই স্থলে তিনি হাসিতে লাগিলেন ও ঋত্বিক্‌ও হাসিতে লাগিল। যজ্ঞকালে মধ্যে মধ্যে যজমান-পত্নী বেদানা ও দুগ্ধ খাইতে লাগিলেন। যজমানকেও খাইতে দেখিয়াছি। ঋত্বিকেরাও অংশু খাইয়া থাকেন। অগ্নিচয়ন অতি চমৎ-কার ব্যাপার। একখানি কাষ্ঠের উপরিভাগ কিয়ৎ পরিমাণ কাটিয়া একটা গর্ত্ত করা আছে, তদুপরি তুরপুনসদৃশ একটা কাষ্ঠদণ্ড বসাইয়া তাহার মাথায় আর একখানি অরণি রক্ষা করিয়া রজ্জু দ্বারা মধ্যবর্ত্তী দণ্ড তাড়না করা হইতে লাগিল। ইহাতেই অধঃ অরণিতে অগ্নি জন্মিল। সেই অগ্নি বেদীবিশেষে দেওয়া হইল। কয়েকটা ছাগ আনিয়া নানা অনুষ্ঠানের পর বধ করিবার জন্য গুপ্তস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। শুনিলাম, ছাগের মুখে সুপারি পুরিয়া, যাহাতে শব্দ করিতে না পারে, এমন ভাবে ধরিয়া রাখিতে হয় এবং গোয়ালাতে প্রহার করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে; কিন্তু সেখানে কি হইল, জানি না। বহুক্ষণ বিলম্বে কাষ্ঠিকাতে মাংস সংলগ্ন করিয়া অধ্বর্য্যু আসিলেন। তাহাতে ঘৃত দিতে লাগিলেন, ও বেদির অগ্নিতে পাক হইতে লাগিল। ঠিক যেন কাবাব প্রস্তুত হই-তেছে। পরে তদ্দ্বারা হোম হইল। তাহার পর যজমান, তাঁহার পত্নী ও ঋত্বিক্-

গণ শেষভাগ অতি সন্তর্পণে কণামাত্র আহার করিলেন। পঞ্চদ্রাবিড়েরা যদি মদ্য বা মাংস ভোজন করেন, তিনি জাতিচ্যুত হইবেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া বলিয়া তাহার ব্যতিক্রম হইল। সোমাভিষবের দিন কাশীরাজ যজ্ঞ দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে একখণ্ড কণ্ডিত সোম আনিয়া দেখান হইল; দেখিতে যেন সজিনা খাড়ার মত। কাশীতে কয়েক জন মহারাষ্ট্রের বাটীতে সোম পাওয়া যায়। তাঁহারা টবে গাছ বসাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে পত্র জন্মে না। বেদে উক্ত হইয়াছে, পর্ব্বতের শিখরভাগে পাষাণ-সন্ধিতে সোম-বল্লীর জন্ম। তাহার অন্যথা হইয়া গৃহে উৎপন্ন হওয়ায়, বোধ হয় পত্রোদ্‌ভেদ হয় না। অথবা ইহা সে সোম নহে, অনুকল্পমাত্র। সোমরসহরণ সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। সকল অপেক্ষা যে বেদি বৃহৎ, তাহাই সোম আহুতি লইবার অগ্নি বেদী। যজ্ঞে পৃথক্ কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য বহু ঋত্বিক্ আছেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলে একত্রে বেদীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেকে সোমরসপূর্ণ পাত্র অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত গ্লাস গ্রহণ করিয়া বার বার হোম করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ ঋত্বিক্‌গণ সেই পাত্র মুখে সংলগ্ন করিয়া সোমপান করিতে লাগিলেন। তাহা দ্বারা বার বার হবন চলিতে লাগিল। অন্যান্য বস্তু দ্বারা হবন হইলে পর, শেষ ভাগ ঋত্বিক্‌গণ গ্রহণ করেন; কিন্তু ইহা মাদক দ্রব্য, এখানে তত বিলম্ব অসহ্য। এক দিকে হবন অন্যদিকে স্বয়ং পান হইলেই হইল না, সেই পাত্র পর্য্যন্ত চলিতেছে। দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঋষিগণ কেমন মাতাল ছিলেন। মণ্ডির রাজা বিবিধ বস্ত্র ও এক থাল রৌপ্য মুদ্রা অভিনন্দনপত্রসহ সমারোহের সহিত বাদ্য বাজাইয়া উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় যজ্ঞকালে সংস্কৃত মাত্র কহেন, কিন্তু এক্ষণে মুদ্রা-বাহককে হিন্দিতে রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইল। বালশাস্ত্রী অসাধারণ পণ্ডিত; সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা; বেদ ও ব্যাকরণ উত্তমরূপ জানেন। উক্ত মণ্ডিরাজের অনুরোধে কাশীর সংস্কৃত রাজ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা ত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র গ্রহণ করেন। সেই জন্যই এক্ষণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইলেন। অগ্নিহোত্রী না হইলে যজ্ঞ করা চলে না। কাশীতে কোন কোন রাজা আসিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং পারেন না, একজন অগ্নিহোত্রী দেখিয়া তাঁহা দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করান।

যজ্ঞের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যজুর্ব্বেদ সংহিতায় এইরূপ আছে। যজ্ঞশালা প্রবেশ। যজমানের মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন। স্নান। ক্ষৌম বস্ত্র (শণ বা অতসী নির্ম্মিত) পরিধান। আপাদ মস্তক নবনীত মর্দ্দন। অঞ্জন ধারণ। উভয় হস্তে মুষ্টিসম্পন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা। যজমান ও তৎ পত্নীর উপবেশনার্থ কৃষ্ণাজিন। মেখলা গ্রহণ। মেখলায় নীবি বন্ধন। উষ্ণীশ ধারণ। উত্তরীয় বসনের দশাতে কৃষ্ণবিষাণ বন্ধন। ঔডুম্বর দণ্ড গ্রহণ। ঋত্বিক্‌গণকে যজ্ঞানুষ্ঠান আদেশ। আচমন। অ-মৃণ্ময় পাত্রে সকলের দুগ্ধ পান। শয়ন। প্রবুদ্ধ হওয়া। যজ্ঞশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুশা-তৃণে স্বর্ণ খণ্ড বন্ধন। গো বা ছাগ বিনিময়ে সোমক্রয়। ক্রীত সোম চারিভাগ করণ। মস্তকের উষ্ণীষ চতুর্গুণ করিয়া সোমবল্লী গ্রহণ। সোম মস্তকে করিয়া শকটে রক্ষা। অশ্ব বা বৃষভদ্বয় দ্বারা শকট চালন। সোম-বাহী শকট যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলে আহ্লাদসূচক মৃগ বলি। আসন্দিতে সোম স্থাপন। সোম পঞ্চবিংশতি অংশে বিভাগ। (অগ্নিচয়ন) একখণ্ড সোম বেদিতে গ্রহণ। অরণীদ্বয়‌মন্থন করতঃ অগ্নি প্রকাশ। মথিত অগ্নিসহ আহ্বনীয় অগ্নি যোগ। আহুতি। ব্রত গ্রহণ। (সোমাভিষব) সোমবল্লী সকলে জলসেক। সোম ছেঁচন। তিন দিনে, তিন আহুতি। (উত্তর বেদি নির্ম্মাণ), নানা স্থাপত্য কর্ম্ম। (হবির্দ্ধান ক্রিয়া) সোম শকট রক্ষার্থ যে স্থানে মণ্ডপ প্রস্তুত হইবে, তথায় হবির্দ্ধান অর্থাৎ সোমবাহী শকট লইয়া যাওয়া। যজমান-পত্নী কর্ত্তৃক শকটের অক্ষ-ধুর সিক্ত করা। খুঁটি পুতিবার জন্য ভূমি খনন। চাল দেওয়া। (উপরব) গর্ত্ত করা। হস্ত মার্জ্জনা। (ঔডুম্বর প্রয়োগ) সদোমণ্ডপের জন্য গর্ত্ত করা। তাহার চতুর্দ্দিকে যব বপন। ঔডুম্বরী প্রোথিত করা। ছদি আরো-পণ। কুট্যাবদারণ বা চাল ছাওয়া। (ধিষ্ণ্যা প্রকরণ) নানা ধিষ্ণ্য প্রস্তুত করা। হস্ত দ্বারা সদোমণ্ডপ বা সভামণ্ডপ মার্জ্জিত করা। দ্বারপ্রদেশস্থিত স্তম্ভাদি ধৌত করণ। ঋত্বিগভিমন্ত্রণ। পৃষদাজ্য হোম। গ্রাব, দ্রোণ, কলশ ও সোম পাত্র রক্ষা। কৃষ্ণাজিনের উপর চর্ম্ম বদ্ধ সোমের গাঁইট স্থাপন। গাঁইট খুলিয়া প্রসারিত করণ। (যূপ প্রকরণ) তক্ষার সহিত বনে গমন করিয়া যূপ্যবৃক্ষ অভিমন্ত্রণ। বৃক্ষ ছেদন, ও যূপস্তম্ভ নির্ম্মাণ। ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক যূপকাষ্ঠ প্রোথিত করণ। (অগ্নি সোমীয় পশু প্রয়োগ) তৃণ দেখাইয়া পশুকে অভীষ্ট স্থানে আনয়ন। ত্বষ্টার প্রতি পশু বধ আদেশ। পশুর শৃঙ্গে নাগ পাশ বন্ধন।

যূপে বন্ধন। তৃণ জল দান। জল পাত্র হস্তে যজমান-পত্নীর আগমন। পত্নী কর্ত্তৃক হত পশুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করণ। উদরত্বচ ছেদন। স্রুবানুযোগে ঘৃত মিশ্রিত মেদ অগ্নিতে দান। খণ্ড খণ্ডীকৃত মাংস প্রতিপ্রস্থাতা কর্ত্তৃক হরণ। (সোমাভিষবের শেষ ভাগ) অভিষবের জন্য নদী হইতে জল আনয়ন। কুটি-বার পাথরের নিকট সোম লইয়া যাওয়া। সোম কুটা। সোমরস আহুতি। জলাশয়ে যাইয়া আহুতি প্রদান। সোম ছেঁচা। (গ্রহ গ্রহণ প্রকরণ) (প্রাতঃ-সবণ) সোমরস হবন। সোমরসে সক্তু মিশ্রণ। (মাধ্যন্দিন সবন) (দক্ষিণা) গাভী ও সুবর্ণ দান। বস্ত্র দান। অশ্বদান। মধু ওদন এবং তিল প্রভৃতি দান। (তৃতীয় সবন) সোমে দধি মিশ্রণ। যজমান-পত্নী কর্ত্তৃক পুত্রভৃত পাত্র দর্শন। ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সবনীয় পুরোডাশ ইড়া ভক্ষণ। হবন। পত্নী কর্ত্তৃক পুত্র কামনায় প্রজাপতি অর্থাৎ উপদাথার রেতঃ প্রার্থনা। সোমরস সহ ভৃষ্টযব মিশ্রণ। (শেষ ক্রিয়া) সমস্ত ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক সোম সিক্ত ভৃষ্টযব ভক্ষণ। শাকল হোম। সমিষ্ট যজু হোম। (নিসর্জ্জন) যজমানের হস্তস্থিত কৃষ্ণবিষাণ ও কটিস্থ মেখলা ক্ষেপণ। (অবভৃথ ক্রিয়া) ঋত্বিক্‌গণপরিবেষ্টিত হইয়া যজমানের নদীতটে গমন। জলমধ্যে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া আজ্য হোম। সোমের ছিবড়ে পূর্ণ কলস ভাসাইয়া রাখা। ঐ কুম্ভ মগ্ন করিয়া যজমানের নিমজ্জন স্নান। যজ্ঞাগারে আসিয়া নিত্য স্থাপিত আহবনীয় অগ্নিতে সমিদাধান।

মানবজাতির যখন জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নাই, তখন সৃষ্টিতে সকল ব্যাপার যে নিয়মাধীন, এ সংস্কার জন্মে নাই। তাহারা ভাবিত, মানুষ যেমন ইচ্ছা হইলে কিছু করে, নহিলে বিরত থাকে, সেই প্রকার নৈসর্গিক কার্য্যেরও নিশ্চয়তা নাই। তাহারা কোনও ব্যাপার না করিলে যেমন কিছু নিষ্পন্ন হয় না, তদ্রূপ সৃষ্টিতে যে সকল অলৌকিক ঘটনা দৃষ্ট হয়, তাহা (অবশ্য) করিবার কেহ আছে। পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নির ক্ষমতা বিলক্ষণ। সূর্য্য দিবা করেন। চন্দ্র রাত্রিকালে আলোক দেন। ইঁহারা একবার চলিয়া যান ও পুনরায় আসেন। নভোমণ্ডলে মেঘ উঠে, বিদ্যুৎ দেখা যায় ও তাহাতেই বৃষ্টি হয়। বায়ুর বেগ মনুষ্যের পক্ষে কখন বা হিতকর, কখন বা কষ্টদায়ক, এবং তাহার শক্তিও অসীম। সুতরাং উল্লিখিত কার্য্য সমুদয় যাঁহাদিগের দ্বারা নিষ্পা-দিত হয়, তাঁহারা ত অবশ্য প্রাণী হইবেন। তাঁহারা মনে করিলে আমাদের

মঙ্গল করণে বিরত হইতে পারেন। অপিচ তাঁহারা যখন এতদূর মহাক্ষমতা-শালী, তখন আমাদিগের যে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধারে অপারক হইবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। দেখিতেছি, আমাদের ক্ষমতা অতি সামান্য। ইচ্ছা হইলেই যে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারি, তাহা নহে। এ অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ বা মরুতের স্মরণ লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বৈদিক কালে সেই কারণেই আর্য্যগণ দেব-স্তুতি করিতেন। সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ায় সেই কার্য্য মহা আড়ম্বরে পরিণত হইয়া যজ্ঞরূপে গঠিত হইল। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান বহুল ও কবিত্ব পূর্ণ করিবার জন্য যাহা তাঁহাদিগের আয়ত্ত রহিয়াছে, তাহারও উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করা হইল। সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের জন্য মন্ত্র প্রস্তুত হইল। ক্ষুর, ক্ষৌম, অঞ্জন, কৃষ্ণাজিন, মেখলা প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যকেই স্তব করিবার মন্ত্র আছে। কার্য্য যে প্রকার হউক না কেন, সকল স্থলেই মন্ত্রের প্রয়োজন। এমন কি মূত্রত্যাগের পর্য্যন্ত মন্ত্র আছে। মন্ত্ররচনা একটা ক্ষমতার কার্য্য। যিনি পরিশ্রম করিয়া রচনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য ও তাঁহার নাম স্মরণ রাখিবার কারণ প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে রচয়িতার নাম এবং সেই মন্ত্র কি ভাবে পড়িতে হইবে, তদ্বোধের জন্য কি ছন্দ, লিখিত থাকে। মন্ত্র সকল আলোচনা করিলে প্রাচীন কালের অনেক না হউক, কিছু বিবরণ পাওয়া যায় ও তাহাতেই অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। যেন চক্ষের উপর বৈদিক কালের আর্য্যাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। মন্ত্রের ভাষা এমনি নবীন, ভাব এমনি সরল যে, কোন কথা দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিতে হইলে, একটী কথা তিনবার বলিবার রীতি আছে।

বৈদিক কালে সুবর্ণ (মু া নহে) ব্যবহার হইত বটে, কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য ছিল না। সুবর্ণ-মূল্য স্থির করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গো বা অজা দেওয়া হইত। অগ্নিষ্টোমে বিবৃত হইয়াছে, সোমবল্লী ক্রয়ার্থ যজমান বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি যে মূল্য দিতে সমর্থ হইবেন, তদপরিজ্ঞানের জন্য প্রথমতঃ গাভী আনিয়া প্রতিভু দিতেন, তাহার পর সোমের মূল্য কত সুবর্ণ, তাহা স্থির করিয়া সেই মূল্যের ছাগ প্রদান করিয়া গো গ্রহণ করিতেন। সে সময়ে গোর গলদেশে বন্ধন-রজ্জু দিবার রীতি ছিল না। পায়ে বান্ধিয়া রাখা হইত। আর্য্যগণকে দস্যু ভয়ে সদা ব্যস্ত দেখা যায়। সর্ব্বোপরি একজন রাজা ছিল না। অগ্নিষ্টোম

যজ্ঞে ইদানীং ছাগ পশু ব্যবহার হয়। বৈদিক কালে গো ব্যবহার হইত। গো-মাংস হবন করিয়া ঋত্বিক্‌গণ শেষভাগে ভক্ষণ করিতেন। বধ্য গো যদি গর্ভবতী থাকিত, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক হইত। প্রায়শ্চিত্ত এই যে, গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া সেই বৎসের রক্ত ও মাংস দ্বারা অতিরিক্ত হোম করা হইত।

হিমালয়।

রাওলপিণ্ডি হইতে বুটামলের করাচি গাড়ীতে যাত্রা করা হইল। এক প্রহরের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতে উঠিলাম। পরিচিত বৃক্ষ আর দেখা যায় না, পথ পর্ব্বতের গাত্র দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। রাত্রে বলিবর্দ্দ পরিবর্ত্তনের জন্য এক স্থানে শকট-চালক তাহার সীমান্ত প্রদেশে আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। অন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসিল না। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শীত নিবারণ করা দুষ্কর হইয়াছিল। আমরা জনসমাগমশূন্য ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পর্ব্বতের মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ গর্জ্জনে উৎকণ্ঠায় যাপন করিতে লাগিলাম। জীবনে একটা ঘটনা বৈচিত্র্য পাওয়া গেল।

মরি শৈলের সমৃদ্ধি শুনা ছিল। কিন্তু পরদিন দিবাভাগে আমরা দেখিলাম, যেন কোন নিদ্রিত জনপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভাবটা বড় বিষণ্ণ। আকাশে সূর্য্য নাই, বৃষ্টিতে পথ আর্দ্র। পথে মনুষ্য-সমাগম নাই। পর্ব্বতের বিভিন্নতলে ইংরাজি গৃহগুলি দ্বার বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অতি নিকটে নিকটে চিঠি দিবার জন্য স্তম্ভ বর্ত্তমান। ইহাতে বোধ হইল, কোনসময়ে এই স্থান বিলক্ষণ জনশালী ছিল। আমাদিগকে যে স্থানে গাড়ি ছাড়িতে হইল, তথায় নামিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিব, এমন লোক দেখিতে পাইলাম না। যদি বা কেহ মিলিল, সে বলে, 'উপরে যাও বা বাজারে সন্ধান কর'। উপর কাহাকে বলে বুঝিতে পারিলাম না। একটা আপিসে ঢুকিয়া পড়িলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে কি কোন বাঙ্গালী কর্ম্ম করেন?' তাহাতে যাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম, তিনি লোক দিয়া আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে পাঠাইলেন। তখনও ভিজিতে ভিজিতে উপরের সরল ও প্রশস্ত পথে উঠিলাম। দেখি, সকল দোকানই বন্ধ। তাহার

গিচে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দেব মজুমদারের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। আহারাদি করিয়া গৃহসম্মুখস্থ ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আকাশ পরিষ্কার। সম্মুখে অপূর্ব্ব দৃশ্য! পথের পর পথ ক্রমশঃ নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইপার্শ্বে গৃহশ্রেণী। তাহার পর "খড"। তদনন্তর পর্ব্বত ক্রমে২ আকাশে উঠিয়াছে। শৈলগাত্রে পেঁজা তুলার ন্যায় পদার্থ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে। আমি শিবচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, মেঘগুলা পর্ব্বতগাত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। পরে জানিলাম, তাহা তুষার। এক্ষণে চক্ষু সার্থক বোধ করিতেছি, হিমালয়ের হিম দেখা হইল। "মসেড়িতে" এমন সমতল স্থান নাই, যেখানে দুইখানি বাঙ্গালা একত্র থাকিতে পারে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পথ করিতে হইয়াছে।

অশ্বারোহণে মরি হইতে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। পথের একদিকে খড, (গভীর নিম্ন ভূমি), অন্যদিকে উচ্চ পর্ব্বত। বৃক্ষকাণ্ড পথের উপর আসিয়া পড়ায় সমুদায় পথ ছায়াযুক্ত হইয়াছে। নৈসর্গীক শোভা এখানে গম্ভীর। হিমালয়ে প্রকৃতির ভাব দেখিয়া পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিগণ ও তাঁহাদের তপশ্চর্য্যার কথা স্মরণ হয়। পর্ব্বত দেখিবার বড় সাধ ছিল, সেই জন্য মসূরিতে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তাহার পর ভাবিলাম, যদি যাইতেই হইল, তবে কাশ্মীর যাওয়া যাউক। ইহাতে শৈলবিহার ও যাহাকে লোক ভূস্বর্গ বলে, সে স্থান দেখা উভয়ই হইবে। এক্ষণে সেই জন্য মহাপ্রস্থান করিয়াছি। পর্ব্বত বলিলে পূর্ব্বে প্রস্তরের একটা সমাবেশ বুঝিতাম। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। একটার পর আর একটা প্রস্তরের স্তুপ, মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান, এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে। যে শৃঙ্গ অধিকউচ্চ (উহার মধ্যে বড়) তাহারই শিরে বরফের মুকুট। বরফ প্রায় গলিয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে অবশিষ্ট রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ডাক বাঙ্গালায় গিয়া পৌছিলাম। আহারাদি সমাপন হইল। সন্ধ্যাকালে অলিন্দে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করতঃ অদূরবর্ত্তী তুষার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ সন্দর্শনাদিতে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিলাম।

অশ্বারোহণের বিষম ব্যাপারে আর প্রবৃত্ত হইলাম না। পদব্রজে চলিলাম। কাননের শোভা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। কর্ণার নামক উপত্যকা দেখিতে কি অনুপম! এক শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে যাইতে হইবে, এজন্য পথ পর্ব্বতগাত্র দিয়া স্তুপের ব্যবহিত নিম্ন ভূমিতে নামিয়াছে। তাহার পর পারি-

পার্শ্বিক স্তূপ গাত্রের নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বিতস্তা নদীতীরে উপনীত হইলাম। দেখিয়া অবাক হইতে হইল! এত উচ্চ-স্থানে নদী! বিতস্তা তীব্রবেগে উপলখণ্ডে আহত হইয়া কলকল শব্দে অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। অনতিদূরে গৈরিক বর্ণের এক তটিনী হিমালয় ভেদ করিয়া বিতস্তায় আসিয়া মিশিতেছে। সঙ্গমের উপরেই সেতু! কি সুষমা!

মসেড়ি হইতে কোহালা পর্য্যন্ত ১০ ক্রোশ পথ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ উতরাই। আর রাওলপিণ্ডি হইতে মসেড়ি পর্য্যন্ত ২০ ক্রোশ পথ চড়াই, অর্থাৎ উচ্চের পর উচ্চের দিকে উঠিয়া আসিতে হইয়াছিল। এক্ষণে "পড়াওএ" বা পান্থনিবাসে পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার শ্রীক্ষেত্রে আলাপ হয়। তিনি আবার শিববাবুর সহাধ্যায়ী; তিনিও কাশ্মীর যাইবার জন্য মিলিত হইলেন। এখানে সুরম্য ডাক বাঙ্গালা ছাড়িয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। হট্টের বণিক্‌গণ ধর্ম্মশালার সংস্থাপক। ভাই তেজা সিংনামা শিখ প্রাতে গ্রন্থ সাহেব পাঠ করেন। তিনিই পথিকের অভিভাবক। যাত্রি আসিলে থাকিবার স্থান পায়। রন্ধনের জন্য বাসন পায়। ধর্ম্মশালার ব্যয়ে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলে। একখানি সঙ্কীর্ণ গৃহ,-তাহারই মধ্যে আমরা পঞ্জাবী স্ত্রী ও পুরুষ পান্থের সহিত অতি সামান্য স্থান ব্যবধানে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম। দ্বার বন্ধ করা হইল না। ভাই নানা গল্প করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, এ মন্দ নয়।

কোহালা হজারা প্রদেশে স্থিত। পাটনের (কোহালা সেতুর) বামপারে কাশ্মীর রাজের রাজ্য। দুর্যোগ দেখিয়া অদ্য যাত্রা করা হইবে না, স্থির হইয়াছিল; বৃষ্টি পতনের উপক্রম দেখা গেল। কিন্তু কবে সুদিন আসিবে ভাবিয়া পথিক তিষ্ঠিতে পারে না। ইংরাজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিতস্তা পার হওয়া গেল। হিন্দুর গৌরবান্বিত ভূমিতে এত দিনে পাদস্পর্শ হইল। কাশ্মীর যাইবার যে কয়েকটী পথ আছে, তন্মধ্যে ঝিলম্ উপত্যকার পথ অধিক সুগম। নদী কখন ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে পারে না। ইহার আর একটী নাম নিম্নগা। নদীর গমন পথ ধরিয়া পথ করিতে পারিলে অবশ্য তাহা দুরারোহ হইবে না। কোহালা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত পথ ঐরূপে অবস্থিত। যাহাতে শকট যাইতে পারে, এমন সমতল ও প্রশস্ত করিয়া ঐ পথ আরও সুগম করা হইতেছে। আমরা

ভিজিতে ভিজিতে সেই পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। বর্ষায় নূতন পথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও পথ ভগ্ন—অনেক স্থানে বৃষ্টিতে উদ্‌বেজিত হইয়া কর্ত্তিতগাত্র শৈলের প্রস্তর পতিত হইয়া পথ রুদ্ধ করিয়াছে। এই ভয়ানক পথে শৈলগাত্রে আলম্বিত প্রস্তর দেখিয়া প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়িতে হইয়াছে। দূরে সশব্দে পাথর পড়িতেছে। ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এক স্থানে ভগ্ন পথের উপর লম্ফ দিয়া পার হইলাম। কিন্তু আমাদের ভারবাহী ছাগ কি প্রকারে পার হইবে ভাবিতে লাগিলাম। সহসা পাদ স্খলন হইলে একবারে বিতস্তা বক্ষে পড়িতে হইবে। এইরূপে চলিয়া এক স্থানে দেখি, পথের উপর অশ্বশালা নির্ম্মিত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, ইহার উত্তরে অদ্যাপি সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। এজন্য এখানে অবরোধ করা হইতেছে। আমরা "পাগ্‌দেণ্ডীতে" উঠিলাম। নির্ম্মিত পথের ত এই দশা! এক্ষণে শৈলগাত্রে স্বাভাবিক পথ দেখিতে হইবে। ব্যাপার বড় গুরুতর। আমার এক হস্ত ছত্র দ্বারা বারিধারা নিবারণ করিতেছে, অন্য হস্ত সূক্ষ্মাগ্র লৌহকীলকসম্বদ্ধ চারি হস্ত পরিমিত পার্ব্বত্য যষ্টি ধারণ করিয়া পিচ্ছিল চড়াই অতিক্রমের সাহায্য করিতেছে। প্রতি পাদবিক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ সমভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। উপল খণ্ডে যষ্টি বাধাইয়া ২ চলিলাম। পথ আর শেষ হয় না। দেশে শীতকালে উর্ণাবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতাম না। এখানে আমাদের গ্রীষ্মকাল। একটা ফ্লানেল ও একটা পট্টুর জামা আছে, তাহার নীচে কর্পাস সূত্রের অঙ্গরক্ষা; কিন্তু তথাপি এ ভ্রমণের পরিশ্রমেও শরীর উষ্ণবোধ হইতেছে না। বলা বাহুল্য, যে মুখ বিকাশ করিয়া বায়ু নির্গত করিলে ধূম দেখা যায়। শীতে হাত পা অসাড় হইয়া যাইতেছে। পান্থ নিবাস সম্বন্ধে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে যাহা কহে, তাহার দূরতা বুঝিতে পারি না। ভারবাহী ছাগের যে পরিচালক, সেই আমাদের পথ প্রদর্শক। কিন্তু সে ব্যক্তি এতদূর কখন আসে নাই। মর্দোড় হইতে পাটন পর্য্যন্ত সে যাতায়াত করিত। তাহার পর আবার নূতন পথে পৌঁছিলাম। পথে এমন কর্দ্দম, যে পাদুকা চলে না। মহারাজার ডাক বাঙ্গালা দেখা যাইতেছে—বাঁচিলাম। শরীর এমন ক্লান্ত হইয়াছিল, যে বসিলে আর উঠিতে পারিব না, এজন্য পথে বসি নাই। মরণাপন্ন হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। পথ ন্যূনাধিক ৮ ক্রোশ হইবে। এখানে সে দিন যাহা

পাওয়া গেল, তাহাই আহার করা হইল। লুচি ও লবণ ভিন্ন তথায় আর কিছুই মিলিল না। পরদিন আস্ত কলাই রাঁধিয়া ভাত দিয়া খাওয়া হইল। কুক্কুট মাংস খাইতে পারিলে এ প্রকার নিরামিষাশী থাকিতে হইত না। একেত পথের অবস্থা শোচনীয়, তাহার উপর অনবরত বৃষ্টি, যান বাহনেরও তাদৃশ সুযোগ দেখিলাম না। সুতরাং কাশ্মীর যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম। কিয়ংক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি স্ত্রীলোক যাত্রী সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছে। তখন মনে সাহস হইল। অতঃপর ডাক বাঙ্গালার মুন্সি কহিল, আরও তিন ক্রোশ আপনাদিগকে এই নূতন পথে চলিতে হইবে। প্রাচীন পথ সুগম।

ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি নিবারিত হওয়ায়, আমাদিগের যাত্রারও সুবিধা হইল। মুন্সির পরামর্শে ঝাঁপান পাইবার আশায় নিকটবর্ত্তী জনপদে যাওয়াই স্থির হইল।

একটা পর্ব্বতের সোপান অতিক্রম করিয়া গ্রামে উঠিলাম। তহসিলদার তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমি তাঁহার বাটীতে বসিয়া রহিলাম। তাঁহারই একজন কর্ম্মচারী আমার নিকট কাশ্মীররাজের অনুজ্ঞা পত্র দেখিয়া তাহা মস্তকে স্পর্শ করাইল। ঠিকেদার পুনর্ব্বার আসিয়া সংবাদ দিল, আবেটাবাদ হইতে একজন কাশ্মীরযাত্রী ইংরাজ এই পথে আসিয়াছেন। তাঁহার অনেক সংখ্যক ভারবাহী আবশ্যক। তখনি দরবার হইতে তহসিলদার আসিয়া পৌঁছিলেন এবং রাম রাম বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর ভারবাহক সংগ্রহের জন্য হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যদিও সাহেব এখনও পৌঁছান নাই, কিন্তু তাঁহার দ্রব্য সম্ভার অগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার জন্য কতিপয় ভার-বাহককে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে হইবে। গ্রামের প্রধানগণ আহূত হইল। কাহাকে কয়জন লোক দিতে হইবে, তাহা কাগজে লিখিয়া তহসিলদার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি ভদ্রতা করিয়া আমাকে তাঁহার পালকীখানি দিতে চাহিলেন। তাহার পর আলওয়ারের রাজার জন্য যে কয়েকখানি ঝাঁপান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইখানি আমাদের জন্য আনাইয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। পরদিন বৈশাখী-মেলা, কোনও কাজ হইল না। ঝাঁপান আসিয়া পৌঁছিল। তাহা অসংস্কৃত থাকায় সংস্কারের আবশ্যক হইল। বাহকেরা প্রাতে যান ফিরাইয়া লইয়া

যাইবে। কিন্তু মুজফ্ফরাবাদের তহশীলদার দয়ারামের কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দিন তাহাদিগকে আনাইয়া আমার নিকট উপস্থিত করিলেন এবং "রাজিনামা" অর্থাৎ আবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভারের প্রাপ্তি স্বীকার লিখাইয়া আপন কর্ত্তব্য সমাপনান্তে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঝাঁপান ডুলির মত, কিন্তু তাহার বাহুদণ্ড দুইটী আসনের নিম্নে উভয় পার্শ্বে সম্বদ্ধ। সুতরাং উপবেশনকারীকে বাহকের স্কন্ধদেশের উপরিভাগে যাইতে হয়। বাহুদণ্ডের মাঝে রজ্জুর বন্ধনী দিয়া তৃতীয় বাহু আবদ্ধ, তাহাতে অগ্র-পশ্চাৎ ভাবে স্কন্ধ দিয়া শিবিকা বহন করা হয়। পার্ব্বত্য পথ স্থানবিশেষে এত সঙ্কীর্ণ, যে দুইজন বাহক পাশাপাশি ভাবে যাইতে পারে না। এ কারণ মধ্যস্থলে একটা দণ্ড লাগাইয়া অগ্র পশ্চাৎ ভাবে চলিতে হয়। শিবচন্দ্র বাবু ও আমি ঝাঁপানে যাইতে লাগিলাম। পর্ব্বতের শোভা অতি চমৎকার। বৃক্ষে প্রশস্ত পত্র দেখা গেল না। ঝাউগাছের ন্যায় বৃক্ষই অধিক। সুবৃহৎ সিডার বৃক্ষরাজি যেন পথ আটকাইয়া দণ্ডায়মান আছে। পর্ব্বতের নিম্নে ও উপরে চিড় (পাইন) ও ওক্ বৃক্ষ সরল ভাবে দণ্ডায়মান। চিড় কাষ্ঠআহরণকারীরা বৃক্ষ ছেদন না করিয়া, বৃক্ষের মূলের কিঞ্চিৎ উপরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়। তাহাতে ঐ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া নদী গর্ভে পতিত হয়। এই প্রকারে স্রোতে কাষ্ঠ ভাসাইয়া অধিকারীর নিকট পৌছাইয়া দেয়। পর্ব্বতোপরি ইতস্ততঃ দুই এক খানি গৃহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সে স্থানে লোকে কি করিয়া অধিরোহণ করে, বুঝিতে পারিলাম না। এক স্থানের অধিবাসী নিকটবর্ত্তী কোন গৃহস্থকে সংবাদ দিতে হইলে, সেই স্থান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকে। কারণ তথায় যাইতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়। অত্রস্থ প্রকৃতি পুঞ্জ সকলেই কৃষিজীবি, পশুপালক ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। কদাচিৎ শিখ বা ক্ষত্রিয়ের বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের জীবিকা অভিন্ন। পঞ্জাবী অথবা কাশ্মীরি ভাষা বুঝি না, সুতরাং ভাষার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাহাতে আবার বাহকদিগের "হোসকদম" প্রভৃতি শব্দমাত্র আমাদের অবলম্বন। শুনিয়াছিলাম, যে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে চোর নাই। সে কথা যে সত্য, তাহা এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছি। তদ্ব্যতীত এখানে সর্প বা ব্যাঘ্রের ভয় নাই।

কাশ্মীর।

কবি না হইলে সুচিত্রকর হওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আসিলে লোকে যদি ভাবুক না হয়, তথাপি সুন্দর চিত্রপট আঁকিবার উপকরণ পাইবে। প্রকৃতিকে গুছাইয়া লইতে হইবে না। নিসর্গ-সুন্দরী এখানে আপনি ছবির মত হইয়া বসিয়া আছেন। এখানে বলিবার সামগ্রী অধিক নাই, কিন্তু দেখিবার যথেষ্ট আছে। উড়ি হইতে যাত্রা করিয়া পথের শোভা অন্যরূপ দেখিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুবল্লীতে পথ সমাকীর্ণ। যত যাই তত অধিক মনোরম। প্রকৃতি গম্ভীর ভাব ছাড়িয়া এক্ষণে হাস্যময়ী হইতেছেন। ক্রমে ক্রমে ফুলের ভূষণ দেখা দিল। শীতকালে বৃক্ষের সমুদায় পত্র পতিত হইয়া যায়। তাহার পর এখন নব পুষ্পোদ্‌ভেদ হইয়াছে। যেমন পাতা বাহির হইতে থাকিবে, অমনি ফুল খসিবে। যেগুলি ফুল অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ফল ধরিতে থাকিবে। আগে ফুল, পরে পাতা। কি চমৎকার ব্যাপার! পথের উভয় পার্শ্বে সেও, গেলাস প্রভৃতি ফলের গাছ আপাদ মস্তক পুষ্পময়। যেন ফুলের তোড়া বাঁধিয়া কৃত্রিম বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেদিকে নয়ন ফিরাও, কেবল বড় বড় শ্বেত পুষ্পের গুচ্ছ সাজান আছে। একটী বা দুইটী সেও বৃক্ষ দেখিলাম, তাহাতে অদ্যাপি একটী পত্রও নির্গত হয় নাই। ভাবিলাম, যদি আর কিছু না দেখি, এই দুইটী গাছ দেখিয়াই, আমার পর্য্যটনের কষ্ট সফল হইয়াছে। যথেচ্ছাক্রমে দুই একটী গুল্মের পাতা ছিঁড়িয়া দেখিলাম, তাহা সুগন্ধময়।

সেখবাগ, যজীরবাগ প্রভৃতি উদ্যানে "সুকোর্ফতা" দেখিতে যাইলাম। শুক্রবার মুসলমানের বিশ্রাম দিন। সেই দিন যে উদ্যানে অধিক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেই খানেই ফুলের মেলা বসে। সেখবাগে একটী গেলাস ফলের গাছ দেখিলাম। তাহাতে তখনও পত্রোদ্‌ভেদ হয় নাই। গাছ ভরা ফুল সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। চক্ষুর পিপাসা নিবারণ হইল। ভৃত্যকে বৃক্ষমূলে আসন বিস্তৃত করিতে কহিলাম। অপর এক ভৃত্য কহিল,—সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে, বৃক্ষের মূলে না বসিয়া দূরে উপবেশন করা উচিত। আমরা বিচিত্র ভাব চরিতার্থ করিব বলিয়া কিছুক্ষণ ফুলময় বসন্ত তরুর তলে বসিয়া রহিলাম। পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গিয়া উপবেশন করিলাম। পুষ্পোৎসবের শেষদিন সমাগত।

নিসাৎবাগে যাইতে হইবে। ডল হ্রদে মহা মহোৎসব। "সতু"র নীচ দিয়া পথ। উভয় পার্শ্বে তরি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। আমাদিগের নৌকাও সেই পংক্তিতে ধরা হইল। মধ্যদিয়া অসংখ্য বিলাস-তরি আমাদিগকে দেখিতে দেখিতে বাহিয়া চলিল। নৌকায় গান বাদ্য নানা প্রকার আমোদ চলিতেছে। মুহুর্মুহু চা প্রস্তুত হইতেছে। কোনও কোনও তরণি হাস্যমুখী তরুণী লইয়া দেখাইয়া বেড়াইতেছে। সকলের চক্ষু আমাদের দিকে, আমাদের চক্ষু সকলের দিকে। সময়টা বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। সুখের মুখে ছাই দিয়া আমি দুঃখ সার করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, সুখও আছে। নিসাৎ যাওয়া হইল। হি-আসমান নামক পুষ্প দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম। নিসাৎবাগের প্রথমতল আলো করিয়া রহিয়াছে। বল্লীময় ছড়া ছড়া বেগুনি রঙ্গের ফুল স্তুপাকারে কানন ভরিয়া শোভা পাইতেছে। অপূর্ব্ব শোভা! আমরা আর থাকিতে পারিলাম না। পুষ্প বিতানে বসিলাম। কিছুদিন পরে "অরম্বল" অর্থাৎ পীত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইল; কাশ্মীরবাসীরা আভরণ পাইল।

কাশ্মীরি সিন্ধু নদী বাহিয়া ক্ষীর ভবানীর মেলায় উত্তীর্ণ হইলাম। পদ্মবনে বাসা ঠিক হইল। যে দিকে চাও, প্রফুল্ল কমল সদৃশ রমণীকুল নৌকা আলো করিয়া রহিয়াছে। ক্ষীরপ্রিয়া ভবানীকে দেখিবার জন্য ভূমিতে উঠা গেল। ভবানীর অপর কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল একটী জলের কুণ্ডমাত্র। তাহাতে একটী প্রস্রবণ সংযুক্ত আছে। সময়ে সময়ে সেই জলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। পাছে কেহ পরীক্ষা করে, এই ভয়ে পাণ্ডারা কুণ্ডের জল কাহাকেও তুলিয়া লইতে দেয় না। রাত্রে একবার তথায় যাওয়া হইল। আলোক-মালা-মণ্ডিত কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে শুভ্র-বসনা শুভ্রবর্ণা অঙ্গনা সমূহ শুভ্র আলোকে মিশিয়া কর-যোড়ে স্তব পাঠ করিতেছে। কি সৌম্য দর্শন! কি পবিত্র ভাব! কাশ্মীরের স্ত্রীপুরুষ যিনি সুযোগ পাইয়াছেন, সকলেই এখানে আসিয়াছেন। পরদিন অপ-রাহ্নে আমি কুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া আছি, এক ব্যক্তি কহিল, আপনি কি দেখিতেছেন? আমি কহিলাম, কিছুই না। সে কহিল, কুণ্ডের মধ্যস্থ বেদীর উপর যে সুবর্ণ ছত্র শোভিত দেবীর শূন্য আসন রহিয়াছে, তাহাতে একটা সর্প দেখা যাইতেছে। আমি দেখিলাম, তাহা সর্পের মত বটে, কিন্তু রৌপ্য নির্ম্মিত। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল। কে কাহার উপর পড়ি-

তেছে, স্থির নাই, আমি কিছু না বুঝিয়া পলায়ন করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, দেবী সর্পরূপে দেখা দিয়াছেন। দ্বীপস্থ সমস্ত লোক সেই দিকে ধাবমান। কেহ কেহ বা পদ-দলিত হইয়া গেল। শান্তিভঙ্গ দেখিয়া পূজকেরা বেদী হইতে দেবীর আসন তুলিয়া লইলে জনতা ভঙ্গ হইল। নৌকায় যাইয়া শুনিলাম, কোন কোন লোক সর্পকে চলিতে দেখিয়াছেন।

তৎপরে আমরা মানসবলে পৌঁছিলাম। মানসবল ডল হ্রদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু জল তদপেক্ষা সুন্দর; দেখিতে হরিতবর্ণ, অথচ নিরতিশয় স্বচ্ছ। ১০।১৫ হাত নিম্নে মৎস্য বিচরণ করিতেছে, স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। যেখানে জল অপেক্ষাকৃত গভীর, সেখানে জলের বর্ণ আরও গাঢ়। আমরা মানস সরোবরের কূলে স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া হ্রদবক্ষে আহার করিতে বসিলাম। একবার খাই, একবার জলের দিকে চাই। যত দেখি, চক্ষু তত স্নিগ্ধ হয়। সেই জলে আচমন করিলাম। হস্ত যথার্থই পূত হইল। মানসবলের রূপে মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে চেনার শৈলে উঠিলাম। অহো, কি সুন্দর ছায়া! শরীর ও মন শীতল হইল। এখান হইতে মানসনাদ অতি চমৎকার দেখায়। চেনার বৃক্ষ দেখিতে বড় সুন্দর, ইহা পারস্য হইতে আনীত। আকার অতি প্রকাণ্ড। কাণ্ড শুক্ল-বর্ণ। পত্র বৃহৎ। পাঁচ সাতটা বৃক্ষে একটা দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ছায়াপথে ক্ষুদ্র সরিৎ বহিয়া যাইতেছে। ঐ স্থান ছাড়িয়া ক্রমে উলার ভ্রমণে তরণী চলিল। কাশ্মীরিদের পক্ষে ইহাই সমুদ্র। অপর পার দিয়া তিব্বত যাইবার পথ। পরদিন অঞ্চারসরে পৌঁছিলাম। জলময় নলবন। তাহার উপর দিয়া নৌকা চলিল। অসংখ্য পদ্ম-পত্র জলের উপর ভাসিতেছে। যখন ইহাতে আনন্দ-প্রসূন প্রস্ফুটিত হইবে, তখন (সর) কি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিবে! কুমুদ্বতী প্রসন্না হইয়াছেন, নৌচালকগণ কুমুদের নাল তুলিয়া ভাঙ্গিয়া মালা করিয়া পরিল। দুই এক যুবতী নাবিকতনয়া একাকিনী তীব্রবেগে সঞ্চালন করিয়া নল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইতেছে। আমাদের মাঝিরা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে ও তৎসঙ্গে গালি খাইতে লাগিল। কাশ্মীরে এত জলময় স্থান দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে, ড্রিগনি সাহেবের কথা সত্য। কাশ্মীরের প্রবাদ, যাহা রাজতরঙ্গিণীতে কিহ্লন লিখিয়াছেন, তাহাও সত্য। পূর্ব্বে এই স্থান সতীসর ছিল। কশ্যপ মুনি স্থল নির্ম্মাণ করেন। পরে আমরা নানা খাল অতি-

ক্রম করিয়া উল হ্রদে আসিয়া পড়িলাম। আসিয়া দেখি, জল-দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা এমনি কৌশলে নির্ম্মিত যে, বিতস্তার জল অতি বৃদ্ধি হইলে উলে যাইয়া তত্রত্য গ্রাম প্লাবিত করিয়া দিতে পারে বলিয়া আপনি বন্ধ হয়। অর্থাৎ যেদিকে জল যায়, সেই দিকে আপনি স্রোতে কপাট ঘুরিয়া যায়।

কিছু দিন পরে মিরবাবা হয়দর সাহেবের মেলা উপলক্ষে অনন্তনাগ হইয়া মার্ত্তণ্ড উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পর্ব্বতোপরিস্থ সমভূমি (টেবলল্যাণ্ড) অবলম্বন করিয়া কুরুপাণ্ডু মন্দিরে উত্তীর্ণ হইলাম। কাশ্মীরের মধ্যে এইটী সর্ব্বপ্রধান ভগ্নাবশেষ। বিশাল দেবায়তন অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকের গৃহ শ্রেণী যেন ভগ্ন শরীরে পুরাতন কাহিনী কহিতেছে। এখানে জন মানবের সমাগম নাই। কাশ্মীরে হিংস্র জীব থাকিলে, এই স্থান তাহাদের সুন্দর নিবাস হইত। এখন যে সকল প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে, তাহা ধর্ম্মাশোক ও অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকাল মধ্যে (২৫০ খ্রীঃ পূঃঅব্দ হইতে ৮৭৫ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত) নির্ম্মিত বলিয়া কথিত। মটনের মন্দিরে সূর্য্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা দুই দণ্ড তথায় বসিয়া হৃদয়ে ভাল করিয়া স্থানটীর চিত্র আঁকিয়া ভয়ন নামক তীর্থস্থানে চলিলাম। তথায় এক কুণ্ড হইতে বারি পরিস্রুত হইয়া বেগে চেনার বৃক্ষের ছায়াতলে ইতস্ততঃ চলিয়াছে। সেই প্রশস্ত ভূমিতে বসিয়া কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। কুণ্ডের উপরেই আমাদের বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছিল। জলমধ্যে অসংখ্য শল্কহীন মৎস্য বিচরণ করিতেছে। জল বিমল বলিয়া তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। কাশ্মীর সহরে দেখিবার যোগ্য স্থান নাই। যাহা আছে, তাহা বাহিরে। কাশ্মীর-কুসুম পাঠে ধারণা হয়, সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াও একবার এই ভূস্বর্গ দেখা আবশ্যক। কাশ্মীর কিন্তু ততটা উত্তেজক নহে।

তথা হইতে আমরা অচ্ছয়ল উৎস দর্শনে বহির্গত হইলাম। যে উদ্যানে অচ্ছয়ল উৎস আছে, সেই উদ্যানের প্রথম, দ্বিতীয়, পরে আমরা তৃতীয় তলে উঠিলাম। এই স্থানে পৃথিবী আপনার বুক চিরিয়া প্রবল বেগে অচ্ছয়ল উৎস উৎক্ষেপ করিতেছেন। শৈল পাদমূল হইতে অতিশয় প্রবল বেগে জল বহির্গত হইয়া চলিয়াছে। ঠিক নদীর মত স্রোত। আর এক উৎস স্তম্ভাকারে এক হস্ত উঠিয়া বাহির হইতেছে। দুই জল একত্রিত হইয়া বিপুল আকার ধারণ করতঃ

দ্বিতীয় তলে পড়িতেছে; সেখানে অসংখ্য ফোয়ারা ছুটিয়া তৃতীয় তলে পড়িয়া মহাবেগে উদ্যান হইতে নিম্নবর্ত্তী রাজপথে যাইয়া বিতস্তা নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে। সম্রাট শাজেহান এই উৎস পাইয়া বৃক্ষ-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতের গাত্র অধোভাগে ক্রমনিম্ন। সেই ক্রম ধরিয়া পর্ব্বতগাত্রে উদ্যান রচিত হইয়াছে, সুতরাং সমতল রক্ষা করিতে ত্রিতল বা চতুর্তল হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে তালাওয়ালা বাগানের সৃষ্টি। ইহারই অনুকরণে লাহোর নগরের সলিমার উদ্যান রচিত হইয়াছে। অচ্ছয়লের শোভা বড় চমৎকার। ফোয়ারা গুলির মাঝে মাঝে আবার আলোক রক্ষা করিবার স্থান আছে। আলোকের প্রতিবিম্ব যখন অসংখ্য ফোয়ারার জলে পতিত হয়, তখন যার পর নাই রমণীয় দেখায়। এমনি সম্বদ্ধভাবে উদ্যান সমাবেশ করা হইয়াছে, যেন পৃথিবীপতি মোগল সম্রাট বিলাস ভবন রচনা করিয়া ফোয়ারার জল আহরণার্থ স্বয়ং অচ্ছয়ল উৎস খনন করাইয়াছেন।

বেরিনাগের পথে সৃষ্টির শোভা অতিশয় রমণীয়। ঝিলম উপত্যকার পথে উচ্চ পর্ব্বত নাই, এবং এমন গভীর সৌন্দর্য্যও নাই। উভয় পার্শ্বে অসংখ্য অসংখ্য গোলাপ ক্ষীণদলে কণ্টকময় গাছ ভরিয়া ফুটিয়াছে। এই গোলাপ আদিম। ইহার উৎকর্ষ সাধনানন্তর কলম করিয়া এক্ষণে কণ্টকহীন ও বৃহৎ দলযুক্ত গোলাপের সৃষ্টি হইয়াছে। এ পথে অসংখ্য সেতুহীন নির্ঝর বা নদী আছে; —গভীর নহে, অথচ খরবেগী। দেখিলে নয়ন জুড়ায়। পর্ব্বতের উপর ঝাঁপান উঠিল। বিপরীত দিকে ফিরিয়া বসিলাম। বাহকেরা অতিকষ্টে চলিতে লাগিল। ক্রমে বেরিনাগে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এই স্থান রাওলপিণ্ডি হইতে ১৬০ ক্রোশ। আমরা গিরিরাজ হিমালয়ে এতদূর ভ্রমণ করিয়াছি। বেরিনাগ একটী অষ্টকোণ বিশিষ্ট কুণ্ড। তাহার জল সাগরাম্বুবৎ নীল। সমুদ্র দেখিয়াছি। তাহার বারির সদৃশ বারি আর কোথাও মিলে নাই। নিতান্ত পরিষ্কার জল খুব গভীর হইলে এই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই উৎসের জল নিকটবর্ত্তী গোলাপ কুসুমের উদ্যান বহিয়া মহাবেগে, ঘোর নিনাদে, বিপুল পরিমাণে নিম্নভূমিতে পড়িয়া, ফেনযুক্ত হইয়া, নদীর আকারে অতিশয় তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। ইহাই বিতস্তা নদীর উৎপত্তি স্থান। কিন্তু কাশ্মীরবাসীরা বেতহোএকে বিতস্তার উৎপত্তিস্থান কহে। আমরা আহারান্তে তথায় যাইলাম। কয়েকটা উৎস এক

স্থানে রহিয়াছে, তাহাদের দূরতা পরস্পর বিতস্তি পরিমিত স্থান হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই জন্যই নদীর নাম বিতস্তা হইয়াছে।

শ্রীনগরের প্রধান রাজপথ বিতস্তাবক্ষ। নদীর উভয়তটে বাটী ও ঘাট। স্থলকমল-গঞ্জন রমণীগণ গৃহকার্য্য-তৎপরা। শাক-বিক্রয়-কারিণী আমাদের অবোধ্য ভাষায় নানারূপ গল্প করিতে করিতে তরণী বাহিতেছে। কাষ্ঠ বিক্রেতার নৌকা যাইতেছে। মুসলমানের বর বন্দুকের শব্দ করিয়া হামামে চলিয়াছে। হিন্দুর বর শঙ্খধ্বনি করিয়া, ছত্রধারণ করাইয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে। দেওয়ান সাহেব সজোরে ক্ষেপণী সঞ্চালন করাইয়া বাটী ফিরিতেছেন। শাহমদম মহজিদ্ দেখিতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রকোষ্ঠ সকল নানাপ্রকার কারুকার্য্যময়। কোরাণ শরিফের শ্লোক গৃহময় খোদিত রহিয়াছে। বড়শা দেখিতে পাইলাম। উহা পুণ্যশ্লোক জৈন উলউদ্দিনের সমাধি মন্দির। এই মুসলমান রাজা কাশ্মীরের সমূহ শিল্পোন্নতি সাধন করেন। ইঁহার আদেশে সংস্কৃত রাজতরঙ্গিণীর এক ভাগ বিরচিত হয়। শঙ্করাচার্য্যের টিব্বায় উঠিলাম। ইহা তিব্বতের পর্ব্বত। সহস্র সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিতে অতিশয় কষ্ট হইল, কিন্তু শ্রমাতিরিক্ত পুরস্কার পাওয়া গেল। এখানে প্রকৃতির শোভা অনুপম। ডল হ্রদে গ্রামগুলি ভাসিতেছে। হিন্দুর কাশ্মীর মুসলমানেরা লইয়াছিল। নরশার্দ্দূল রণজিৎ সিং পাঁচশত বৎসর পরে মুসলমান রক্তে ধরাকে বিধৌত করিয়া পুনঃ কাশ্মীর গ্রহণ করিলেন। হিন্দুদের মন্দির মুসলমান ভজনালয়ে পরিণত হইলে, তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় না। কিন্তু এখানে তাহার অন্যথা দেখা যায়। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন হিন্দুরাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন অবশ্য ঘটিয়াছিল। মুসলমান আসিয়া শিবলিঙ্গ উৎপাটন করিয়া মহজিদ্ করিল। রণজিৎ কর্ত্তৃক পুনরায় এইস্থানে শিবস্থাপন হয়। এই স্থানকে স্বাধীনতার তীর্থ বলিতে পারা যায়। এই গিরিশিরে শিব মন্দির ব্যতীত থাকিবার আরও দুই এক খানি গৃহ ছিল, তাহা এখন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একটী প্রস্রবণ ছিল, তাহাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

মনু প্রবর্ত্তিত বর্ণ বিভাগ ভারতের মধ্যভূভাগে ব্যবসায় অনুসারে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই কাশ্মীরে আর্য্যবংশের বাস, তন্নিমিত্ত এখানে

সেরূপ হয় নাই, একবর্ণই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্যুহর নামে কারক ঘর কাশ্মীরি আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের স্ত্রী জাতির অলঙ্কার ও বর্ণ দেখিলে, তাহাদিগকে উপনিবেশী বলিয়াই বোধ হয়। পণ্ডিতদিগের বর্ণের সহিত যদি কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে হয়, তবে গোলাপ ফুলের রূপের সাদৃশ্য হইতে পারে। কাশ্মীরির দুধে আলতা গোলা রঙ্ দেখিয়া ইউরোপীয় লেখকেরা ইঁহা-দিগকে ইহুদি বংশ-সম্ভূত কহেন। এমন কি, কাশ্মীরের প্রাচীন খিলানের ত্রিকোণ আকার দেখিয়া তাঁহারা তাহাতে ইহুদী দেশীয় জেরুজেলমের মন্দিরের সাদৃশ্য দেখেন। একজন হঙ্গেরি দেশীয় পণ্ডিত জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানে ভারতে আসেন। তিনি কাশ্মীরিদিগকে দেখিয়া কহিয়াছেন যে, এমন অমিশ্রিত প্রাচীন জাতি আমি আর কোথায়ও দেখি নাই। কাশ্মীরি মুসলমানেরা পণ্ডিতদিগের ন্যায় রূপবান্ নহে। যে সকল মুসলমান কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, তাহারা দেখিতে পণ্ডিতদিগের ন্যায় সুন্দর। মুসলমানেরা যে হিন্দুর ন্যায় সুন্দর নহে, বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ।

কাশ্মীরের জন সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। ইহাতে প্রতি দশজনে একজন হিন্দু। স্ত্রী ও পুরুষ আপাদ-লম্বিত ফেরণ নামক আংরাখা ও পুরুষেরা উষ্ণীষ ব্যবহার করেন। মুসলমান ও ব্যুহর স্ত্রীলোকে লাল টুপি ও পণ্ডিতানী শ্বেত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সধবা স্ত্রীলোকে এক প্রকার কর্ণ ভূষণ ব্যবহার করেন, যদ্বারা সে স্ত্রীলোক, কুমারী বা বিধবা নহে বলিয়া প্রকাশ পায়। পণ্ডিতারা এক প্রকার ঘাসের পাদুকা ব্যবহার করেন। রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার উঁহাদের প্রায় এক হস্তেই থাকে, দুই হস্তে পরিলে দুই ভাবের পরেন। কাশ্মীরে বিদ্যার চর্চ্চা অতি অল্প। এখানকার জাতীয় ভাষা কাশুর। ইহা লিখিত ভাষা নহে। হিন্দু মুসলমান সকলেই পারস্য ভাষায় লেখা পড়া করেন। এখানে রীতিমত কোন বিদ্যালয় নাই। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত জ্ঞাত নহেন। যাঁহারা শাস্ত্রী, তাঁহারা ফারসি পড়েন না। তাঁহাদের শাস্ত্রীর ব্যবসা, জন্ম পত্রী নির্ম্মাণ। রাজভাষা পারস্য। পারস্য ভূমি কাশ্মীরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কাশ্মীরের শাল পারস্য শিল্প। পেপিয়ার মেসি, দামস্কাস, মিনার কাজ ও চা পাত্র এবং রবাব প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সমস্তই পারস্যের দ্রব্য। কাশ্মীরির

আহার, হিন্দু বা মুসলমান হউন, ভাত ও মেষ-মাংস। আমাদের সূপকার এক দিন কাশ্মীরি ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছিল। তৈল দ্বারা ভাজা ছানা শাকের সহিত, মেষ মাংসের সহিত শর্করা দিয়া অম্বল, নদরু অর্থাৎ মৃণাল এবং গুচ্ছি (বেঙ্গের ছাতা) দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন হইয়াছিল। সোপুরের বাখর খানি রুটি ও ফুলচা [বিস্কুট] চার সহিত ব্যবহার হয়। অভ্যাগতদিগকে চা দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হয়। কাশ্মীরের বিপণীতে সচরাচর সুরাটী ও সবুজ, এই দুই প্রকার চা দেখিতে পাওয়া যায়। সুরাটী চা প্রায় ইংরাজি চার ন্যায়। বিখ্যাত সবুজ চা ও সুরাটী চা লাদকা এবং পঞ্জাব হইতে আনীত। কাশ্মীরে চা প্রস্তুত প্রণালী দুই প্রকার। প্রথম মোগল চা, দ্বিতীয় সিরি চা। প্রত্যেক একতোলা চা ও পাঁচ বাটী জল চা পাত্রে রক্ষা করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জাল দিতে হয়, পরে অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে তাহাতে কিছু জল মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মসলা দিয়া পুনরায় অর্দ্ধ ঘণ্টা জাল দেওয়া আবশ্যক, তৎপরে দুগ্ধ মিশাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট পানযোগ্য মোগল চা প্রস্তুত হইল। ইহার বর্ণ রক্তিম। সিরি চা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ কিছু জল ও সোডা চার সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জাল দিতে হইবে, পরে দুগ্ধ, লবণ ও মাখন মিশাইয়া পুনশ্চ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জাল দিলেই পানযোগ্য সিরি চা প্রস্তুত হইল। চীন ও লাশা হইতে এখানে অনেক চা আমদানী হয়।

একাদশীর দিন বাজারে মাংস বিক্রয় করা রাজার নিষেধ। মুসলমানেরা গো মাংস ভক্ষণ করিতে পায় না। গোহত্যা ও নরহত্যার দণ্ড এক। পূর্ব্বে মুসলমান ভৃত্য পণ্ডিতের জল তুলিত, এক্ষণে রাজার হিন্দুয়ানিতে তাহা রহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজন কালে এক খানি পট্টু অর্থাৎ উর্ণাবস্ত্র পাড়িয়া তদুপরি ভোজন পাত্র রক্ষা করতঃ একত্র সকলে আহার করেন। বাঙ্গালা ব্যতীত সকড়ির বিচার আর কোথাও দেখা যায় না। কাশ্মীরে সঙ্গীত বড় দুষ্য। আমরা স্ব বাসস্থানে এক দিন তৌর্য্যত্রিক দিতে সঙ্কল্প করায় আমাদের অনেক হিতৈষী কহিলেন, ইহা কেহ নিবারণ করিবে না, কিন্তু পল্লীর সকলে আপনাদিগকে অভদ্র বলিবে এবং মহল্লা মুখতিয়ার রাজসন্নিধানে রিপোর্ট করিবে। যাঁহারা নগ্‌মা (সঙ্গীত] করাইতে চান, তাঁহারা ডলহ্রদে করাইয়া থাকেন। আমরা একখানি বৃহৎ ডোঙ্গায় করিয়া ডল অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চায়া অর্থাৎ কেপণিডাড়নের অপূর্ব্ব কৌশলে ডোঙ্গাখানি তালে তালে নাচিয়া চলিল। আমরা পৌছিবামাত্র সঙ্গীত আরম্ভ হইল। নর্ত্তকীর পরিচ্ছদ ও কেশ বিন্যাস কাবুলীদিগের ন্যায়। নর্ত্তকীর সহিত একটী কিশোরী এবং বাদ্যকরেরাও গাইতে লাগিল। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে সাজ, কানুন ও তবলা। বাঁয়ার কার্য্য অপর এক ডাহিনার দ্বারা হয়। দিল্লীর পূর্ব্বতন মুসলমান সম্রাটগণ সঙ্গীতকে ঘৃণা করিতেন। তাহার পর একজন বুদ্ধিমান্ গায়ক কৌশলক্রমে সভায় প্রবিষ্ট হইয়া বাদসাহকে সঙ্গীতে মোহিত করিয়া ফেলেন। সেই হইতেই তাঁহারা উক্ত বিদ্যার হিতৈষী হন। তাঁহাদিগের বিদ্বেষের কারণ, ঐ বিষয় কোরাণে নিষিদ্ধ। কাশ্মীর বহুকাল মুসলমান রাজার অধীন ছিল, সেই জন্যই বোধ হয়, নগরে সঙ্গীত লুপ্ত হইয়াছে।

প্রজাবর্গ ভূমির কর অর্দ্ধেক রৌপ্যমুদ্রা, অর্দ্ধেক ধান্য দিয়া পরিশোধ করে। রাজা সেই ধান্য লইয়া রীতিমত ব্যবসা করেন। কর্ম্মচারীদিগকেও অর্দ্ধেক ধান্য বেতন দেন। এ দেশের কৃষককে জমীদার বলে। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহারাই জমীদার পদবাচ্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় বিপন্ন এদেশে আর কেহ নাই। কাশ্মীরিরা বলবান্ কিন্তু ভীরু—স্বাধীন থাকা কেবল শারীরিক বলসাধ্য নহে। কাশ্মীর চির পরাধীন। এক্ষণে যিনি রাজা, তিনি কাশ্মীরি নহেন, পাঞ্জাবী। রাজকীয় প্রধান পদ সকল পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরি হিন্দুদিগের অধিকৃত। হিন্দুতে বোধ করি দুঃস্থ লোক নাই।

কাশ্মীরিদের ভাষা ও ভাব অবগতির জন্য তদ্দেশীয় কয়েকটী প্রবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

১। উন ক্যাহ জানি প্রোণ বত। ১। অন্ধ কি জানে শুক্লভাত ?

২। ববস্ হাবান সংসার কি তমাস। ২। পিতাকে দেখায় সংসারের তামাস!।

৩। লগ্ন বিজী ইয়ান হুম ছরোন। ৩। বিবাহ কালে আসিতেছে মল।

৪। যস্ কোরি নে খুর সকুর লুবরন্। ৪। যে কন্যার বিবাহ, সেই কন্যা গোময় আনিতে গিয়াছে।

৫। শির নিশির রহতম্ খত্রর মত করতম্। ৫। দৌর্জ্জন্য হইতে রক্ষাকর, ভাল নাই করিলে।

পঞ্জাব।

লাহোর।—শাহ অলমি দরওয়াজায় আমাদিগের বাসস্থান নিরূপিত হইল। পূর্ব্বে লাহোর নগর চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুর তাহা ভরাট করিয়া উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন। নগরের এই ভাবটি সাতিশয় মনোরম। সহরের চতুর্দ্দিকে যে দিকে ইচ্ছা বাহির হও, ফলপুষ্প শোভিত সুন্দর উদ্যান। তন্মধ্যে জলনিঃসরণের জন্য পয়ঃ-প্রণালী চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে ২ স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্নান-প্রকোষ্ঠ। যে দেশের রমণীগণের পরিধেয় বসন ইজার বা ঘাগুরা, তাহাদের স্নান কালীন তৎসমুদায় উন্মোচন ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকে না। কাশ্মীরে উল্লিখিত প্রণালী প্রচলিত। শ্রীনগরে স্ত্রীলোকদিগের স্নান-কোষ্ঠ দেখিয়াছি। পূর্ব্বে আমার সংস্কার ছিল, পঞ্জাবের অধিকাংশ লোক শিখ, এখন দেখিতেছি তাহা নহে, শিখ ধর্ম্মাবলম্বী লোক অতি অল্প। তবে কৃষক সম্প্রদায় ও যাহারা সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং জাঠনামধারী ব্যক্তিগণই বোধ হয়, শিখ। একদা আমি একখানি গুরুমুখি অক্ষরের বর্ণমালা লইয়া অনেক অনুসন্ধানেও তাহার পাঠক খুঁজিয়া পাই নাই। স্বরবর্ণ মধ্যে এ এবং ও বর্ণ নাই। অথচ মুদ্রিত পুস্তকে ঐ স্বর যুক্ত অক্ষর দেখিয়াছি। বর্ণমালার ক্রম এইরূপ; উ অ ই। স হ। ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব ড় ঢ়।

হিন্দুর মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অধিক। ক্ষত্রিয়ানীরা অবশ্য সুন্দরী। কিন্তু যাহারা কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে এখান হইতে গিয়া বাস করিয়াছে, তাহারা পরিস্কার থাকে ও শাড়ি পরিধান করে বলিয়া অধিকতর সুন্দর দেখায়। খেতরাণী ও স্বর্ণলতা একই কথা।

এখানে প্রায় সকল দোকানেই সাইন-বোর্ড দেখিলাম। উকিল, মোক্তার এমন কি জনৈক নর্ত্তকী, আপন অলিন্দের নিম্নে ইংরাজিতে সাইন-বোর্ড লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই, নৃত্য দর্শনেচ্ছুক যে কেহ আসিতে পারেন, অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই ইত্যাদি। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি মন্দিরের ছাদের অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণ দর্পণ-মণ্ডিত। অন্যান্য

কয়েক স্থানেও ঐরূপ বিচিত্র কারুকর্ম্ম (পিস) দেখা গেল। এই স্থানে শাজেহান সম্রাটের "শালামার" নামক এক সুন্দর অপূর্ব্ব ত্রিতল উদ্যান বাটীকা আছে। তন্মধ্যস্থ সহস্র "ফোয়ারা" পরি-শোভিত শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত মণ্ডপে উপবেশন করিয়া জলপ্রপাতের মধুর ধ্বনি শুনিয়া সাতিশয় সুখানুভব হইল।

একদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম, মহা সমারোহে একদল লোক যাইতেছে। তাহাদের অগ্রে ইংরাজি বাদ্য ও দেশী বাদ্য সম্প্রদায়, তাহার পর নর্ত্তকী মধ্যে ২ এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া গান করিতে ২ চলিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, বালকের চূড়াকরণ উপলক্ষে এই সমারোহ।

এখানে মিশির ব্রাহ্মণেরা রন্ধন করে, উচ্ছিষ্ট লয়, সুতরাং বাসন মাজে এবং আবশ্যক মত জুতা বুরুসও করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যে প্রবাদ আছে, "চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা বুরুস," এ প্রবাদের সার্থকতা এইখানে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, প্রবাসী বাবুদিগের ইহাতে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই, কারণ একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিলেই আর অন্য ভৃত্যের প্রয়োজন করিবে না। এখানে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রী ও জাঠ-এই তিন জাতি দেখা যায়। কায়স্থ, বৈদ্য কাহাকে বলে, তাহা ইহারা জানে না। বোধ হয়, বাবুদের ব্রাহ্মণ ভাবিয়াই তাহারা সকল কায করিতে স্বীকার করে।

অমৃতসর।—এই নগরে "দরবার সাহেব" প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল। উক্ত দরবার অমৃতসর নামক সুবৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে। গুরু রামদাস এই অমৃতসর খনন করেন এবং গুরুগোবিন্দ তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করেন। মুসলমানগণ যে যে স্থান গোরক্তে কলঙ্কিত করিয়াছিল, গুরুগোবিন্দ সেই সেই স্থান যবন রক্তে পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। গুরুর পিতা তেগ বাহাদুর দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক নিহত হন; তাহাতেই ধর্ম্মপরায়ণ গোবিন্দ আপন শিষ্য (শিখ) মণ্ডলীকে সংগ্রাম বিদ্যায় ভূষিত করিয়া যান। তাঁহার এমন অবস্থান্তর না হইলে, বোধ হয় শিখ জাতি এতদূর রণ নিপুণ হইতে পারিত না। অদ্যাপি প্রত্যেক শিখ গোবিন্দের আজ্ঞায় সদা সশস্ত্র থাকে। আত্মরক্ষার্থ এমন কি এক খানি ছুরি, অভাবপক্ষে হস্তে লৌহবলয়ও ব্যবহার করিতে হয়। তেগ বাহাদুর যখন বধ্য ভূমিতে নীত হইলেন, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে বল। তিনি কহিলেন, আমাকে একখণ্ড কাগজ, লেখনী ও মস্যাধার দিতে বল। তেগ

(তরবারি) বাহাদুর একটু লিখিয়া তাহা গল দেশে ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জল্লাদের শাণিত অস্ত্রে পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইল। অতঃপর সেই কাগজ খানি খুলিয়া পাঠ করা হইল। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমি শির দিলাম, শর অর্থাৎ ধর্ম্ম দিলাম না।" শিখজাতি, অতি অল্প দিনই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। অদ্যাপিও ইহাদের বীরত্বের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রায় বক্তৃতা কালে পরধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। একদা কোন এক প্রচারক শিখ ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে সহসা একজন তাঁহার মস্তকে যষ্টিদ্বারা আঘাত করিল। সেই আঘাতেই প্রচারক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলে, হত্যাকারী উত্তর দিল, "আমাদের গুরুর এই আদেশ আছে যে, যে ব্যক্তি শিখধর্ম্মের নিন্দা করিবে, তাহাকে সাত ঘা লাঠি মারিবে, কিন্তু আমি এক ঘা মাত্র মারিয়াছি, ও ব্যক্তি তাহাতেই হত হইয়াছে।" শিখদিগের বীরত্ব যেমন প্রশংসনীয়, সাধুতাও তদনুরূপ। অমৃতসর নগরে যাহাতে গো হত্যা না হয়, তজ্জন্য একদা কতকগুলি নগরবাসী বৃটীশরাজ সমীপে বিনীত আবেদন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনুরোধ গ্রাহ্য হয় নাই। এক দিন প্রাতঃকালে শুনা গেল, অমৃতসর নগরীর সমস্ত কসাই গত রাত্রে নিহত হইয়াছে। পুলিস কর্ত্তৃক অপরাধীগণধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইল এবং বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এমন সময় কতিপয় শিখ সশস্ত্রে যোদ্ধৃবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "নিরপরাধীর কখনই প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। উহারা হত্যাকারী নহে, কসাইদিগকে আমরাই নিহত করিয়াছি। দেখ, এখনও আমাদিগের তরবারিতে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। গোহত্যাকারীকে নিপাত করিলে পাপ স্পর্শে না। তজ্জন্য একান্তই যদি দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়, আমরা প্রস্তুত আছি।" প্রবল প্রতাপ দিল্লীশ্বরও সময়ে সময়ে শিখদিগের ভয়ে কম্পিত হইতেন। যতদিন "পঞ্জাবকেশরী" রণজিৎ জীবিত ছিলেন, তত দিন পঞ্জাবের স্বাধীনতার লোপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর গৃহবিচ্ছেদ মিটাইবার জন্য ইংরাজ সৈন্য পঞ্জাবে আহূত হইয়াছিল। বীরত্বে ও বিক্রমে বৃটীশ-সিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "পঞ্জাবকেশরী" রণজিৎ যখন ইংরাজের পত্র পাইতেন, তখন উৎকণ্ঠিত ভাবে পাদচারণা করিতেন। ইংরাজরাজও শিখের বিক্রম ও বীরত্বের অনেক নিদর্শন

পাইয়াছেন। চিলিয়ানওয়ালা সমরে বৃটীশ পতাকা শিখের হস্তগত হয়। শিখ-বীরগণ উপযুক্ত নেতার অভাবে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজকে দমন করিবার জন্য সাহাব উদ্দিনকে ভারতে আনয়ন করেন। তাহাতেই এ দেশে মুসলমানগণ স্থায়ী হয়েন। লাল সিং খাল্‌সা সৈন্যের পতন কামনায় ইংরাজের শরণাগত হয়েন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর, সাত বৎসরের মধ্যে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া জিঘাংসা দোষে অমাত্যবর্গ সমেত সমস্ত রাজকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অমৃতসর নামক বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে গুরুদরবার প্রতিষ্ঠিত। একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সেতুদ্বারা মন্দির সংযোজিত হইয়াছে। মন্দিরের আকার দেবালয়ের মত নহে। সম্রাটের দরবারের ন্যায়। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, তাহাতে পচ্চিকারী করা চতুর্দ্বার যুক্ত প্রশস্ত গৃহ। গৃহমধ্যে বিচিত্র সোনালি কায করা। বাহিরের শিখরভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। গৃহাভ্যন্তরে চৌকির উপর সুবৃহৎ গ্রন্থ-সাহেব বিরাজমান। আচার্য্য দীর্ঘ শ্মশ্রু ও শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করতঃ গম্ভীরভাবে গ্রন্থ সাহেব সম্মুখে করিয়া উপবিষ্ট আছেন। পার্শ্বে গায়ক-মণ্ডলী মৃদঙ্গ ও বীণা সহযোগে ধ্রুবপদ গান করিতেছে। সেতুর পরপারে অকালমুঙ্গা নামক হর্ম্ম্য। সম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্য যুক্ত শ্বেত প্রস্তরের প্রাঙ্গণ। সেখানেও মেঘগম্ভীর স্বরে মৃদঙ্গ সহ ধ্রুবপদ গীত হইতেছে! গানের যেমন ভাব, তেমনি সুর! শেষরাত্রে আচার্য্যগণ এই স্থান হইতে গ্রন্থ সাহেবকে মস্তকে করিয়া মঙ্গলবাদ্য বাজাইয়া বিভুগুণ গান করিতে করিতে দরবারে লইয়া যান। তথায় মঙ্গল আরতি নিষ্পন্ন হয়। সূর্য্যোদয় হইলে দরবারের অর্থ সাহায্য-কারীগণের নামের বৃহৎ তালিকা পঠিত হয়। অতঃপর নানা ভাব যোগের সহিত গ্রন্থ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তন্মধ্য হইতে অতিঅল্পমাত্র অংশ পঠিত হইলে, গ্রন্থ সাহেবকে আবৃত করা হয়। সরোবরের চতুর্দ্দিকে নানাস্থানে গুরুবাগ ও বাবা অটলের মন্দিরে বহুক্ষণ আদিগ্রন্থ পঠিত হয়। পাঠকের মধ্যে স্ত্রীযতিও আছেন। অপরাহ্ণ কালে সরোবর তীরে কোন স্থানে ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছে, কোথাও জনম-শাখী অর্থাৎ নানকের জীবন চরিত পঠিত হইতেছে। কুত্রাপি বা জ্ঞান-গোধুলি অর্থাৎ সায়ং সময়ে শাস্ত্রচর্চ্চা হইতেছে। স্থানে স্থানে সঙ্গীত ত আছেই। ভক্তি, জ্ঞান, আমোদ যাহা চাও, এ তীর্থে সব আছে।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এ স্থানে আগমন করেন। বাহিরে পাদুকা উন্মোচনের জন্য অনুশাসন লিখিত আছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কল্যাণকর নহে। নিজের জ্ঞান উন্নত না হইলে কেহ অন্য লোকের অর্জ্জিত মহৎভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। নানক পৌত্তলিক ছিলেন না। এক্ষণকার শিখ কহিবে, আমরাও পৌত্তলিক নহি। কিন্তু নানক রচিত গ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করা হইতেছে।

লাহোরের ন্যায় অমৃতসর অপরিচ্ছন্ন নহে। নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আছে; স্থানও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। পঞ্জাবের মুসলমান রমণীগণ সুথন নামক পায়জামা পরিধান করে। তাহার ব্যাস তিন হস্ত হইবে, কিন্তু পাদমূল এমনি সঙ্কীর্ণ, যে অতি কষ্টে প্রবেশ করাইতে হয়। হিন্দুনারী কৌষেয় ঘাগরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বালিকা বয়সে পায়জামা পরিবার রীতি আছে। বালক বালিকাগণকে কানা কড়ির ভূষণ পরাইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহার কারণ কি বুঝা যায় না। স্ত্রীলোকগণ মস্তকময় ক্ষুদ্র বেণী করিয়া কেশ পাকাইয়া রাখে। এখানকার হিন্দুললনা অবাধে পাদুকা ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গী অতি বিরল। জাঠেরা তত গৌরাঙ্গ নহে। বোধ হয়, ইহারা সকলেই শিখ। উহারাই পঞ্জাবের কৃষক। এক্ষণে যে কয়েকটী শিখ সাম্রাজ্য দেখা যায়, তাহার সমস্ত অধীশ্বরগণ জাঠ। কাশ্মীররাজ ডোগরা। আমরা স্বদেশে শিখ সৈন্যের দীর্ঘ কায় দেখিয়া মনে করি, সমস্ত পঞ্জাবী মাত্রেরই বুঝি ঐরূপ দীর্ঘ দেহ, বস্তুতঃ তাহা নহে। লাহোর অমৃতসর ইদানীং শিখ রাজ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন স্বরূপ এখানে অনেক সরদার আছেন। তাঁহাদিগকে পৈত্রিক ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কোন মেলায় যাইতে হইলে, পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের কাহার সঙ্গে দশজন, কাহারও সঙ্গে বা পনের জন অশ্বারোহী গমন করে। ঐ সংখ্যায় তাঁহাকে তত সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক বুঝায়, অর্থাৎ মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময় বর্ত্তমান সরদারদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ সেই সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এক দিন ইহারা বিক্রমে সিংহ সদৃশ ছিলেন, এই জন্যই বোধ হয় ইঁহারা সিং আখ্যায় আখ্যায়িত। বাঙ্গালা দেশে ভ্রষ্টা স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। পঞ্জাবে স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী হইলেও, কালসহকারে পুনরায় পরিবার মধ্যে গৃহীতা হইয়া থাকে। শুনা যায় এখানেও ছল্লা কোঠা অর্থাৎ "*Empty House*" আছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।

দিল্লী।—এই নগরে আমাদের কোনও পরিচিত লোক না থাকায়, তথাকার কালী বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। প্রবাসে অপরিচিত বাঙ্গালীকে স্বপরিবার মধ্যে স্থান দেওয়া অযৌক্তিক বোধে এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীরা চাঁদা দ্বারা একটী বাটী রাখিয়া তন্মধ্যে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা চালান। অভ্যাগত বাঙ্গালী আসিলে তথায় স্থান পায়। প্রথমতঃ বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী দানাপুরে কালী বাড়ী হয়। এক্ষণে পেশওয়ার পর্য্যন্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা ধরমপুরে একটী বাটী ভাড়া লইয়া তথায় পৌঁছিলাম। অত্রস্থ ডেপুটী কমিশানরের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বসু তদ্বিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করেন। দিল্লীর ভাষা আমার কর্ণে অতি মধুর লাগিল। এমন চমৎকার হিন্দী আর কোথাও শুনি নাই। কলিকাতায় ক্ষেতরাণীদের ভাষা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই স্থান সেই ভারত-মোহিনী ভাষার জন্মভূমি। এখানকার ভাষাকে হিন্দী না বলিয়া উর্দ্দু বলিলেও চলে। দিল্লী অতি সমৃদ্ধ নগর। বর্ত্তমান দিল্লী ষষ্ঠবার নির্ম্মিত। সম্রাট সাজেহানই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। নগরের চতুর্দ্দিক্ দুর্গ প্রাকারের ন্যায় প্রাচীর বেষ্টিত, তাহার স্থানে স্থানে তোপ রাখিবার স্থান। যমুনাতীরে সাজেহান নির্ম্মিত দুর্গ। আমরা অনুজ্ঞাপত্র লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম। যথায় মোগল সম্রাটের তখ্‌ত্‌তাউস্ বিরাজ করিত, সে হর্ম্ম্য অদ্যাপি (বর্ত্তমান রহিয়াছে) ইংরাজ ভগ্ন করেন নাই। সেই স্বর্ণ-মণ্ডিত রত্ননির্ম্মিত লতাপুষ্পখচিত মসৃণ শ্বেত প্রস্তর বিরচিত অট্টালিকার নাম "দেওয়ানেখাস্"। এই খানে বসিয়া মুসলমান বাদসাহ ভারতশাসন করিতেন। এই খানে ভারতের অদৃষ্ট লিপি লিখিত হইত। আজ এই স্থান নীরব। নিম্নেই যমুনা! প্রশান্ত!!

"যুগ যুগবাহি, প্রবাহ তোমারি, দেখিল কতশত ঘটনা ও।
"তবজল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা, পরকাশিল লয় পাইল ও॥
"কলকল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
"স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা, ভূত সে ভারত গাথা ও॥

"আজি সব নীরব, রে যমুনে সব, গতয়ত কালে ও।
"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে! ও॥"

শ্বেত প্রস্তরের মতি মস্‌জিদ ও হমাম (স্নানাগার) অতি বিচিত্র দর্শন। "দেওয়ানীআম" এক্ষণে ইংরাজ সেনার সুরাপান গৃহে পরিণত হইয়াছে। বাদসাহের (বেদী) সিংহাসন অদ্যাপি তথায় বিরাজ করিতেছে। আর এক দিন আমরা পুরাতনদিল্লী দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। যত অধিক অগ্রসর হই, কেবল ভগ্নাবশেষই দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রমে যন্ত্র মন্ত্র (মানমন্দির) ছাড়াইলাম। অশোক রাজার স্তম্ভ (ফিরোজ সার লাট) দেখা হইল। দূর হইতে পৃথিবীরমধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ কুতবমিনার দৃষ্টিগোচর হইল। সংস্কার করা হয় বলিয়া এটী নূতনের ন্যায় রহিয়াছে। অতি চমৎকার কারুকার্য্য খচিত পল তোলা প্রশস্ত প্রস্তর গ্রথিত স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে প্রস্তরের উপর কোরাণের বিবিধ শ্লোক খোদিত রহিয়াছে। প্রশস্ত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া স্তম্ভোপরি উঠিলাম, যতদূর দৃশ্য হয় কেবল অনন্ত ইষ্টক ও প্রস্তর রাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অভগ্ন ও অর্দ্ধ-ভগ্ন গৃহ সকল দেখা যাইতেছে। সুদূরে হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরের প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তরের গুম্বজ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। অন্য দিকে উৎসাদিত তুগলকাবাদ নগরের শ্বেত কঙ্গুরা দেখা গেল। পূর্ব্বের দিল্লীনগরী এই মহাসমাধিতে নিহিত রহিয়াছে। পৃথ্বীরাজের লাল কোঠ এখন ধূল্যবলুণ্ঠিত। তাঁহার কাঞ্চী এখনও অন্তর্হিত হয়েন নাই। দেবী যোগমায়া "সাহেবের" মন্দির দর্শনান্তে বুতখানায় আসা গেল। ইহা একটি হিন্দু মন্দিরের অবশিষ্টাংশ; তজ্জন্যই যবনগণ এই স্থানের নাম বুতখানা অর্থাৎ পৌত্তলিক ভজনালয় রাখে। ইহার মধ্যস্থলে ধাতুনির্ম্মিত একটি স্তম্ভ বিরাজিত। কথিত আছে, ৩১৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রাজাধব কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। পৃথ্বীরাজ দ্বারা কুতবস্তম্ভের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়মাত্র, কিন্তু কুতবুদ্দীন উহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। দিল্লী নগরের প্রধান দ্রষ্টব্য কুতবস্তম্ভ। এখানে বহুতর সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গোরস্থান বিচিত্র শ্বেত প্রস্তরের কারুকার্য্যে অতুলনীয় হইয়া ইতস্ততঃ শোভা পাইতেছে। ইহাই কেবল দিল্লীর পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন। এক দিন পুরাণকিলা নামক স্থান দেখিতে যাওয়া হইল। এই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত ছিল। কনিংহাম সাহেব কহেন, এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কালের একখানি মাত্রও খোদিত প্রস্তর নাই। ইন্দ্রপ্রস্থ দর্শনের সাধ

মুসলমানের ভজনালয় দেখিয়া মিটাইতে হইল। দিল্লীর এই বিশাল মহাপ্রান্তর হিন্দু ও মুসলমান গৌরবের সমাধিস্থান। মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন দেখিয়া হিন্দুর সাম্রাজ্য স্মরণ হয়।

"কতকালপরে বল ভারতরে, দুখ সাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে,
নিজবাস ভূমে পরবাসী হলে, পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে, বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

দিল্লীর চাঁদনি চৌক অতি প্রশস্ত ও রমণীয়। মধ্যস্থলে ও উভয় পার্শ্বে তরু-শোভিত সুন্দর পথ, তাহার আবার উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত রাজপথ। বাদসাহের সওয়ারি বাহির হইবার উপযুক্ত স্থান বটে। নিকটেই মলকাবাগ অর্থাৎ সম্রাজ্ঞীর উদ্যান; তন্মধ্যে বিচিত্র চিত্রশালিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই গৃহে দিল্লীশ্বরের ময়ূর আসনের শিরঃশোভাকারী একটি ক্ষুদ্র ময়ূর দেখা গেল। অতঃপর শৈল, মিউটিনি মেমোরিয়ল্, জুম্মা মহজিদ প্রভৃতি নানা স্থান, বহুবিধ নরনারী ও কথকতা শুনিয়া দেশ ভ্রমণ সার্থক করা হইল। এখানে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ফুলওয়ালোঁকিসয়ের নামক একটি উৎসব হইয়া থাকে। প্রাবৃট্‌কালে ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা দর্শনযোগ্য। দিল্লীর কোলাহলময় ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। অত্রস্থ ফেরিওয়ালাদিগের চীৎকার কখনও ভুলিতে পারিব না।

মথুরা।—বৃন্দাবন।—গিরিগোবর্দ্ধন।—এখানে বাসস্থানের জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্নে আমরা দিব্য বাসস্থান পাইলাম। চিরবাঞ্ছিত ব্রজমণ্ডল এক্ষণে আমাদের পদ-তলে স্থিত। যমুনার পরপার হইতে মথুরা কাশীর একটি ক্ষুদ্র পল্লী সদৃশ দেখায়। মথুরার সমস্ত পথ প্রস্তরে মণ্ডিত। এখানকার ভাস্করের কর্ম্ম অতি বিচিত্র। পাথরের উপর অতি সুন্দর লতা পত্র খোদিত হইয়া থাকে। উহা সংগ্রহের জন্য গ্রাউস সাহেব একখানি আদর্শ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাহা স্থাপত্য কর্ম্মের চিত্রশালিকা। গোবর্দ্ধনের ছত্রি (মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ গৃহ) অতি মনোরম। এই সমস্ত দর্শন পক্ষে গাউস সাহেবকৃত মথুরা নামক পুস্তক আমাদের বিশেষ সাহায্য করিল। মথুরার শেঠেরা অতিশয় ধনবান্। গোকুল

দাস পারিখজী একজন গুজরাতী, তিনি গোয়ালিয়ার রাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সন্তান ছিল না; সহোদরের সহিত প্রণয় না থাকায়, তিনি মৃত্যুকালে আপনার সম্পত্তি নিজ কর্ম্মচারী জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মণিরামকে প্রদান করিয়া যান। পারিখজী বৈষ্ণব ছিলেন। অতুল সম্পত্তি বিধর্ম্মীকে দান করিলেন, অথচ সহোদরকে দিলেন না। শরীরের সম্পর্ক প্রধান বলিয়া গণ্য হইল না। এক্ষণে সেই মণিরামের বংশই মথুরার শেঠ নামে খ্যাত। কথিত আছে, বৃন্দাবনের রঙ্গজীর মন্দির নির্ম্মাণে ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহা এই শেঠদের কীর্ত্তি। এক্ষণে ইঁহারা জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের জৈন দেবালয়ও আছে। রঙ্গাচার্য্য স্বামী শেঠদের গুরু। ইনি দ্রাবিড়ী। তদনুসারে বৃন্দাবনের মন্দির সম্পূর্ণ তামিল ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবতার গঠনও তদ্রূপ তামিল আকারের। রামানুজ সম্প্রদায়ের এত বড় মন্দির আর দেখি নাই। শাহ কুন্দন লালের মারবল প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ছবির মত সুন্দর। নির্ম্মাতার নিবাস লক্ষ্ণৌ। ইঁহাদের ধনোৎপত্তির প্রবাদ এইরূপ ;- দিল্লীশ্বরের কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত বণিক মহাশয়ের প্রণয় ছিল। এক সময় সেই অমাত্য উপযুক্ত ক্ষমতা পাইলেন। তখন বণিক কহিলেন, এখন আমাকে ধনী করিতে হইবে। অতঃপর বণিকের একখানি সিংহাসন বাদসাহকে বিক্রয় করা হইল। তাহার মূল্য কয়েক সহস্র মুদ্রা মাত্র, কিন্তু অমাত্য সেই সহস্রকে লক্ষের অঙ্ক ধরিয়া যত সহস্র টাকা মূল্য হইয়াছিল, তত লক্ষ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াদিলেন। কলিকাতাস্থ রামলাল বদ্রিদাস নামায় কুঠির ইঁহারাই অধিকারী। বৃন্দাবনের অপর প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গোবিন্দজীর প্রাচীন মন্দির প্রসিদ্ধ। পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিতগণ বলেন, মানসিংহ কোনও ইউরোপীয় স্থাপত্যের আদর্শে এই সুবৃহৎ লোহিত প্রস্তরের দেবায়তন রচনা করিয়া যান। ধন্য গ্রাউস্ সাহেব! তিনি ইংরাজরাজকে লওয়াইয়া মন্দির সংস্কার করতঃ হিন্দুর এই কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। এখানকার দেবালয়ে যদৃচ্ছাক্রমে দেবদর্শন ঘটে না। রাজদরবারের মত দেবতার দর্শন দিবার বার হয় এবং পুষ্প নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে রাজার ন্যায় দেবতাকে নজর (ভেট) দিতে হয়। বিহারীজী নামক বিগ্রহ বিলাসী বাবুদিগের মত বেলা ১০ টার সময় নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠেন। তখন তাঁহার দাঁতন সেবা হয়। ঈশ্বর মানুষ গড়েন নাই, মানুষ ঈশ্বর গড়িয়াছে, এ কথা

যথার্থ। অতি রমণীয় স্থান শুনিয়া চিরদিন বৃন্দাবনকে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম। বৃন্দাবন বলিলে, মাধবী লতার কুঞ্জ, প্রমদোদ্যান, শারদ জ্যোৎস্না, মধুর মুরলীধ্বনী ও সুন্দরী রমণী প্রভৃতি কত কি মনে উদয় হইত। এখানে আসিয়া বনশোভা তাদৃশ কিছুই দেখিলাম না। কেবল কতকগুলা জনপূর্ণ বাটী। নূতন দেশ ভাবিতে হইলে, আর ভাবের আবেশ হয় না। দেশ ভ্রমণে ক্রমে অরুচি জন্মিল। ব্রজের ভাষা কর্ণে মধুর শুনায় না। বেশভূষা মাড়ওয়ারিদিগের অনুরূপ। মাড়ওয়ারি আচার বড় অপ্রীতিকর। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রীতিপ্রধান। বৈষ্ণবদের মতে যুগল ভজন আবশ্যক। আরাধিত যুগলমূর্ত্তির পরস্পর সম্পর্ক অপবিত্র: তজ্জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মে ব্যভিচার হেয় বলিয়া গণ্য হয় না। রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রণয় যখন আদর্শ, তখন সতীত্ব বিষয়ে উপাসকের মন কি ভাবে গঠিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরম ভাগবত বাঙ্গালী, যাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করিয়া আছেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্যভিচারী। শৈব শিবপূজার ধ্যান পাঠান্তর আপনাকে শিবের মত চিন্তা করিয়া সম্মুখস্থ মূর্ত্তিকে তদ্রূপে ধ্যান করেন। বৈষ্ণব আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিবে, সুতরাং একটি রাধা না হইলে উপাসনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গোকুলের গোস্বামী-যাঁহাদের নিকট বাঙ্গালী বৈষ্ণবগুরু আপন উপাধি শিক্ষা করিয়াছেন, সেই বল্লভাচারী মহারাজগণ আপন শিষ্যের ধন, প্রাণ ও শরীরের স্বামী। অতএব শিষ্যা উপভোগে পাপ স্পর্শে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বোম্বাই প্রদেশের গুজরাটী বণিয়া জাতি ও ক্ষত্রিগণ গোকুলস্থ গোস্বামীগণের শিষ্য। গোকুল জনপদ মথুরার অন্যতর পারে স্থিত। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে আমি যে কয়েকজন মহারাজকে হিন্দোলা দুলাইতে দেখিয়াছি, তাহাদের সকলেরই লম্পটের ভাব। বৈষ্ণব প্রেম পরিশেষে এত দূর বিকৃত হইয়া পড়ে যে, সম্প্রদায় বিশেষ সখীভাব ধারণ করে। পুরুষ উপাসক শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী ভাবে উপাসনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ পতি হইয়াছেন বলিয়া পুরুষ উপাসক স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। নববিধানের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন ধর্ম্মসমন্বয় দেখাইবার জন্য কতকগুলি লোককে সখী সাজাইয়া উপাসনার ক্রম দেখাইয়াছিলেন। নিরাকারে কিছু না মিলায়, কেশব বাবু বোধ হয় ব্রাহ্মদের জন্য ঈশ্বরের সহিত উপাসকের পতি পত্নী সম্পর্ক ঘটাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে বাঙ্গালার উপকার হয়। শাক্ত সম্প্রদায়ের বীরাচার প্রায় তিরোহিত হইয়াছে।

আগ্রা।—তাজমহল দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল। ইহা যে দেখিতে পায়, সে ধন্য। শ্বেত প্রস্তরের বাটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্তরের গাত্র খুদিয়া রঙ্গিন পাথর বসাইয়া ফুল ও পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি ফুলে ২০।৩০টী জোড় দিতে হইয়াছে, দেখিতে নিতান্ত সুন্দর। তাজের গৌরব লোককে বলিয়া বুঝান যায় না, দেখিলে তবে বুঝিতে পারা যায়। সে দেখিবে, সে কৃতার্থ হইবে। ব্যস্ততা-প্রযুক্ত ফতেপুর শিকরী ও সেকেন্দ্রা দেখিতে যাওয়া হইল না।

কানপুর।—এ নগরীর বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা বহুদিন হইতে হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। পঁহুছিয়াই কালেক্টর-গঞ্জে যাত্রা করিলাম। তখন বেলা ৮ টা বাজিয়াছিল। এখানে অতি প্রত্যূষে হটসমাবেশ হয়, এখন ভাঙ্গা বাজার। একটি চতুরশ্র স্থান, তাহার চারিদিকে গৃহশ্রেণী, এখানে আড়তিয়ারা বসিয়াছে। খরিদদার ইহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় মাল লয়। মধ্যস্থলে দ্রব্যজাতপূর্ণ গরুর গাড়ী সকল রহিয়াছে। পথের ধারে চট পাতিয়া তাহার উপর নীলের বস্তা মুখ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। যে কানপুরের বাজারে প্রত্যহ দুই শত মণ ঘৃত আমদানী হয় শুনিয়াছিলাম, সেখানে আজ এক ২ জন দশ পাঁচ সের করিয়া ঘৃত লইয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাইলাম। লবণ ও হরিদ্রা প্রভৃতি যে স্থানে বিক্রয় হয়, সেখানেও ঐরূপ পথের উপর বস্তার মুখ কাটিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

আহারান্তে সিপাহী-বিদ্রোহের স্মারক দেউল দেখিতে যাওয়া গেল। ভারতবাসী এ স্থল দেখিতে চাহিলে মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি-পত্র লইতে হয়; তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট হইতে লিপি লইয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমেই কূপ-সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, অতি পরিপাটী ভাস্করের কর্ম্ম। আঙ্গুরের পাতা অতি সুন্দর ভাবে খোদিত হইয়াছে। সমাধির উপর মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত শান্তিদেবীর মূর্ত্তি। মুখখানি দেখিলে বাস্তবিক করুণার উদয় হয়। ইংরাজ নানা সাহেবকে দোষী কহেন, কিন্তু তিনি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না; তাঁহার অনুচরের দ্বারা সে নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। তার পর চৌরাঘাট নামক স্থান দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কথিত আছে, এই স্থানেই ইংরাজের তরণীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রয়াগ।—গঙ্গা ও যমুনা এখানে মিশ্রিত হইয়াছেন, সেই জন্য এ স্থানের

নাম প্রয়াগ। নৌকা আরোহণ করিয়া সঙ্গমের অদূরে উপস্থিত হইয়া স্রোতঃস্বতীদ্বয়ের জলের পার্থক্য দর্শন করতঃ পুলকিত হইলাম। আকবর সাহের রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ এখানকার দ্বিতীয় দর্শনীয় সামগ্রী। ভূগর্ভে আলোক-বিরহিত হইয়া অক্ষয় বটের পত্র হরিৎ বর্ণ না হইয়া শ্বেত রহিয়াছে। আরব্য ভাষানুরাগী মীওর মহোদয়ের পরামর্শে নির্ম্মিত মীওর কলেজের আকার আরব্য স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

লক্ষ্ণৌ—বলরামপুরে রাজার সরায়ে অবস্থিতি করা গেল। ভটিয়ারিণ কি পদার্থ এতদিনে জানিতে পারিলাম। এবারকার এই শেষ আড্ডা। কত প্রকার স্থানেই যে বাস গ্রহণ করা হইল। মুদির দোকান, বাঙ্গালীর হোটেল, বাড়ীওয়ালার ঘর, রেলওয়ে সরাই, বন্ধুর শ্বশুর বাটী, বয়স্যের বাসা, অন্যের পত্র দ্বারা পরিচিতের বাসা, ইংরাজের ডাক বাঙ্গালা, শিখের ধর্ম্মশালা, কাশ্মীররাজের ডাক বাংলা, ভাড়াটিয়া বাটী, নৌকা, কালীবাড়ী, অবশেষে ভটিয়ারিণের সরাইয়ে পর্য্যন্ত আশ্রয় লওয়া হইল। প্রয়াগ ছাড়াইয়া আর খোলার ঘর দেখি নাই। এখানে আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। কেশর বাগ, বিদ্রোহীদের চিহ্নে অলঙ্কৃত। ভগ্ন রেসিডেন্সি ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর দৌরাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য চির-রক্ষিত হইয়াছে। ইমামবাড়া, চৌক, মিউশিয়ম প্রভৃতি নানা স্থান দেখা হইল। ছত্রমঞ্জিলও দেখা গেল। লক্ষ্ণৌএ দেওয়ালের উপর চুনের লতা পাতা খোদাই অতি চমৎকার। লক্ষ্ণৌ নগর দেখিতে সুন্দর না হইলেও এখানকার লোকে যে বিলাসী, তাহা সরায়ে বসিয়াই জানা গেল। যে সকল মিষ্টান্ন সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করে, ফেরিওয়ালা তাহাই বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। যাহা অতি উৎকৃষ্ট, তাহা সন্ধান করিয়া লইতে হয়। অন্যস্থানের দুর্লভ খাদ্য এখানে সাধারণ ভাবে ফেরিওয়ালাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায়।

কলিকাতা।

মহাপ্রদর্শনী।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০।—অদ্য সার্ব্বজাতিক মহাপ্রদর্শনীর উদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান দেখিতে যাওয়া গেল। ইংরাজ সাম্রাজ্ঞীর ভারত-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সাম্রাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অফ কনট্ প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিলেন। লর্ড রিপণের সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত ও গভর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দরবার দেখার বাসনা সফল হইল।

জ্ঞান, আমোদ ও বায়ুসেবন এই তিন অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত মাসত্রয়-ব্যাপী প্রদর্শনীতে প্রায় প্রত্যহই ভ্রমণ করিতে যাইতাম। দ্রষ্টব্যবস্তুর তুলনায় জ্ঞানোপার্জ্জন অতি সামান্যই হইয়াছে। জ্ঞানচক্ষু ব্যতিরেকে কোন বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। যেমন জ্ঞান, তাহার অতিরিক্ত শিক্ষা হওয়া অসম্ভব। আমাদের বিশ্বতোমুখ বাণিজ্য-বুদ্ধি নাই। আমোদ আছে বলিয়া প্রদর্শনীতে যাওয়া যায়। গতবারের প্রদর্শনী দেখিয়া ইংরাজ বিলাতী ধুতী, সাড়ী বুনিতে শিখিয়াছেন, এবার হয়ত কাংসারির অন্ন মারিবেন। কলের কার্য্যকারিতার সহিত হস্তের কার্য্যকারিতা কিছুতেই প্রতিযোগীতা করিতে পারে না। আমরা যন্ত্রবিজ্ঞান জানি না। অতএব মহাপ্রদর্শনী হইতে বিশেষ কিছু উপকার পাইব না। লোপ-উন্মুখ দুই একটা ভারতশিল্পরক্ষাকল্পে কিছু সাহায্য পাইতেও পারে। অষ্ট্রেলিয়াবাসী ইংরাজ-উপনিবেশী এ মেলার অনুষ্ঠাতা; তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকার পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে রীতিমত বাণিজ্যতরি যাতায়াতের নিয়ম স্থির হইয়াছে। মেলা-প্রবর্ত্তক যুবেয়ার সাহেব অষ্ট্রেলিয়ায় বিশেষ সাধুবাদের পাত্র; তিনি আমাদেরও প্রিয়। তাঁহার প্রসাদে আমরা কিছুকাল চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা বিলক্ষণ মিটাইয়াছি। প্রদর্শনীতে জড় ও জীবন্ত অনেক বস্তু চক্ষু শীতল করিয়াছে। যে দিন প্রথম দেখিতে যাওয়া হইল, কোন সামগ্রীই চক্ষু

আয়ত্ত করিতে পারিল না। ইহার পর আর কি আছে দেখা যাউক, এমনি করিয়া দিন গেল। পঞ্জাবদেশীয় দ্রব্যজাতপ্রদর্শনীপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আমার জ্ঞান হইল যেন, প্রকৃত সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে পঞ্জাবী বস্তু; তাহার পর সেই প্রকোষ্ঠের কর্ম্মচারীগণও পঞ্জাবী এবং তাঁহারা পঞ্জাবী ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন। আরও বিচিত্র এই, পঞ্জাব ভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিয়া গৃহসাজ দেবদারু কাষ্ঠের যে সুঘ্রাণ পাইয়াছিলাম, এখানেও সেই গন্ধ। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রাজপুতানা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, ব্রহ্ম, কোচিন যে কোনও নামদেয় প্রকোষ্ঠে যাই, যেন বোধ হয় সেই দেশের প্রকৃতি এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এ স্থান ভাল করিয়া দেখিতে পারিলে দেশ-ভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। সেখানকার বাড়ী দেখিবে, ছবি আছে—কাষ্ঠ ও প্রস্তরের দ্বার আছে। ফল মূল দেখিবে,—মৃণ্ময় প্রতিরূপ দেখ। পশু পক্ষী দেখিবে,—মানবের বেশভূষা দেখিবে,—কার্য্যকলাপ দেখিবে, যাহা চাও, সমস্ত পাইবে। যিনি আগ্রার তাজ, অমৃতসরের গুরুদরবার, দিল্লীর কুতবমিনার, বৃন্দাবনের তামিল মন্দির ও গঙ্গাপার হইতে দৃশ্যমান কাশীনগরী দেখেন নাই, তিনি এখানে সে বাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন। মেলার উদ্দেশ্য শিল্পপ্রদর্শনপক্ষে বিলক্ষণ সফল হইয়াছে। কাশ্মীরের পেপিয়র মেসি, দামাস্কস কর্ম্ম ও শাল, বারাণসী ও আহম্মদাবাদের জরির কর্ম্ম, হায়দরাবাদের তাস নামক নিরবচ্ছিন্ন জরির বস্ত্র, মহীশূরের চন্দন কাষ্ঠের সামগ্রী, রাজপুতানার শস্ত্র ও বর্ম্ম (বখতর), জয়পুরের রাজা মান কর্তৃক কাবুল হইতে আনীত গালিচা এবং খিলাৎ প্রাপ্ত পরিচ্ছদ, আগ্রার নগোকা কাম, তাঞ্জোর ও মুরশিদাবাদের হস্তিদন্তনির্ম্মিত কারুকর্ম্ম, গোয়ালিয়র ও কান্দের স্বচ্ছ প্রস্তর সামগ্রী, অস্লার কোম্পানির বেলওয়ারি পর্য্যঙ্ক, হ্যামিল্টন কোম্পানির সঙ্গীতকারী ঘাড়, ত্রিপুরার হস্তিদন্তের শীতলপাটী, তাঞ্জোরের মাদুর, কুচবিহাররাজের হীরার মুকুট, বর্দ্ধমানরাজের স্বর্ণসিংহাসন ও হীরার শিরস্ত্রাণ, সাম্রাজ্ঞী ইউজিনীর হীরার লিখনসামগ্রী ও নক্ষত্র, বাদ্রিদাসের মুক্তা, দিল্লী ও লাহোরের সম্রাট ও বেগমগণের মূর্ত্তি, রাত্রি, বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ এবং বরফ পড়ার চিত্র প্রভৃতি নানা অপূর্ব্ব দ্রব্যের সমাবেশ হইয়াছে। তেমনি ইউরোপ খণ্ডের তাবৎ দেশের দ্রব্য প্রদর্শনার্থ পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ও অতি মহান বস্ত্রশালা দিগ্‌ব্যাপ্ত করিয়াছে। উড্রফ্

সাহেব কাঁচের সূত্র কাটিতেছেন। এক স্থানে লৌহ হইতে উদ্ভাবিত তুলা দেখিলাম। ঐ কাচের সূত্র ও লোহার তুলা গুঁড়া করিলে দানা বোধ হয়, কিন্তু তাহার আঁশ কোমল। বাষ্প প্রক্ষেপ দ্বারা একটি গৃহ এমন শীতল করা হইয়াছিল যে, সেখানে জল জমিয়া যায়।

রাজপুতানা।

জয়পুর।—প্রভাত সময়ে পৌঁছিয়া রেলওয়েসন্নিহিত ঠাকুর ফতেসিং-নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল। দেশের প্রকৃতি বিভিন্ন দেখা যাইতে লাগিল। ভূমি বালুকাময়ী,—স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র শৈল দেখা যাইতেছে। অনতিদূরে শের গড়ের প্রাকার পর্ব্বতের সানুদেশ ঘেরিয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গোবিন জী দর্শন ও নগর দেখিতে চলিলাম। নগর প্রাচীরবেষ্টিত; পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া সুবিস্তৃত রাজপথে সমুপস্থিত হইলাম। বাটী, ঘর সর্ব্বাদি প্রস্তরনির্ম্মিত; ইষ্টক একেবারে নাই। পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী একটি বর্ত্মনী, উত্তর দক্ষিণ বাহী আর একটি পথ ছেদ করিয়া গিয়াছে। উভয় পথের দুই পার্শ্বের বাটী এক প্রণালীতে গঠিত ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। কোনও বাটীর অলিন্দ নাই; বাতায়ন ও গবাক্ষ যে এক পর্য্যায়ের শব্দ, তাহা এখানে প্রমাণিত হইল। সকল বাটীরই উপরে পাথরের জালীর কর্ম্ম শোভমান। পথ-পার্শ্বে জলের কল ও গ্যাসালোকের স্তম্ভ বিরাজমান। রাজবাটী অতি প্রকাণ্ড। বোধ করি, সহরের বার অংশের এক অংশ হইবে। উহাকে বাটী না বলিয়া পল্লী বলা উচিত। একটি প্রাচীরবদ্ধ স্থান, তাহার মধ্যে অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ অট্টালিকা। গোবিনজীর মন্দির রাজার পুষ্পবাটিকায় সংস্থাপিত। শ্রীবৃন্দা-বনে গোবিনজীর প্রাচীন মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ যে এক অভূত পূর্ব্ব দেবালয় আছে, তথা হইতে জয়পুররাজ ঔরঙ্গজেবের ভয়ে এখানে সেই বিগ্রহ আনয়ন করিয়াছিলেন। দিব্য মূর্ত্তি! একজন ভক্ত কহিল, যতবার দেখ, পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা হইবে। পূজারিরা বাঙ্গালী, আমাদিগকে নবাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা-বাদ করিল। এখান হইতে এক বৃহৎ জলাশয়-তীরে যাওয়া গেল; উহাতে

বহু কুম্ভীর বাস করে। কৌতুক দেখিবার জন্য মাংস আনান হইয়াছিল, তত্রত্য অস্ত্রেবাসি উহা রজ্জুবদ্ধ করিয়া জলে প্রক্ষেপ করতঃ নক্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। বহুদূরে দেখা গেল, একটা কুম্ভীর জল কাটিয়া আসিতেছে। বার বার ডাকাতে অনেক গুলি নক্র আসিয়া জুটিল। তখন তাহারা মাংসখণ্ড-বদ্ধ-রজ্জু ক্রমশঃ টানিয়া লইতে লাগিল; অতঃপর কুম্ভীরগুলা জল ছাড়া হইলে তাহাদের ভয়াবহ মুখ-কন্দর স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। বেলা অধিক হওয়ায়, গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বিনা অনুমতিতে রাজপ্রাসাদ দেখিবার সম্ভাবনা নাই, সে জন্য বৃটিশ রেসিডেণ্টকে পত্র লিখিয়া আজ্ঞালিপি আনাইলাম। আহারান্তে রেসিডেন্সি হইতে একজন বার্ত্তাবহ আসিয়া রাজপুরে লইয়া গেল। প্রাচীরের পর প্রাচীর অতিক্রমণ করিতে করিতে অনেক গুলি মণ্ডপ ও হর্ম্ম্য দেখিলাম। কাশীর ও দিল্লীর মানমন্দির অপেক্ষা এখানকার জ্যোতিষ শালায় অধিক বস্তু আছে এবং অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে, বোধ হয় যেন নূতন। কিন্তু আমাদের পক্ষে উহা কেবল "যন্ত্র মন্ত্র"। যন্ত্র মন্ত্র শব্দে অবিজ্ঞেয় বুঝায়। দিল্লীর অধিবাসীরা সেখানকার মানমন্দিরকে যন্ত্র মন্ত্র নামে অভিহিত করে। জয়পুরের শিল্পবিদ্যালয় ও চিত্রশালিকা দেখা হইল। চিত্রশালায় বাঙ্গালা অক্ষর-অঙ্কিত হিরণ্য মুদ্রা দেখিলাম। পরিশেষে রাম-নিবাস উদ্যানের ছায়াগৃহে বসিয়া দিবসের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করা হইল। অর্দ্ধরাত্রে জয়পুর ত্যাগ করিলাম।

আজমীর।—(অজমীঢ়) পুষ্কর এখান হইতে তিন ক্রোশ। বাষ্পীয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ একাযোগে "পুষ্করতীর্থ" পুষ্কর অভিমুখে ধাবমান হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দুইটি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আজমীরবাসী। সে দিন রবিবার বলিয়া পুষ্কর যাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, আজমীরে যাঁহার বাটীতে আমাদিগের থাকিবার কথা, নাম বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, আর একজনকে আমার পরিচিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে চিনিয়াছিলেন,—বোধ হয়, শিবচন্দ্র বাবুর নিকট পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। কথার সম্প্রসারণ করিতে করিতে আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনার নাম নন্দ বাবু (মুখোপাধ্যায়) না? তিনি বলিলেন, হাঁ। ১৩।১৪ বৎসর পরে সাক্ষাৎ এবং অসম্ভাবিত রূপে দেখা হইল, এখন শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে

পারি নাই। সমতল ভূমিত্যাগ করিয়া পাহাড় কাটিয়া পথ গিয়াছে। সে জন্য এখানে কিয়দ্দূর পদব্রজে চলা আবশ্যক হইয়াছিল। নন্দলাল বাবুর সহিত বহু পুরাতন কথাপ্রসঙ্গে অতি সুখে চলিলাম। এখানকার পাহাড় দেখিলে মাড়ওয়ার দেশে অর্থাৎ মরুস্থলীতে যে আসিয়াছি, তাহা বুঝা যায়। শৈল তরুগুল্মহীন। মনসাগাছের মত একরূপ উদ্ভিদ পর্ব্বতে রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও পত্রহীন। গিরিবরের বর্ণও তদুপযোগী, যেন দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পুষ্কর হ্রদের তিন-দিক্ বাঁধান। উপরে নানাদেশীয় রাজগণ ও বণিকবৃন্দ দেবালয় ও আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মার মন্দির মহারাজ হোলকার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের মধ্যে ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মার মন্দির নাই। বেলা অধিক হইয়াছিল বলিয়া সাবিত্রী পর্ব্বতে যাওয়া হইল না। পাণ্ডা কহিল, বাঙ্গালী রমণীদের নিকট সাবিত্রী-দেবীর অতিশয় গৌরব আছে। অন্যান্য দেশীয় যাত্রী সে পাহাড়ে প্রায় যায় না। এখানে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইল। মালপুয়া, পকৌড়ী ও পচা দধির রায়তা অতি উপাদেয় বুঝিয়া পাণ্ডাজী আহরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে বিধাতা আজকার জন্য উহাই মাপাইলেন। অপরাহ্ণ-কালে আজমীরে প্রত্যাগমন করা হইল। জয়পুরের মত এখানকার বাটীসকল প্রস্তরগ্রথিত ও অতিশয় পরিষ্কার। সহরটিও প্রাচীরবেষ্টিত। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া এক দেবালয়ে গীতবাদ্যশ্রবণে কালাতিপাত করা গেল। রজনীযোগে সাঁঝি নামক উৎসব দেখিলাম। প্রত্যেক পল্লীতে একটা স্থান চন্দ্রাতপ দ্বারা আবৃত হইয়া আলোকমালায় সজ্জিত রহিয়াছে ও বিবিধ চিত্র আলম্বিত হইয়াছে। ধরাতলে নানা বর্ণের চূর্ণ দ্বারা আসন বা মণ্ডল রচিত হইয়াছে। কি উদ্দেশে এ অনুষ্ঠান, জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত উত্তর পাইলাম না। প্রসন্ন বাবু অতি সদাশয়, এখানে সপরিবারে আছেন, তাঁহার অনেক গুলি কন্যা সন্তান। আমাদের আতিথ্য-সৎকার অতি যত্নের সহিত সমাপন করিলেন। বোধ হইল যেন, কোন পরম আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি।

পরদিন প্রাতঃকালে তারাগড় নামক গিরিদুর্গের উপর উঠা গেল। এখান হইতে অজমেঢ় নগর অতি সুন্দর দেখায়। ধবলাকার বাটীগুলি দূরে ঘন-সমাবিষ্ট, যেন শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত সহর বলিয়া প্রতীত হয়। অন্যদিকে তরু-শস্প-শোভিত শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দূরবিচ্ছিন্ন ইংরাজী বাংলাগুলি চমৎকার

দেখাইতেছে। আয়নাসাগরটি নিকট হইলে আরও রূপের ঘটা বাড়িত। কাশ্মীরে তখৎ-ই-সুলেমান্ হইতে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, তাহা অতুলনীয়। কিন্তু নগরের শোভা এমন আর বুঝি কোথাও দেখিব না। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আড়াহি দিন কা ঝোপড়া নামক এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। তাহার কারুকার্য্য চমৎকার। এই স্থান ১২১১—৩৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ভজনালয়ে পরিণত হইয়াছে। বেলা ১০ টার সময় যাত্রা করিয়া রাত্রি ২ টার সময় আবুরোড ষ্টেশনে পৌঁছান গেল। ষ্টেশনমাষ্টার হিন্দুস্থানি, অতি ভদ্রলোক। রিফ্রেস্‌মেণ্টরুমে সে রাত্রে আমাদিগকে স্থান দিলেন।

আবুজী।
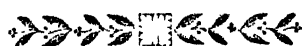
অর্ব্বুদাচল আর্ব্বলি পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার অপর নাম গুরুশিখর। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। ঝাঁপানে করিয়া শৈলে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। প্রাকৃতিক শোভা মন্দ নহে। চেনার বৃক্ষের ন্যায় কডু নামে এক রূপ শ্বেত বৃক্ষ দেখিলাম। হিংস্র জন্তু এ পর্ব্বতে অনেক। অসভ্য ভীল জাতির ভয়ে পূর্ব্বে এস্থানে আসা বড় সহজ সাধ্য ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দুর্দ্দান্ত ইংরাজশাসনে সেই ভীলজাতি ধনুর্ব্বাণ লইয়া আড্ডায় আড্ডায় শান্তি-রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছে। ক্রমশঃ ইংরাজসমাশ্রয় আবু অতিক্রম করিয়া দিলওয়াড়ায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল। ভিত্তি-বেষ্টিত একস্থানে কয়েকটি মলিন দেবায়তন রহিয়াছে দেখা যাইতে লাগিল। ইহার কিছুমাত্র সমৃদ্ধি নাই। হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মুখে বাক্য সরে না। কি ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছি, আর এখন কি দেখিতেছি, আমার সহচরকে কিছু বলিতে পারিলাম না। তিনিও সে বিষয়ে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। নীরবে দুইজনে চেয়ার হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি শ্রাবক? আমরা কহিলাম, না, বৈষ্ণব। শাক্ত বলিলে বুঝিবে না, এজন্য বৈষ্ণব বলিয়া

পরিচয় দিতে হইল। সে আমাদিগকে কোন মহাজন অর্থাৎ বণিক ভাবিয়া বাসের জন্ত এক গৃহ খুলিয়া দিল। মন্দির মধ্যে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর দুইজন দ্বারবান্ আর এক প্রাচীরের মধ্যে লইয়া চলিল। সেখানে গিয়া আরও নিরাশ হইলাম। একটি ঘর খুলিল, তাহার মধ্যে মন্দির নির্ম্মাতা বিমলসাহ ও তদীয় শেঠানীর (শেঠপত্নীর) মূর্ত্তি রহিয়াছে। দশটা শ্বেত হস্তী ও আরোহীর মূর্ত্তি গৃহের মধ্যস্থলে বিরাজমান। ভাবিলাম খুব দেখা হইল—এই দেখিতে এত পরিশ্রম করিয়া খিরওয়াড়ি হইতে আসিয়াছি কি?

এমন সময় একজন কুঞ্জি লইয়া আসিল। অপর দিকে আর এক দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। উহা আর একটি মহল। অহো! যেন বৈকুণ্ঠের দ্বার খোলা হইল। সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত। স্তরে স্তরে যেন পুষ্পরাশি রহিয়াছে। চিত্তমলা দূর হইল—নয়ন ও মন জুড়াইল। ধর্ম্ম মন্দির বাহির হইতে আড়ম্বর শূন্য দেখায় ভাল, অথবা দস্যুর যাহাতে লোভনীয় না হয়, এই উদ্দেশেই বোধ হয়, এই অতুল সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। আমাদের সহিত দ্বাদশ জন বাহক ছিল,—তাহারাও এই সুযোগে দেখিয়া লইবে বলিয়া প্রবেশ করিতে চাহিল। প্রহরী তাহাদের জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিতে দিল। চৌর্য্য যাহাদের কুলাচার, সেই জাতি না হয় এই অভিপ্রায়েই বোধ হয়, প্রহরীগণ জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। স্থানটি ১২৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৭২ হস্ত প্রস্থ হইবে। ভিত্তির ভিতর অংশে দৈর্ঘ্যের দিকে ১৭ ও প্রস্থের দিকে ১০টি করিয়া কুঠরি। কুঠরির সম্মুখে যুগ্ম স্তম্ভশ্রেণী-সজ্জিত দালান চলিয়াছে। প্রতি কুঠরিতে এক ক্ষুদ্র বেদি, তাহাতে উত্তান পাণিপাদ ধ্যানাবলম্বিত তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি। প্রতি চতুঃস্তম্ভ অন্তরালে সমতল বা খিলানের মত ছাদ। এতৎসমস্তই উৎকৃষ্ট মারবল-নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ, ছাদের খিলান এবং বেদির প্রাকার বিভিন্ন ও শিল্পের অলঙ্কারও ভিন্ন প্রকারের। উহার কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য ও নির্ম্মাণের সৌন্দর্য্য বর্ণনার আয়ত্ত নহে। এ সকল ছাড়াইয়া মন্দির সম্মুখে মণ্ডপ। ইহাতে যে স্তম্ভ শ্রেণী আছে, তাহার কারুকার্য্য অতি বিস্ময়কর! যেন হস্তিদন্ত খুদিয়া ফুল, পাতা ও কাণ্ড বাহির করিয়াছে। স্তম্ভ গাত্রে উপরে একটা স্তর রাখিয়া মধ্যে আর একটা কারুকার্য্যের স্তর নির্ম্মাণ নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। ছাদের ভিতর দিক্ ফুলের আকারসদৃশ গহ্বরে পূর্ণভাবে খোদিত বা জৈন পৌরাণিক মূর্ত্তি পূর্ণ।

'নক্কাশীর' কর্ম্ম-বিহীন এক অঙ্গুল পরিমিত স্থান পাওয়া দুষ্কর। এরূপ অভিপূর্ণ খোদকারীর কর্ম্মে ভারতবর্ষে ইহার প্রতিযোগী নাই। তাজমহল 'পচ্চিকারী' কর্ম্মের জন্য অতুল, খোদকারীর জন্য নহে। যে তাজমহল দেখিয়াছে, তাহার একবার বিমলসা দেখা কর্ত্তব্য। সম্রাট জাঁহাঙ্গিরের পূর্ব্বে প্রস্তরের উপর "পচ্চিকারী" কর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজ পুরাণকার কহেন, সাজাহানের কর্ম্মে কয়েকজন ইউরোপীয় শিল্পি ছিল তাহাদের শিক্ষা অনুসারে "নগোঁকা কাম" করা হয়। এই কথায় আমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই।

উল্লিখিত শিল্পে দুইটি অভাব দেখিলাম, রঙ্গিন পুষ্প ও পত্র নির্ম্মাণে আলোক ছায়ার ভেদ নাই। আর স্বাভাবিক পুষ্পের অনুকরণ না করিয়া কাল্পনিক আদর্শের পুষ্প বিনির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমটির কথা ছাড়িয়া দ্বিতীয় বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে, যে এ দেশ অদ্ভুতপ্রিয়। সুতরাং শিল্পির রুচি কি করিয়া স্বভাবের দিকে যাইবে? কিন্তু সুন্দর কল্পিত বিষয় প্রদর্শন করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। আপনাকে আপনি প্রকাশ করাই তাহার কাজ। শিল্পের নিজের একটা জীবন আছে। প্রাণি জগৎ বা নৈসর্গিক সামগ্রীর যে অনুকরণ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নহে।

বিমলসার মারবল চন্দ্রবতি নামক স্থান হইতে আনীত। কথিত আছে পূর্ব্বে এই স্থানে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। পূজককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূমির মূল্য এত রজত মুদ্রা দিতে হইয়াছে, যে সেই টাকা এক একটী করিয়া রাখিলে, ক্রীত ভূমি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গুজ্জর দেশান্তর্গত পাটন নিবাসী বণিকশ্রেষ্ঠ বিমলসাহ অষ্টাদশ কোটী মুদ্রা ব্যয়ে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। ইহা প্রস্তুত হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইদানীং সিরোহি ও অহম্মদাবাদ নগরস্থ পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে। যে সকল শ্রাবক তীর্থ যাত্রা করিতে আগমন করে, তাহারা সঙ্গতি অনুসারে দশ টাকা হইতে সহস্র টাকা পর্য্যন্ত ভাণ্ডারে জমা দেয়। তদ্দারা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। পূজারি ও সশস্ত্র দ্বাররক্ষক সংখ্যায় ষোল জন। মন্দিরে কোনও যতি নাই। পূজারি ও যতি ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে গৃহীত হয়। এই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া তেজপাল ও বস্তুপাল ভ্রাতৃদ্বয় নির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা গেল। ১১৯৭ হইতে

১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই দেবালয় প্রস্তুত হইয়াছে। চতুঃশালী অলিন্দ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই বিমলসার ন্যায়। কিন্তু কারুকার্য্যের পারিপাট্য তদপেক্ষা অধিক। মন্দিরের মুখে উভয় পার্শ্বে জেঠানী ও দেবরাণীর দুইটী তাখ। তাহার নকাসী এমন সূক্ষ্ম যে,.এক একটা প্রস্তুত করিতে কথিত আছে সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তেজপাল, বস্তুপাল নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিলে তাঁহাদের পত্নীদ্বয় কহিল ;—"ইহাত তোমাদের হইল, আমাদিগের জন্য কি করিলে ?" তাহাতেই এই তাখ দুইটী বিনির্ম্মিত হয় ও সেই জন্যই ইহার নাম জেঠানী ও দেবরাণীর তাখ হইয়াছে। প্রবাদ আছে, স্থপতিগণ নকশা খুদিতে যে পাথরের গুঁড়া বাহির করিত, তাহা ওজন করিয়া যতটুকু হইত, ততখানি ওজনের রৌপ্য ঐ কার্য্যের বেতন পাইত। ফলতঃ খোদকারীর গভীরতা অতিশয় দেখা গেল। এপ্রকার ভাস্কর্য্য যাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের স্থাপত্য বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান ছিল, সন্দেহ নাই।

সায়ংকালে আরতি দেখিবার জন্য বিমল সাহের মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের অতি প্রকাণ্ড অরুণ বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দীপালোকে মণিময় কণ্ঠভূষা উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। চক্ষু দুইটী হীরার, কর ভূষণ তদুপযুক্ত স্বর্ণ-নির্ম্মিত। এখান হইতে ,তেজপালের মন্দিরে যাওয়া হইল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত শেষ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নাতিদীর্ঘ মূর্ত্তি নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। আরতির দীপ নামাইবার জন্য আমাকে সওয়া মন ঘৃত মানসিক করিতে কহিল। সেই দীপ লইয়া মন্দিরস্থ অন্যান্য মূর্ত্তির আরতি করিয়া বহির্দেশের তাবৎ মন্দিরে আরতি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমরা দুইজনে ভক্ত শ্রাবকের মত অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। তাহাতে সমস্ত দেবালয় দেখা হইল। বিমলসা তেজপাল ও বস্তুপালের মন্দির ভিন্ন অপরগুলি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত নহে। জৈন যাত্রীদের সহিত বিবিধপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ যাপন করিয়া শয়ন করিলাম। ঋষভদেবের বক্ষঃবিলম্বিত বড় বড় মরকত গুলার দীপ্তি বার বার মনে হইতে লাগিল। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুই শ্রেণী আছে। শ্বেতাম্বরী শ্রেণী বোধ হয় লোপ হইয়াছে। দিগম্বরীরা মহাপুরুষের মূর্ত্তিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবে, কিন্তু বস্ত্র পরাইবে না। কারণ

তাহা হইলে নিগ্রন্থ অর্থাৎ বন্ধন রহিত হওয়া যায় না। যেমন অন্তরে সঙ্গরহিত, তেমনি বাহ্য শরীরেও বস্ত্রাদি সঙ্গরহিত না হইলে কি চলে? বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মিশ্রণে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি। মাধবাচার্য্য উপহাস করিয়া বলিয়াছেন,—এ ধর্ম্মে কেবল বিশেষের মধ্যে পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোলুঞ্চন, ও মুখবন্ধন আছে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম মহাবীর। এই ধর্ম্মে জগৎকে "জন্য" কহে না, অথচ কোনও সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন এমন বিবেচনা করিয়া থাকে। যে সকল মহাপুরুষ যোগবলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হন ও তাঁহারাই জিন। জিয়তি রাগদ্বেষ মোহানিতি জিনঃ। পূজা পদ্ধতি ;— ওঁম্ শ্রীং ঋষভেয় স্বস্তি। ওঁম্ হ্রীংহম্, ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যো নমঃ। ওঁম্ হ্রাং হ্রীংম্ সর্ব্বজিন চৈত্যালেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ।*

কাশী অঞ্চলে বণিয়াদের মধ্যে এক জাতিতে জৈন ও হিন্দু উভয় মতাবলম্বী আছে। এক্ষণে অনেক জৈন হিন্দু হইতেছে। জৈনেরা যে হিন্দু নহে, এমন বলিতেছি না। উহাদিগের শাস্ত্র পৃথক্, এই জন্য উক্ত প্রকার বলিতে হয়। জিনের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যাহারা বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে জৈন হইতে হিন্দু হওয়া বলা হইল। কাশীতে আগরওয়ালারা প্রায় অর্দ্ধেক জৈন। অনেক স্থানে জৈন ও বৈষ্ণব আগরওয়ালার বিবাহ হয়। বৈষ্ণব স্বামী যদি জৈন স্ত্রী গ্রহণ করেন, সে স্ত্রী বৈষ্ণব হইবে। জৈন স্বামী যদি বৈষ্ণব স্ত্রী গ্রহণ করেন, সে জৈন হইবে না—এবং সমর্থ পক্ষে আপনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইবে। মৈনপুরী হইতে আগত কাশীতে বৌদ্ধমতি নামে জৈন আছে। ধর্ম্ম স্বভাবতঃই খিচুড়ি হইবার জিনিস। মোরাদাবাদ ও বিজনোরে বিষ্ণুই বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা কোরাণ পাঠ করিয়া থাকে এবং একাদশীর ব্রত করে। উভয় কার্য্য এক ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, জিনধর্ম্ম বুদ্ধধর্ম্ম হইতে সঞ্জাত নহে। বহুকাল ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জৈন আখ্যায়িকাগুলি আলোচনা করিলে তাহার মূল বৌদ্ধধর্ম্ম ও আমাদিগের পুরাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরা বেদ মানে না বলিয়া হিন্দুর শত সহস্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পায় নাই

* বঙ্গদর্শন। জৈন ধর্ম্ম।

হিন্দু শাস্ত্রে বিরুদ্ধ মতও আছে। থাকিবারই কথা। হিন্দু জাতি একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কখনও চির-নিয়ন্তা ভাবে নাই। তাহাদের শাস্ত্র একজনে লিখে নাই। এক সময়ের লেখাও নহে। দেশ কাল পাত্র ভেদে যখন যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া সমাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহাই তখনকার হিন্দুধর্ম্ম। নানা ঋষি (পণ্ডিত) গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহার সকলগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই। এখানে সমাজ ও ধর্ম্ম এক কথা। সমাজ না মানিলে ধর্ম্ম যায়। তোমার পরলোক বা ইহলোক সম্বন্ধে চলিত মত ভিন্ন যদি অন্য মত থাকে এবং হিন্দু সমাজের আচার ত্যাগ না কর, তবে তুমিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বর-নাস্তিককে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম নাস্তিককে গ্রহণ করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম যাহা মানিয়াছে, তাহা এখন মানে না। যাহা এখন মানিতেছে, তাহা অতঃপর মানিবে না। সমাজ এক, এই জন্য শাস্ত্র এক বলিতে হয়। সমাজের লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন, এজন্য শাস্ত্রের মত এক নহে। সকলের জ্ঞান সমান নহে, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা কি করিয়া এক হইবে? উপনিষদে লিখিত আছে, যিনি বলেন, ঈশ্বরকে জানা যায়, তিনি ঈশ্বরকে জানেন না। যিনি বলেন, ঈশ্বরকে জানা যায় না, তিনি ঈশ্বর জানেন। যিনি বলেন ঈশ্বর জানা যায়, তিনি ঈশ্বরকে জানেন না, এ বাক্যের ভক্তি শাস্ত্রসম্মত অর্থ হইলে হইতে পারে। কিন্তু যিনি বলেন, ঈশ্বরকে জানা যায় না, তিনিই ঈশ্বরকে জানেন; এ কথার অর্থ কি? যাহা জানা যায় না, তাহার আবার জানা কি? অবশ্য "নাই" এই কথাকে জানা বুঝাইতেছে। পূর্ব্ব মীমাংসা প্রণেতা মহামুনি বলেন, যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ফল দেবতা দেন না, আপনা হইতেই হয়। দেবতা নাই। যাহা নাই তাহার জন্য কিন্তু কার্য্য চাই। সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না। তিনি সংখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন, সৃষ্টির মূল পদার্থগুলি গণনা করিয়া যতগুলি সংখ্যক হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বর ধরিতে হয় না। কিন্তু বেদ মানেন। বেদ তখনকার সমাজের শাস্ত্র। ঈশ্বর না মানিলে চলে, কিন্তু সমাজ না মানিলে চলে না। সমাজ মানিতে হইলে সুতরাং বেদ মানিতে হয়। নহিলে জৈন বৌদ্ধবৎ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পড়িতে হয়।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিমলা মন্দিরের মণ্ডপে গিয়া বসি-

লাম। কোনও স্থানের মাধুর্য্য সম্যক্ উপভোগ করিতে হইলে, বসিয়া দেখা আমার অভ্যাস। মন্দিরের চিত্রখানি কথঞ্চিৎ হৃদয়ে আঁকিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। অতিশয় সভ্য অবস্থাতেও পুরাতন আদিম রীতির চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় বলপূর্ব্বক স্ত্রী হরণ করিয়া ভার্য্যা করা হইত; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ ভিন্ন কার্য্য সমাধা হইত না। অধুনা সেই প্রথার অনুকরণে রহস্য ভাবে বরকে লঘু প্রহার সহ্য করিতে হয়। সেইরূপ স্থপতি কার্য্যেও আদিম প্রথার চিহ্ন ঘুচে নাই। এই যে বিমলসার মন্দির, যেখানে স্থপতিবিদ্যা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেখানেও বৃক্ষকাণ্ড ও শাখার আদর্শ হইতে যে স্তম্ভের উৎপত্তি, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। বৃক্ষকাণ্ড সকল সমোচ্চ না হওয়ায়, পাড় সংস্থাপনের যে অসুবিধা ঘটিত, তাহা নিবারণার্থে খর্ব্বতর গুলির অগ্রভাগে প্রস্তর ফলক প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হইত। এইরূপ আদর্শ হইতেই স্তম্ভাগ্র বা বোধিকার সৃষ্টি হইয়াছে। অধিস্থান অর্থাৎ থামের গোড়াবন্দির নির্ম্মাণ রীতিও প্রায় উক্ত প্রকারে অদ্ভুত হইয়াছিল। আরব জাতির গৃহ নির্ম্মাণ তাম্বুর অনুকরণে। তাহারা পূর্ব্বে বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। কারণ উহারা বহুদিন এক স্থানে স্থায়ী হইত না। সেই জন্য ইদানীং তাহাদের হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রণালীতে কলুবা এত অধিক দেখা যায়। বঙ্গদেশীয় শিবালয় দেখিলে ঠিক যেন খড়ুয়া ঘরের আকার প্রতিভাত হয়। যেন শাঁখার অনুকরণে বাউটী প্রস্তুত হইয়াছে। যেটি মূল গঠন, তাহা অবিকৃত আছে। আনুসঙ্গিক বিষয়ে বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আদিম কালের বৃক্ষ কাণ্ডের রীতিতে সেই স্তম্ভাগ্র বসান প্রথা আছে, কিন্তু পুষ্পবোধিকা, তরঙ্গবোধিকা প্রভৃতির শিল্প, অধিস্থান উপপীঠ প্রভৃতির সমৃদ্ধি, স্তম্ভবপু ও প্রস্তরাগ্রের কারুকার্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অন্য জগতে আসিয়া পড়িতে হয়। ভারতীয় মন্দির নির্ম্মাণ প্রণালী পাঁচ প্রকার; বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, তামিল ও কাশ্মিরী। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও নেপালের বৌদ্ধ-স্থাপত্য পরস্পর বিভিন্ন। উড়িষ্যা, মধ্য ভারতীয়, বাঙ্গালা এবং কাশী অঞ্চলের মন্দির এক প্রকার নহে। এতদ্ভিন্ন মিশ্র বা হিন্দু সারাসেনিক মন্দির আছে।

অদ্যই আহম্মদাবাদ যাত্রা করিব। স্নান, ভোজন আবুরোড় ষ্টেশনে হইবে।

ভৃত্য একাকী আমাদের প্রতীক্ষায় খিরওয়াড়ির বাসায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল চিন্তা করিয়া মণ্ডপ হইতে উঠিতে হইল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সহিত চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া বার বার শেষ দেখা দেখিয়া লইতে লাগিলাম। আমার চরণ যুগল কে যেন নিগড়বদ্ধ করিয়া গতি নিবারণ করিতে লাগিল। এমন সময় প্রহরী সেই সৌন্দর্য্যের শলামভূত প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করিল। ধর্ম্ম-শালায় আসিয়া বস্ত্রাদি লইয়া যাত্রা করিলাম। আবুজী হইতে আবুরোড ৭ ক্রোশ। পৌঁছিয়া শুনিলাম, অদ্য আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না। আমার গাইড পুস্তকে যে সময় লিখিত আছে, তাহা প্রকৃত নহে। অপরাহ্ণ কালটা বারান্দায় বসিয়া রাজপুতানার প্রকৃতিপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এদেশে বুঝি সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে। উষ্ট্রপালক কয়েকটা উষ্ট্র লইয়া যাইতেছে, তাহারও হাতে বন্দুক। সাদৃশ্য ও সম্প্রসারণে চিন্তা ফিরে। আমার এখানে কলিকাতা ইন্টার ন্যাশনেল এক্জিবিসন মনে পড়িল। রাজপুতানা প্রকোষ্ঠে অস্ত্র শস্ত্র ভিন্ন আর বড় কিছু ছিল না। ইহাই বোধ হয়, এখানকার প্রধান বস্তু। দুই চাবিটার নামোল্লেখ করা যাক্। তরবার—লহের দরিয়া, দোহেরি, কষ্টিদোদরি, ধুপ, তেগদালিলখানি, শমশের অরাদম, খণ্ডাঅলৈমণি, নাগফনা। তরফনা কটার—ইশ্পাতের কমান অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ, ভালা, নাগপাশ, ফুলহরি, তবল, তমাচা, বন্দুক—পথুরদার ও টোপিদার, খঞ্জর প্রভৃতি।

গুর্জ্জর।

রাজপুতানার মরুভূমি, মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব নগর ও ওয়েসিস্ প্রভৃতি শব্দগুলি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু দেখা হইল না। চিরবাঞ্ছিত চিতোর দর্শনের কামনা বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমে বাষ্পীয় শকটে গুর্জ্জর দেশের সিকতাযুক্ত ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলাম। জোয়ারা ও বাজরার ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। কৃষাণ বালক বালিকাগণ ধুমযান দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আর স্ত্রীলোকের ঘাগরা দেখা গেল না, তাহাদের পরিধেয় এক্ষণে লঘুবস্ত্র। করভূষণ লোহিত কাষ্ঠের একখানি করিয়া বাঁউড়ি। গাড়ির মধ্য হইতে দেখাইয়া "এই গ্রামখানি গাইকোয়াড়ের, এই খানি ইংরাজের" লোকে ইত্যাকার কথোপকথন করিতেছে। রাজপুতানা মালয়া রেলওয়ের ষ্টেশন গৃহগুলি সমস্ত কঙ্গুরাদার। এস্থানে আরোহীদিগকে জল কিনিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। "ব্রাহ্মনীয়া পানি" ও "মুসলমানী পানি" বলিয়া জাতি খ্যাপন করিয়া জল দিয়া বেড়াইতেছে। সাবরমতি জংশনে আমাদের টিকিটগুলি লইল। অহম্মদাবাদ পরবর্ত্তী ষ্টেশন। অনতিবিলম্বে সাবরমতি সেতু পার হইয়া অহম্মদাবাদ নগর মধ্যে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইবামাত্র বাড়ীওয়ালা ও বাড়ীওয়ালাদিগকে দেখিতে পাইলাম। একজনের সঙ্গে বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। বেলা অবসান দেখিয়া তখনি "শীঘ্রং" (সিগরাম) ভাড়া করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ঘর বাড়ীর আকার সুন্দর নহে, সমস্তই খোলার চাল। আমরা প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এক পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, একটা পুরদ্বারের মধ্যে অসংখ্য লোহিত বর্ণের বৃহদাকার উষ্ণীষ প্রাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানের নাম মানিক চৌক। উষ্ণীষধারীগণ রথ্যা সমাকীর্ণ করিয়া বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। আমার চক্ষে প্রথমতঃ মানুষ পড়ে নাই, কেবল পাগড়ির সমুদ্র নয়নগোচর হইয়াছিল। ক্রমে তিন দরওয়াজা ছাড়াইয়া ভদ্রকালী মাতা দর্শন করিতে অবরোহণ করিতে হইল। আমাদের আগমন বিষয়ে দুই একজন নাগরিক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্থানটি

বিলক্ষণ সমৃদ্ধ। প্রাচীন মহত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পরদিন প্রাতে গাড়িওয়ালাকে সহায় করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে সুলতান অহম্মদ শাহ কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে এ স্থানের নাম অশ্ববল ও কোনও সময়ে কর্ণাবতী ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজমান্য রাজেশ্বর পেশওয়ার হস্ত হইতে ইহা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। হঠিভাই নির্ম্মিত জৈনমন্দির দেখা হইল। পথিমধ্যে নগরশেঠ প্রেমাভাইয়ের বাটী পাওয়া গেল। কিছুদিন হইল ইনি দুইটি যমজ কুমারীর একটি আপনি বিবাহ করেন, অপরটি পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। জুম্মা মসজিদ, রাণীকা রৌজা, ভীল তনয়া রাণী শিপরী ও শাঅলমকা রৌজা এবং বাদসাহদের গোরস্থান প্রভৃতি ভাস্করের কর্ম্ম অতি বিচিত্র। গুজরাতের মুসলমান রাজা অহম্মদ শা ও শাঅলম প্রভৃতি হিন্দুবংশ-সম্ভূত ছিলেন, এজন্য তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বাটী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ সারাসেনিক অর্থাৎ আরবা ভাবাপন্ন নহে। কঙ্করিয়া তলাও অতি মনোরম স্থান। ইহার প্রাচীন নাম হৌজ-ই-কুতব। ১৪৫১ অব্দে সুলতান কুতবউদ্দীন (গুজরাতের রাজা) এই সরোবর খাত করেন। ইহার চতুর্দ্দিক্ সোপানবদ্ধ ছিল। জলাশয়টি চারিদিকে ১ মাইল হইবে। মধ্যস্থলে এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম নগিনা অর্থাৎ অঙ্গুরী মধ্যবর্ত্তী রত্ন। ঐ দ্বীপে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ শোভমান। মধ্যস্থলে ঘটমণ্ডল। তীর হইতে দ্বীপে যাইবার জন্য তৃণ-শষ্প-শোভিত সুন্দর পথ—সেতু নহে। কয়েক বৎসর হইল, কালেক্টর সাহেব সংস্কার দ্বারা এই সরোবরের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা বিধান করিয়াছেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সারঙ্গি লইয়া উপস্থিত। তাহার ব্যবসায় নৃত্যগীত। অসময় বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে কহিলাম। সে স্বীয় যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া, অঙ্গরক্ষা সরাইয়া উদর দেখাইল, সুতরাং তাহাকে কিছু দিয়া বিদায় করিতে হইল। তিনি কিছু পাইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার সতীর্থ বাণা স্কন্ধে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিষ্কামভাবে কেবল আশীর্ব্বাদটি করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম।

বড়োদা।—রজনীর শেষ ভাগে গাড়ি হইতে নামিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইতে হইল। তখন উপরে রৌশন চৌকি বাজিতেছে। প্রভাতে উঠিয়া দেখি সেটি এক দেবালয়। এদেশে যে ব্যক্তি দেব গৃহ নির্ম্মাণ করে, সে পান্থনিবাসেরও

ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আমরা এক্ষণে আবার পবিত্র হিন্দুরাজ্যে সমাগত। সহরে লক্ষাধিক লোকের বাস। যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, প্রধান রাজপথটি অতিশয় সমৃদ্ধ। মতিবাগ ও নজরবাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া, বেচড়াজীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ভবানী মূর্ত্তি আপাদ মস্তক হীরক অলঙ্কারে ভূষিত। আজ মহাষ্টমী। বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। গাইকোয়াড় স্বয়ং অর্চনা করিয়া গেলেন। প্রাঙ্গণে গরবো নামক সঙ্গীত হইতেছে। প্রথমতঃ একজন প্রগল্‌ভা রমণী রঙ্গস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। তিনি সহচরীগণকে আহ্বান করিয়া মণ্ডলী-কৃত করিলেন। সংখ্যা ন্যূন হওয়ায় যাহারা গান করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহা-দের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইল। "মাতা জীনো গরবো" ইহাতে লজ্জা কি? এই বলিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইলেন। একটি হিন্দি গীত বুঝিতে পারিলাম, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-গোপাঙ্গনা বিষয়ক। গাইবার সময় মূল গায়িকা লজ্জিত হইতে লাগিলেন। রমণীকুলের বসন ভূষণ অতি সুন্দর। যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহারা অভ্যন্তর ভাগে স্থূল অধোংসুক দিয়াছে। নক্ষত্র মালার মত মুক্তাগুচ্ছ কণ্ঠশোভা করিতেছে। তাহার মধ্যস্থিত মণি বক্ষ উজ্জ্বল করিয়াছে। কর্ণভূষণ মণি মুক্তা জড়িত। করভূষণ জড়াও নহে। পাদ ভূষণের পরিসর অতি ভয়ানক। এক একটাতে শৃঙ্গ বাহির হইয়া রহিয়াছে। কোনটা বা ঘণ্টিকা পংক্তি দ্বারা আকীর্ণ। নিশীথকালে পল্লিমধ্যে গরবা উৎসব দেখিতে যাওয়া হইল। পল্লীর মধ্যে একটি সুবিধাজনক স্থানে প্রতিবেশিনী স্ত্রী মণ্ডলী মণ্ডলা-কারে দণ্ডায়মান হইয়া মধ্যবর্ত্তী দীপাধার বেষ্টন করিয়া করতালি প্রদান করতঃ সঙ্গীত ধরিয়াছেন। বিচিত্র বস্ত্র, স্বর ও দীপালোক এই তিনটি একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। দর্শকগণ দলে দলে আসিয়া ঘেরিতেছে। রাধা কৃষ্ণের যুগল ভজন উপলক্ষে গরবার সৃষ্টি। একারণ বাটীর মধ্যে যে নারী অধিক রূপ যৌবন সম্পন্না, তাঁহারি উহাতে যোগ দেওয়া ব্যবস্থা। অবিবাহিত বালক বালিকাগণ রাধা কৃষ্ণের প্রতিনিধি হইয়া দীপের চারিধারে বসিয়াছে। একজন পুরস্ত্রী গান ধরিয়া দিতেছে, আর সকলে অনুবর্ত্তন করি-তেছে। স্বর নিতান্ত মধুর। বহুক্ষণ শ্রবণ করিলেও বিরক্তি বোধ হয় না। তবে সুর একই প্রকারের। তালে তালে ঘন ঘন করতালি দেওয়া হইতেছে এবং সেই সময় একবার তনু আনত করিয়া ঘুরিয়া আসা হইতেছে।

অপরাহ্ণ কালে সওয়ারি বাহির হইল। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র-ভূপতিরা বিজয়ার দিন যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। তাহার পর এমন হইল যে, সে দিন যাত্রা করিয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বাটী আসিলেন। অতঃপর সুযোগ মত যাইয়া শত্রু আক্রমণ হইবে। এক্ষণে আর আক্রমণ নাই, কিন্তু যাত্রাটি আছে। অন্য দেশের রাজাদের মধ্যে এমন প্রথা আছে, বিজয়ার দিন ছত্র বা তরবারি খানি অন্যত্র পাঠাইয়া রাখেন, তাহাতেই যাত্রা হইয়া রহিল। আমাদের গ্রামে রীতি আছে, দশমীর দিন প্রাতে যে বাটীতে পূজা হইয়াছে, গৌরবর্ণ সেই খানে হরিদ্রা রঞ্জিত এক খণ্ড বস্ত্রে একটি টাকা বান্ধিয়া যাত্রা করিতে যায়। পুরোহিত যাত্রার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন, তাহারা দুর্গা প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। বরদা রাজ তারা শুদ্ধ দেখিয়া অগ্র কোন পথে বা কোন দিকে যাত্রা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে ডঙ্কা বাহির হইল। পদাতি সৈন্য ইংরাজ নায়ক কর্তৃক চালিত হইয়া দলে দলে রণবাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছে। সোণা ও রূপার তোপ স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত বৃষভদ্বয় বাহী রৌপ্য নির্ম্মিত শকট যোগে চলিয়াছে। রাজার অমাত্য ও কুটুম্বগণ বহু সংখ্যক হস্তি সমারূঢ় হইয়া যাইতেছেন। একদল কচ্ছদেশীয় সৈন্য সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে সজ্জিত হইয়া কাড়া ও সানাই বাজাইয়া চলিয়াছে। কতকগুলি অশ্বারূঢ় অনুচরকে পশ্চাৎ রাখিয়া পর্ব্বতের মত উচ্চ হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ সিংহাসনে মহারাজাশ্রী সয়াজীরাও গায়কয়াড় সেনাখাস খেল শমশের বাহাদুর প্রজাবর্গকে প্রত্যভিবাদন করতঃ মন্থর গতিতে ভুবন কাঁপাইয়া চলিয়াছেন। পশ্চাৎ ভাগে বৃদ্ধ মন্ত্রী কাজি সাহেবদ্দীন সমাসীন। এই অভিযানে অশ্বারোহী সৈন্য দেখিলাম না। পতাকায় রাজ চিহ্ন আস ও অশ্বজজ্বা। মহারাষ্ট্র জাতীর অভ্যুদয়ের হেতু স্বরূপ যে ঐ দুইটি, তাহা সকলেই জানেন। ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছিয়া মহারাজ শোণ পত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খণ্ডেরাও গাইকয়াড় স্বহস্তে একটি মহিষ শাবক (পাড়া) হনন করিয়া তাহার রক্তে তিলক পরিয়া দাদার উপসংহার করিতেন। অন্যান্য স্থানে (বিকলে) পুরদ্বারের বাহিরে দশরার দিন পাড়া মারিবার প্রথা অদ্যাপি আছে। মানুষ মারিবার কাল গিয়াছে বলিয়া পশু অনুকল্প হইয়াছে। সভ্যতার আরও উন্নতি হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য, একজন প্রজা একটি নরহত্যা করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে; কিন্তু রাজা যুদ্ধের নাম করিয়া

সহস্র সহস্র প্রাণি-সংহার করিলেও নিন্দনীয় হন না। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কেবল সওয়ারির কথা মনে উঠিতে লাগিল। তুরঙ্গমের সেই আস্কন্দিত, বল্গতি ও প্লুত গতি যেন সম্মুখে বর্ত্তমান। পত্তি সংহতি যেন গায়কোয়াড়কে বন্দুক আনত করিয়া সামরিক অভিবাদন করিতেছে। এখনও হিন্দু জাতি জীবিত আছে, এই খ্যাপন করিয়া বৈজয়ন্তী মস্তব উন্নত করিয়া বাহিত হইতেছে। সেই মহাভারতীয় বলের চতুরঙ্গিনী সেনার স্মরণ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সিংহ-নাদ কাহাকে বলে, আহোপুরুষিকা, অহং পূর্ব্বিকা দেখিতে কেমন, তাহা বুঝি-বার ইদানীং কোনও উপায় নাই। আততায়ীর সম্মুখ নহিলে সেনা মধ্যে সে সকল ভাব কি করিয়া উদিত হইবে। এ বাহিনী রচনা যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য নহে, সমৃদ্ধি প্রকাশের জন্য। সেই কারণ সোণা রূপার কামান দেখিতে পাইলাম। রাজগুরু গোকুলিয়া গোঁসাই রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, ফিটন চড়িয়া চলিয়াছেন, আগে নকিব ফুকরাইতেছে। হস্তী যুথের হুড়াহুড়ি ও সলমার কাজ করা বহুমূল্য আস্তরণ দোদুল্যমান, তদুপরি রজত নির্ম্মিত হাওদায় দিব্য কিরীটধারী রাজ কুটুম্বগণ যাত্রা করিতেছেন,—বাটীতে বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এই সময় মহরম পর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে অনবরত হুসেন হু-সে-ন শব্দে কর্ণ ব্যথিত হইতে থাকে। রাজা প্রজারঞ্জক। সেই জন্য সরকারী তাজিয়া হয়। রজনী যোগে "লাগ" দেখিবার জন্য অতিশয় জনতা দৃষ্ট হইল। তিনটী শেল দণ্ডায়মান করিয়া তাহার ফলকের উপর একজন শ্বেত:পরিচ্ছদধারী স্থূল-তনু যবন শয়ান রহিয়াছে। তাহার দেহ নিস্পন্দ। ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি নর-ভুক্ জীবের মূর্ত্তি, জীবন্ত মনুষ্য দন্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি দৃশ্য প্রদ-র্শিত হইয়া থাকে। তাজিয়া দর্শন করিতে যাইবার সময়, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের মুসল-মানেরা যে শোক সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, তাহার সুর শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বেশ দেখিলে প্রাণ উদাস হয়। যখন দুল দুল নামক অশ্ব রক্তাক্ত কলে-বরে রক্তমাখা পতাকা অগ্রে করিয়া মহজিদের উপর গিয়া উঠে, তখন তত্রত্য নরনারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তাহার পর বেদির উপর ইমাম বসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করেন, "এই দিনেঠিক এমনি সময়ে তাঁহার অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছিল" ইত্যাদি। নিকটে অশ্ব উপস্থিত,

স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। অশ্বটি শ্বেত বর্ণের, লোহিত রঙ্গে আপ্লুত, তদুপরি শোণিত চিহ্নযুক্ত শ্বেত বস্ত্রের আস্তরণ। এবম্বিধ সমাবেশ হওয়ায়, ভক্তবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হয়। আমিও যে দিন উপস্থিত ছিলাম, অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বরদার সুন্নিগণ বিপরীত ভাব দেখাইবার জন্য ব্যাঘ্র প্রভৃতি সাজিয়া, গীত বাদ্য করিয়া আমোদ উৎসব দেখাইয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

১৭২০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র সেনানায়ক পিলাজী গায়কয়াড় গুজরাত আক্রমণ করিয়া চৌথ আদায় করিতে সমর্থ হন। তদবধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। অধুনা বরদা রাজ্যের আয় ১২৫০০০০০ টাকা। ভূমির পরিমাণ ফল ৪৩৯৯ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০২২৫। রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে একটি প্রান্ত কহে। প্রতি প্রান্তে একজন সুবা আছেন। শাসন প্রণালী ইদানীং অবশ্য সুন্দর হইয়াছে। কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশের ভূম্যধিকারীগণ ইংরাজকে অর্দ্ধেক ও গায়কয়াড়কে অর্দ্ধেক কর দেয়। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন সাণমারিতে রাজ আজ্ঞায় অপরাধী হস্তী পদ দলিত হইত। জীবন্ত প্রোথিত করা, পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া, দেওয়ালে পেরেক দিয়া বিদ্ধ করা প্রভৃতি নানা নিষ্ঠুর দণ্ডের প্রচলন ছিল।

মতিবাগে মলহররাও মহাশয়ের চিত্র দেখিলাম। অপবিত্র হোলি উৎসবের সময় রাজভবনে প্রকাশ্য ভাবে শত বারাঙ্গনাকে মলহর স্বয়ং পিচকারি দ্বারা রঞ্জিত করিতেন। একবার ঘুগুর বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ঘুগুবৌকে বিড়ালে খায়, তাহাতে রাজা নগরের তাবৎ বিড়াল হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হন। একদা বিল্লিমোরা নামক জনপদে মলহর রাও গমন করেন। সে স্থানের রাজ-পথ খণ্ডেরাও গায়কয়াড় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এজন্য সেই পথে তিনি পদার্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি নষ্ট করিয়া নূতন রথ্যা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল এবং কয়েক ঘণ্টা মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া গেল। পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মচারীগণ প্রভুকে বুঝাইয়া দিল। রেসিডেণ্টকে বিষ দেওয়ার কথা সকলেই অবিশ্বাস করে। যমুনা বাই কারামুক্ত হইয়া যে বালকের ললাটে রাজতিলক দিয়াছেন, তিনি সুশিক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সার ত্র্যম্বক মাধব রাও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কথিত

আছে, মাধব রাও অশীতি লক্ষ মুদ্রা ইংরাজের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহার কুসীদ বরদা রাজ্য পাইবে, কিন্তু মূল অর্থ লইতে পারিবে না এই নিয়ম হয়। ইহাতে প্রাপ্তব্যবহার ভূপতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মাধবরাওর হাসিভরা মুখখানি দেখিলে তাঁহাকে অতিশয় চতুর বলিয়া উপলব্ধি হয়। মহারাণী যমুনা বাই এক্ষণে পৃথক্ বাটীতে অবস্থান করেন, রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন না। কয়েক দিন হইল, তাঁহার বাটীতে তিনটি খুন হইয়া গিয়াছে। রাণী তখন উপস্থিত ছিলেন না। পুরুষানুক্রমে আফ্রিকা নিবাসী সিদ্দিগণ বরদারাজ্যে নিযুক্ত আছে। তাহারা রীতিমত সৈনিক কর্ম্ম করে না বা অন্য কোনরূপ উপকারে আসে না। মাদক সেবন প্রভৃতি কার্য্যে দিনাতিপাত করে। তাহারা রাজ্যের এত ঘনিষ্ট, যে উহাদের অন্য নাম "রাজ্যের সন্তান।" যদি বল অমুকের শিরশ্ছেদন করিয়া আন—তাহা অনায়াসে করিতে পারিবে, কিন্তু নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হয়, এমন কর্ম্মভার কদাচ লইবে না। বর্ত্তমান গায়কয়াড় তাহাদের তিনজনকে একটি নিয়মিত কার্য্য করিতে বলেন। তাহাতে তাহারা অপারগ হওয়ায়, বেতন বন্ধ করিয়া দেন। উহারা সে জন্য হয়দরাবাদ চলিয়া যায়। সেখানে কোনও সুবিধা না দেখিয়া, প্রত্যাগমন করতঃ বৃত্তি যাচ্ঞা করে এবং কহে যদি না দেন, বলপূর্ব্বক ধনাগার হইতে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিব। সুতরাং গায়কয়াড় তাহাদের ধৃত করণার্থ পুলিশের প্রতি আজ্ঞা দিলেন। যমুনা বাই সাহেবের বাটীতে উহারা বাস করিত। সেই স্থানে পুলিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিন জনেই হত হইয়াছে।

বরদার সুরসাগর বা নওলাক্ষি প্রভৃতি বাপী তড়াগ গণনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত। যমুনা বাইয়ের চিকিৎসালয় ও বিদ্যামন্দির জয়পুরের মত সুন্দর পাথরের জালি গ্রথিত। রাজা বা কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অথবা রাজকুটুম্বের গমনাগমনকালে বহু অশ্বারোহী অনুবর্ত্তন করে। রাত্রিকালে মসালচিরা গাড়ির অগ্রে দৌড়ায়। গায়কয়াড়ের আধ পয়সার মুদ্রা নাই। ঐ মূল্য আদান-প্রদান জন্য আটটা বাদাম ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে যেমন কৌড়ির ব্যবহার। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় তাম্র মুদ্রা ছিল না। বিনিময়ের কার্য্য কৌড়ি দ্বারা সমাধা হইত। এই জন্য অদ্যাপি ১ এক পয়সার অঙ্ক লিখিতে হইলে ৫ পাঁচগণ্ডা লিখিতে হয়। ইহাতে আর এক কথা পাওয়া যায়। যখন প্রথম তাম্র খণ্ড-ব্যব-

হার হইয়াছিল, সে সময় এক পয়সায় পাঁচগণ্ডা কৌড়ি কিনিতে পাওয়া যাইত। এখন এক পয়সায় ষোলগণ্ডা কখন কখন ইহাপেক্ষা অধিকও পাওয়া যায়। গুজরাতে সিকিকে পাওলি ও পয়সাকে ঢেঁড়িয়া কহে। টাকা বলিলে গায়কবাড়ের টাকা বুঝায়। ভিক্টোরিয়ার টাকা চাহিতে হইলে কলদার বলিতে হয়।

সুরত।—রাত্রি ২ টার সময় আড্ডায় গাড়ি থামিল। একজন পারসি দস্তুর শুভ্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া আমাদের গাড়িতে আরোহণ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কি সুরত? তিনি কহিলেন, এই বটে—"সুরত, দেখনেকী সূরত।" স্ত্রীলোক কর্‌ণ্ডবাহী আমাদিগকে এক বাড়িওয়ালার ঘরে পৌছাইয়া দিল। তাহার মাদুরের ছারপোকার যন্ত্রণায় ও গৃহের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রজনী যাপন অতি কষ্টকর হইল। বাল্যকালে ভূগোল হস্তামলকে পড়িয়াছি, সুরত নগরীতে জৈনদের স্থাপিত পশু রক্ষাশালা আছে, সেখানে গবাদি পশুর ন্যায় ছারপোকাও প্রতিপালিত হয়। ছারপোকাকে আহার দিবার জন্য, অর্থ দিয়া মানুষকে খাটে শুয়াইয়া রাখে। আমাদিগকে কি সেই পিঁজরাপোলে রাখিয়া গেল? পর দিবস ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত সহরে প্রবেশ করিলাম। মন শান্ত হইল। মরয়ানজী হোরমজ্জী ক্রসের [illegible] চিহ্ন, ক্লকটায়ার বা ঘড়িয়াল ছাড়াইয়া হাইস্কুল, ও হস্পিটল সন্নিহিত নৈমিত্তিক পণ্যবীথী দেখিতে দেখিতে দুর্গ পার্শ্বস্থ ভিক্টোরিয়া উদ্যানে তাপী নদীর কূলে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়া আরও কিছু দুর "ত্রি থিঙ্করস্ করণর" দিয়া ইংরাজী পল্লী বেড়াইয়া ফিরিলাম। সন্ধ্যাকালে বহু মুরতি এই তাপী তটে তাপ অপনোদন করিতে আসিয়া থাকেন। তাপীর জল কমিয়া যাওয়ায় এবং বোম্বাই বন্দর হওয়ায়, সুরত পূর্ব্ব গৌরব অনেক হারাইয়াছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বাণিজ্যশালা এখানে প্রথম স্থাপিত হয়। সুরত বাষ্পীয়তরি নির্ম্মাণের প্রধান স্থান ছিল। পারসিরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অদ্যাপি বোম্বাইএর ডক ইয়ার্ডে পারসি মাষ্টার-বিলডর পদ ভোগ করিতেছেন। পারস্য হইতে তাড়িত স্বধর্ম্ম নিরত পারসিরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্র-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ হইয়া এই সুরতে হিন্দু রাজার আশ্রয়ে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন, সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে সুরত নাম হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র দেশ বস্তুতঃ কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশ। কাঠি নামক জাতির বাস ছিল বলিয়া কাঠিওয়াড় আখ্যা হইয়াছে। তেমনি গুজর

নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া গুজরাত সংজ্ঞা উৎপন্ন কহিয়া থাকেন। সুরতের জনসংখ্যা ১০৭১৪৯। সহর পনাহ অর্থাৎ নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। বিদেশী লোক আসিলে (হীন অবস্থাপন্ন) ফৌজদার অর্থাৎ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তত্ত্ব লইয়া তবে বাস করিতে অনুমতি দেন।

সুরত নগরের মিষ্টান্ন অতি উপাদেয়। ৩৫ তোলায় সের। সুরতের ঘি ও বাঙ্গালার চিনি, গুজরাতিদের প্রিয় পদার্থ। ইদানীং বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে মরিশশ্ চিনি যোগাইতেছে। গুজরাতিতে বলে,—"কাশী নো মরণ, সুরত নো ভোজন" অর্থাৎ কাশীধামে মৃত্যু যেমন প্রার্থনীয়, সুরতের খাদ্য দ্রব্য তেমনি লোভনীয়। ঘরি নামক মিঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বরফি জমাইয়া তাহার উপর ঘৃত ঢালিয়া দেয়, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে, তাহার উপর স্থূল ঘৃতের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। লুচি মিলে না। নিমকি প্রভৃতি সমস্ত গুর্জ্জরে তৈলপক্ক। শাক ও তরকারি রাত্রিকালে সমারোহের সহিত বিক্রয় হয়। নানাবিধ ফল মিলে। চা ও কাফি পানের স্থান আছে। ইতর লোকে বিলক্ষণ মদ্যপান করে। কলু প্রভৃতি জাতির রমণীরা মদিরা-গৃহে যাইয়া অবাধে পান করিয়া থাকে।

বল্লভাচারীদের শ্রীনাথজীর দেবালয় অতি বিচিত্র স্থান। নাগরিক নরনারীর একাধারে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র প্রবল জনস্রোত ঘূর্ণাবায়ুর মত একদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্ষণমাত্র না তিষ্ঠিয়া শ্রীনাথ দর্শন হউক বা না হউক, অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। ক্ষণ বিলম্ব হইলে, কোড়ার আঘাত সহ্য করিতে হইবে। তখনি দ্বার বন্ধ হইবে। যদি কেহ এইরূপে দর্শন করিতে অবশিষ্ট থাকে, এবং কপাট পড়িতেছে এমন সময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে "জয় জয়" বলিয়া দৌড়িয়া আসে ও এক নিমেষের জন্য দ্বার পুনঃ উদ্ঘাটিত হয়। যখন দর্শন হইবার বিলম্ব থাকে, নারী মণ্ডলী মন্দিরের ব্যবহার জন্য পর্ণ রন্ধনায় সময়ক্ষেপ করে। তথায় আমাদের সহিত কয়েকজন হিন্দুস্থানীর পরিচয় হইল। তাহারা আমাদিগকে পাইয়া যেন স্বদেশী পাইল। এই দূর দেশে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীর স্বদেশীয় হইল। যে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীদিগকে "ছাতু" ও হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীদিগকে "ভাতু" বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের পরস্পর সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য। কাশীতে বাঙ্গালীর প্রতি হিন্দুস্থানীর কদাপি এমন আত্মীয় ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না।

সুরতের পাগড়ি আহম্মদাবাদের মত নহে। কচ্ছ মাণ্ডুই নিবাসী ভাটিয়াদের উষ্ণীষ অনুরূপ। কাঠিয়াওয়াড়ের পাগড়ি ও কাপেলি বণিয়াদের শিরস্ত্রাণ ভিন্ন প্রকারের। সুতরাং পাগড়ি দেখিলে বলা যায়, কোন গুজরাতির বাটী কোথায়। একজন ভ্রমণকারী যে লিখিয়াছেন, পাগড়িতে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়,—তাহা সত্য। আমরা নগ্ন শিরে বাঙ্গালীভাবে বিচরণ করায়, একটা উপকার দেখিলাম। লোকে ডাকিয়া আমাদের সহিত আলাপ করে। কোথা হইতে আগমন, কেন আগমন ইত্যাদি প্রশ্ন করে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জগদীশ (পুরুষোত্তম) দর্শনার্থ বাঙ্গালা মুলুক দেখিয়া যান। এক ব্যক্তি কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দুইজনে বিতণ্ডা হইতেছে বাঙ্গালীরা পাগড়ি মাথায় দেয় না ও স্ত্রীলোকে কাঁচুলি ব্যবহার করে না,—এ কথা কি সত্য?" আমার উত্তর শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল কি না বলিতে পারি না। গুজরাতি রমণীরা হিন্দুস্থানী প্রণালীতে সাড়ি পরিধান করে। উহা দেখিতে ছিটের মত। কঞ্চুলিকা কিছু অদ্ভুত প্রকারের। তাহার পৃষ্ঠদেশ খোলা, সুত্র দ্বারা পরিধি রক্ষিত। ভূষার মধ্যে কাঁটা অর্থাৎ মুক্তা পঞ্চক যুক্ত ফুল সকল স্ত্রীলোকেই পরিধান করে। যে দীন, সে তথাপি কৃত্রিম মুক্তার কাঁটা পরিবে। এখানে পুরুষ অপেক্ষা রমণী বিক্রান্ত। ভারবহন প্রভৃতি দৈনিক শ্রমসাধ্য অনেক কর্ম্ম স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে। অবগুণ্ঠন প্রথা নাই। দন্তে স্থায়ী লাল রঙ্গ দিয়া থাকে। ছেলেগুলার মাথা কামান, অতি কদর্য্য দেখায়। টুপি মাথা ঢাকিতে সমর্থ হয় না। বেণিয়ান ভাল দেখায় না। অনেক ব্যক্তি কাণের উপর মুক্তা দেওয়া (বালী) মাকড়ি পরে। বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই মালা ও তিলক ব্যবহার করিয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাতি ছিলেন। তাঁহার আচার্য্য মথুরা নিবাসী এক জন্মান্ধ। তিনিও মূর্ত্তি পূজা খণ্ডন করিতেন। কাশীধামে উক্ত বিষয়ে দয়ানন্দ যে বিচার করেন, তাহাতে বামনাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় বেদের নিম্ন লিখিত স্থানে প্রতিমা উল্লেখ দেখান।

স প্রাং দিব মন্বাবর্ত্তে তাথ যদা স্তাযুক্তানি যানানি প্রবর্ত্তন্তে,

দেবতায়তনানিকং পেস্তে (?) দৈবত প্রতিমা হসন্তি রুদন্তি গায়ন্তি,

নৃত্যন্তি কুটন্তি খিদ্যন্তাম্মীলন্তি নিমীলন্তি প্রতি প্রস্থান্তি
কবন্ধ মাদিত্যো দৃশ্যতে বিজনেব পরিবিষ্যত।

(সামবেদীয় অদ্ভুত শান্তিপ্রকরণঃ)

মুম্বই।*

৪ ঠা কার্ত্তিক রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বরোদা ত্যাগ করিয়া, ঊষাকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, ধূম্পীয় শকট হইতে অবলোকন করিলাম, আমরা নারিকেল, তাল, কদলী ও জম্বীর বৃক্ষ পূরিত ভূভাগে সমুপস্থিত হইয়াছি। বুঝা গেল এ কঙ্কণ প্রদেশ। বন্দরা প্রভৃতি গ্রাম ও কএকটা সমুদ্রের খাড়ি ছাড়াইয়া চরণীরোড ষ্টেশনে অবরোহণ করা গেল। 'রেকড়া' অর্থাৎ গরুর গাড়িওয়ালাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে কহা হইল। আহারাদির পর সমুদ্র দেখিয়া ট্রামকার যোগে কোলাবা হইতে ভাই-কল-আ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা গেল।

কেহ কেহ বলেন, 'বুত্তন বহিয়া' এই পোর্ত্তুগীজ শব্দ হইতে বোম্বে নাম উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মুম্বা দেবীর নামানুসারে মুম্বই অভিধান হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। চিরকাল বোম্বাই নগরের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া আসিতেছি। এই সহর খাপরার চালময়। পাকা বাটী অতি বিরল। বাটীর মুখভাগ প্রায় আপাদ-মস্তক নানা বর্ণের কাচ দ্বারা মণ্ডিত। ঔজ্জ্বল্যে নয়ন ঝলসাইয়া যায়। ভিতরে যাইয়া দেখ,—সঙ্কীর্ণ ঘর, মাটীর মেঝে, কাঠের দেওয়াল্। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নূতন বাটীগুলি প্রস্তরময় ও প্রকৃত প্রশংসার বস্তু বটে। স্প্লেনেড্ বা ময়দানটির আয়তন ক্ষুদ্র, যেন মুষ্টিমেয়। উদ্যান তিন খানিও তদ্রূপ সঙ্কীর্ণ। কলিকাতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, বোম্বাই ভিন্ন ভারতে অপর কোন নগর নাই। কিন্তু কলিকাতা শ্রেষ্ঠতর। কলিকাতার অপর নাম বৈজয়ন্ত নগর। বোম্বাই অতি পরিষ্কার স্থান বলিয়া খ্যাত। বাস্তবিক তাহা সত্য। তবে

* Hand Book of the Bombay Presidency. By Edward B. East wick. 2. A guide to Bombay By James Mackenzie Maclean. 3. Gujarat and Gujaratis. Behrmji M. Malabari. 4. Essay on Indian Antiquary By K. Raghunathji 5. Essays on Bharati. By. Suttendra Nath Tagore. 6. Essay on Nababarsiki By Rajendro Nath Roy.

পথিপার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী আছে। কলিকাতার মত ড্রেনেজ হয় নাই। ভঙ্গিগণ অনাবৃত ভাবে পুরীষ বহন করিয়া থাকে। বাটীর নম্বর দেওয়া নাই। ষ্ট্রীটের নাম থাকা, না থাকার মধ্যে। জলের কল আছে; সে জল পরিস্রুত নহে। গ্যাসের আলো আছে, তাহারও যেন দীপ্তি কম। বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা ছোট, অথচ উহার লোকসংখ্যা অধিক। সেই জন্য বাটীগুলি বহুজনাকীর্ণ। যান, বাহন, কলিকাতার মত অধিক নাই। অমিচন্দ নামা এক হালওয়াইর দোকানে কেবল ঘৃতপক্ক নিম্‌কি পাওয়া যায়। আর সকল দোকানে তৈলপক্ক। বোম্বাএর পোতাশ্রয়ে কলিকাতার মত অধিক বাণিজ্যতরি আসে না। বিদ্যাচর্চ্চা কলিকাতা অপেক্ষা হীন।

বোম্বাই ও কলিকাতার দ্রাঘিমান্তর অতি অল্প। একারণ, বাঙ্গালায় যে সকল ফল মূল জন্মে, এদেশেও তাহা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের আর কোন স্থানে আনারস জন্মাইতে দেখি নাই, এখানে তাহা উৎপন্ন হয়। কমলা লেবু ও কদলী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এদেশে কমলার ত্বকে সৌগন্ধ নাই। কদলী নানাবিধ এবং বাঙ্গালা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একরূপ কদলী আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট, পরিপক্ক হইলেও হরিদ্বর্ণ থাকে, তাহাকে কোকণী কলা অর্থাৎ কঙ্কণদেশজ কদলী কহে। লোহিতবর্ণ রম্ভা আছে। মাহিমের নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট। এদেশে কেহ ডাব খায় না। দ্রাক্ষা জন্মে, কিন্তু মাল্‌টা হইতে যাহা আসে, তাহাই উপাদেয়। কলিকাতা ও বোম্বাইএর নিরক্ষান্তর ১৫ অংশ, অতএব কলিকাতায় যখন সূর্য্য উঠে, তাহার এক ঘণ্টা পরে এখানে সূর্য্যোদয় হয়। পৃথিবী, পূর্ব্বপশ্চিমে গোল বলিয়া, পূর্ব্বদিক্‌বাসীদিগের পরে পশ্চিমদিক্ বাসিগণ সূর্য্যোদয় অনুভব করে। হিমালয় পর্ব্বত প্রতিবন্ধক থাকায়, ভারতসমুদ্রে 'বাণিজ্য বায়ু'র প্রচার নাই। তাহার পরিবর্ত্তে মৌসুমী নামে খ্যাত একপ্রকার বায়ু বহিয়া থাকে। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ঈশান কোণ হইতে এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত নৈঋত কোণ হইতে বহিয়া থাকে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে বায়ু বহিয়া থাকে, এদেশে চলিতকথায় তাহাকেই মৌসুমী বা মনসুন কহে। মনসুন বাণিজ্যের কাল নহে, সেই জন্য পোতাধিষ্ঠানে অধিক বাণিজ্যতরি উপস্থিত দেখি নাই।

বোম্বাই নগরে প্রধান দর্শনীয় স্থান 'হারবর'। ইহা ভারত সমুদ্রের খাড়ি।

একটি বন্দরে দাঁড়াইলে অন্য বন্দর দেখা যায় না। বোধ হয় কেন, আর নাই। বন্দরের সংখ্যা বহু। প্রত্যেক বন্দরে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যজাত আমদানী হয়। অনেক স্থানে সেই বন্দরের সন্নিকটেই আনীত বস্তুর পণ্যশালা। বন্দরের মধ্যে প্রিন্সেস্‌ডক্ সর্ব্বপ্রধান; উহা নির্ম্মাণ করিতে ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ত্রিংশৎখানি বৃহৎ জাহাজ ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া কূলে মাল নামাইতে পারে। জলকর ৯০ বিঘা। ইংরেজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেড়কোটি টন মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে বায়ু সেবনার্থ ওয়েলিংটন পায়ার অর্থাৎ পালাবন্দরে নাগরিকগণ সমবেত হন। তথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। ইংলিশমেল ষ্টীমার এই ঘাটের সম্মুখে দাঁড়ায়। আমরা এলিফেন্টা গমন উদ্দেশে, একখানি করাচীদেশীয় নৌকায় আরোহণ করিলাম। নৌকা কম্পিত হইতেছে, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। সমুদ্রে নৌকায় উঠা এই প্রথম, এজন্য কিঞ্চিৎ আতঙ্ক অনুভূত হইল। নদ্যম্বু অপেক্ষা সমুদ্রাম্বুতে তরণী অনায়াসে চালিত হয়। কারণ, সমুদ্রজলে লবণাদি নানাবিধ পদার্থের স্থিতি প্রযুক্ত, তাহা বিশুদ্ধ জলাপেক্ষা অধিক ভারী। পুরুষোত্তমে বঙ্গোপসাগরের বর্ণ দেখিয়াছি,—নীলাক্ত হরিৎ। তটসন্নিকটে যে বীচিমালা নিরন্তর আহত হইয়া বুকে ফেণ তুলিয়া আসিত, তাহার বর্ণ ম্লান দেখিতাম। কিন্তু, এ সাগরের জল তদপেক্ষা গৌর। সমুদ্রের করাল মাধুরী এখানে দেখিবার উপায় নাই। বেলা (জোয়ার) অতীত হইলে, প্রায়মৎস্যমাত্রভোজী কোকণী মুসলমান নাবিকগণ গীতের সহিত ক্ষেপণী চালন করিতে লাগিল। জল অগ্রে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, পশ্চাৎবর্ত্তী জলরাশি তাহার স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইল, ইহাতে তরঙ্গোৎপত্তি হইয়া নৌকাকে আগাইয়া দিতে লাগিল। একপারে মুম্বই নগর, অপরপারে পর্ব্বতমালা, মধ্যস্থলে সাগরগর্ভে বুচর, হগ ও ছিনার টিকরি প্রভৃতি জনশূন্য দ্বীপ। বোম্বাইটিও ঐরূপ দ্বীপ পুঞ্জের উপর নির্ম্মিত। যেখানে মগ্ন গিরি আছে, তৎপরিজ্ঞানের জন্য স্তম্ভ স্থাপিত আছে। প্রোং-লাইটহাউসটিও ঐ কারণে স্থাপিত। উহা সমুদ্র হইতে হারবরে প্রবেশ পথে রহিয়াছে। এস্থানে খাড়িটি তিন ক্রোশ বিস্তৃত। আলোকস্তম্ভের চারিধার ঘেরিয়া তরঙ্গমালা লুঠিতেছে দেখিয়া, বিশেষতঃ সোপানের উপর উৎক্ষিপ্ত জলরাশি নিরীক্ষণ করতঃ, হৃদয়ে অভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। উপরে উঠিয়া অকূলপারের দিকে দৃষ্টি করিয়া,

সমুদ্র যে কি সামগ্রী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আলোকরক্ষীকে বলিলাম, দেখ আমি অর্ণববক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছি। স্তম্ভের সর্কোপরিস্থকক্ষ কাচনির্ম্মিত। তাহার অভ্যন্তরে মনুষ্যসমান উচ্চ অতি উজ্জ্বল কাচের কলমদ্বারা সম্পূর্ণ নির্ম্মিত, অষ্টকোণ বিশিষ্ট, যন্ত্রচালিতল্যান্টরণ বিদ্যমান। দশ সেকেণ্ডে একটা চমক প্রদান করে; আশি সেকেণ্ডে ল্যান্টরনটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসে। স্তম্ভের উচ্চতা ১৫০ ফিট। ভিতরের পরিধি ১২ ফিট। নির্ম্মাণ ব্যয় ছয় লক্ষ টাকা। একজন ইংরেজ ও পাঁচ জন খালাসী ইহাতে বাস করে। য়্যাপলো বন্দর হইতে ঘারপুরি তিন ক্রোশ। নৌকায় বসিয়া ক্লান্তি অনুভূত হইল না। নয়ন ফিরিতে লাগিল। কত জাহাজ নীরবে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ ভাবিতেছে। দূরে কচ্ছদেশীয় ধাও (নৌকা) গুলি, মাণ্ডুই বন্দর দেখাইয়া দিতেছে। কোথাও মক্কাযাত্রিগণ নিবিড়ভাবে জাহাজ বোঝাই হইতেছে। শ্রমজীবীরা নিকটবর্ত্তী কোনও পার্ব্বত্য দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। বোম্বাই, ইংরেজ রণতরির নিবাসস্থান। আবিসিনিয়া ও ম্যাগডালা নামে দুইখানি টরেট্‌সিপ্‌ আছে। তাহার একখানি এক্ষণে পারস্য উপসাগরে গিয়াছে। অন্যখানি রহিয়াছে। এই যুদ্ধজাহাজ অতি আশ্চর্য্য বস্তু। ইহাতে অতি প্রকাণ্ড চারিটি কামান আছে, দুইটি সম্মুখে ও দুইটি পশ্চাৎভাগে। এই কামানদ্বয়, এক চক্রাকার প্ল্যাট্‌ফরমের উপর স্থাপিত। প্ল্যাটফরমের নীচের চাকা লোহার রেলের উপর ঘুরিতে পারে। ইহা ঘুরাইবার জন্য কল আছে; তদ্দ্বারা যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে প্ল্যাটফরমের সহিত কামানের মুখ সহজে ফিরান যায়। সুতরাং, শত্রু যে দিকে থাকুক না কেন, তাহাদিগকে অনায়াসেই আক্রমণ করা যাইতে পারে। এই জাহাজের চারিদিকে দৃঢ়লৌহনির্ম্মিত জল-প্রণালী আছে; তাহাতে জল ভরিলে জাহাজের ডেক পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। কেবল টরেট ও কামানের মুখ জলের উপরে থাকে। সুতরাং শত্রুরা গুলি করিলে জাহাজের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। টরটের এক উচ্চ প্রদেশে কাপ্তেনের দাঁড়াইবার স্থান আছে। এই টরেট্‌ অত্যন্ত দৃঢ়, লৌহ ও কাষ্ঠের আবরণে আবৃত। গুলিতে তাহা ভেদ করিতে পারে না। ইহাতে দুইটি ছিদ্র আছে, তদ্দ্বারা কাপ্তেন শত্রুদিগের গতি বিধি দেখিয়া, নিজের লোকদিগকে হুকুম দেন। * এই সকল

* নববার্ষিক।

অতিক্রম করিয়া বারপুরির সেতুবন্ধে উপস্থিত হওয়া গেল। উপরে উঠিয়া দর্শনী দিতে হইল। একজন প্রহরী দেখাইতে চলিল। শৈল বিদারণ করিয়া অতি সুবৃহৎ দেবালয় খোদিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি অতি বৃহৎ, ১২ হস্ত উচ্চ হইবে। মধ্যস্থলে যে গৃহ, তাহাতে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আছে। ভিত্তিগাত্রে বহুবিধ মনোহর ভাবের বিগ্রহ খোদিত হইয়াছে। যথা—ত্রিমূর্ত্তি, অর্দ্ধ নারীশ্বর, হর-পার্ব্বতী, শিবের বিবাহ, গণেশজননী, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, দক্ষযজ্ঞ নাশ, মহাদেবের তপস্যা, ও ভৈরব প্রভৃতি। শিরোভূষণ দেখিলে এগুলি দ্রাবিড় স্থপতির কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। অনুমান সহস্র বৎসর হইল, ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কে করিয়াছে, তাহা কেহ জানে না, একজন্য এই অমানুষিক ব্যাপার, পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, স্থানীয় লোক নিরস্ত থাকে। কএকটা স্তম্ভ স্খলিত হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিগুলিও স্পর্শদোষবিশিষ্ট হইতেছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া জল পড়ে। শৈল স্খলন হইতে যেন আর বিলম্ব নাই। এই দ্বীপে পর্ব্বতে হস্তী খোদিত ছিল, একারণে এলিফেন্টা নামানুকরণ হইয়াছে। ইদানীং সে হস্তী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

চৌপাটি ও পশ্চাৎদিকের খাড়ির সৈকতকূলে দিবাবসানকালে ভ্রমণ অতি রমণীয়। পূজারি, ঘণ্টা বাজাইয়া সগন্ধ পুষ্প দিয়া সাগরের পূজা করিতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ পারসিক উপাসনা করিতেছেন, কখনও বক্র হইতেছেন, কখনও বা অভিবাদন করিতেছেন। পারসী রমণীরা রামধনুর মত নানাবর্ণের উজ্জ্বল শাড়ী পরিয়া, লাবণ্যরাণীর মত বিচরণ করিতেছেন। আইস্ ক্রিম্ ও গণ্ডেরি বিক্রেতা পণ্যাখ্যাপন করিয়া চলিয়াছে। এই যে সুখদস্থান, কত লোক ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। হারবার ভরাট করিয়া বহু মূল্যবান্ ভূমি উৎপন্ন করা হইয়াছে দেখিয়া, ব্যাকবে রিক্লেমেসন কোম্পানি জমি প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এখানে বসতি হইল না। ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড অতি সঙ্কীর্ণস্থান। ঘেসাঘেসি করিয়া বেড়াইতে হয়। সিকিম প্রত্যাগত সৈন্য দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। জনতার মধ্যে মিশরকাহিনী চলিতেছে। সান্ধ্য বায়ুসেবনকার্য্যের ভার বোম্বাই নিবাসিগণ পারসিদিগের প্রতি দিয়া অবসর লইয়াছেন। পারসিদিগের পূর্ব্বের মত আর বাণিজ্য অনুরাগ নাই। ৫০।৫৫ টাকার কেরাণীগিরি পাইলেই সন্তুষ্ট। ইংরাজি বিলাসিতাটুকু দেখাইতে পারিলেই কৃতার্থ হন। ব্যাকবের উপর নগর

শোভাসম্বর্দ্ধকসভার স্থচীবৎ প্রস্থ রহিত একখানি উদ্যান আছে। উহাতে ভ্রমণ করা অতৃপ্তিকর নহে। বম্বে, বরোদা ও সেণ্ট্রল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে শকট অনবরত গমনাগমন করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কোলাবা হইতে বন্দরা পর্য্যন্ত বাইশ খানি ট্রেণ নিত্য যাতায়াত করে। প্রকৃত সমুদ্র দর্শনাশায় বালুকেশ্বর হইয়া মহালক্ষী গমন করিলাম। মন্দিরের নীচে মহোদধি বেলাভূমির নিম্নে গর্জ্জন করিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ উপলখণ্ড তটদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দূরে মৎস্যজীবিগণের নৌকার পাল দেখা যাইতেছে। এস্থানটি অবশ্য গম্ভীর ভাবের আকর বলিতে হইবে। অনন্ত জলরাশি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এছবি যে কখন ভুলিব, এমন বোধ হয় না। সূর্য্যদেব দিগ্বলয়ে পারাবারে নিমগ্ন হইতেছেন। মূর্ত্তি রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া ডুবিতেছেন। যখন অর্দ্ধ অংশ ডুবিয়াছে, অর্দ্ধ অংশ জলে ভাসিতেছে, আহা তখন কি সুষমার উদয় হইল!

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার;
ডুবাইয়া আজি শোকসিন্ধুজলে?
যাও তবে, যাও, দেব, কি বলিব আর;
ফিরিও না পুনঃ—উদয় অচলে।
কি কাজ বল না, আহা, ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোকে কিছু নাহিপ্রয়োজন;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।"

ম্যালাবার শৈল হইতে বোম্বাইএর পশ্চিমদিক্ ধনুর মত দেখায়। এক দিকে কোলাবা, অন্য দিকে ম্যালাবারপয়েণ্ট। পূর্ব্বদিকে হারবার। এখান হইতে নিম্নস্থ নারিকেল তরুরাজি অতি সুন্দর দেখায়। এই পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে পারসিদের 'দখমা' অর্থাৎ শবপ্রক্ষেপস্থান। প্রাচীরবেষ্টিত একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া মধ্যস্থ কূপে মিলিত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রাচীরের মধ্যে শব নিক্ষেপ করা হয়। গৃধ্র ও চিল কর্ত্তৃক মাংস ভক্ষিত হইলে, অস্থিগুলি কালক্রমে কূপে যাইয়া পড়ে। ইংরাজ পল্লী এই পর্ব্বতে স্থাপিত। কলিকাতার মত অধিক সংখ্যক গৌরাঙ্গ এ নগরে নাই। ক্রফোর্ড-

মারকেট্ অবশ্য দেখিবার স্থান। বহুবিধ ফল ও নানা জাতীয় শাক সবজী এবং মৎস্য, মাংস, পুষ্প, প্রভৃতি প্রচুরপরিমাণে হর্ম্ম্যতলস্থ অসংখ্য মঞ্চ সজ্জিত করিয়া, দেশের সমৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। বাজার রাত্রিকালে তাড়িতালোকে আলোকিত হয়। বাণিজ্যের অবস্থা পরিজ্ঞানের জন্য মাণ্ডুই বন্দর-সন্নিহিত ভাটিয়া ও খোজা পল্লীতে বিচরণ করিতে হয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সারকেলের মধ্য স্থানে একটি বৃত্তাকার ছোট বাগান আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তার অপরপার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই অট্টালিকা সকল এরূপ চক্রাকারে গঠিত যে, তাহারা যেন সকলে মিলিয়া বাগানের চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমুদায় অট্টালিকার উচ্চতা, নির্ম্মাণ-প্রণালী ও গঠন এক। এইরূপ সৌসাদৃশ্য প্রযুক্ত স্থানটি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। বাটীর বহির্ভাগ সম্পূর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত ও বোধ হয়, এই সকল বাটীতে খোলার চাল নাই। ব্যাঙ্কপ্রভৃতি এই সকল বাটীতে স্থাপিত। আমেরিকার সহিত যুদ্ধ কালে, ইংরাজের সহিত তুলার বাণিজ্যে বোম্বাই যে সময়ে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়া ছিল, তখন এই প্রাসাদাবলি বিনির্ম্মিত হয়। ভিক্টোরিয়া উদ্যান ও মিউজিয়ম এক দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। খণ্ডেরাও গায়কয়াড় কর্ত্তৃক স্থাপিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিতমূর্ত্তি, শিল্পকার্য্যের চরমোৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। আমরা আবুজীতে যে অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার সহিত ইহার তুলনা হয়। পরিচ্ছদের কারচুপির কর্ম্ম পর্য্যন্ত খোদিত হইয়াছে। নির্ম্মাণ ব্যয় এক লক্ষ অশীতি সহস্র টাকা। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ কৃত রাজাবাই টাওয়ার আর একটি গণনীয় সামগ্রী।

আমাদিগের বাটীর নিকটে মাধব বাগ। একজন বণিক্ পিতার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ, তাঁহার পিতার নামে এই ধর্ম্মশালা, সভাগৃহ ও উদ্যান স্থাপন করিয়াছেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের মণিমুক্তাভূষিত শ্বেত বিগ্রহ। এপ্রদেশে দেবতার অলঙ্কার দেখিলে, দেশে যে বহু ধনী লোকের বসতি তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। ইহার অনতিদূরে পিঁজরা পোল অর্থাৎ পশুর জন্য চিকিৎসা ও প্রতিপালন-গৃহ। তাহার পর বণিয়াদের পঞ্চাইৎশালা ও সমুদ্র দেবীর মন্দির। এখানে একটি বাটী আছে, তাহাতে ভোজ হয়। বোম্বাই নগরে স্ব স্ব বাটীতে স্থানের সঙ্কুলন হয় না বলিয়া, পল্লীর মধ্যে ভোজের জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট

আছে। ভুলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বহুজন সমাম হইয়া থাকে। প্রবেশ দ্বারে লেখা আছে, হিন্দু ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। অনেক ভিক্ষুক এখানে বসিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। লিঙ্গের উপর অর্দ্ধমণ ঘৃতের জমাটশিরোভূষণ দেখিলাম। বোধ হয়, কাহারও মানত ছিল: এ পল্লীতে তিনটি বল্লভাচারী দেবমন্দির আছে। তাহার মধ্যে জীবনলালের মন্দির সর্ব্ব প্রধান। যে কোনও স্থানে এই সম্প্রদায়ের দেবালয় দেখিয়াছি, কোথাও শিখর বা চূড়া নাই। সাধারণ গৃহের মত সমতল ছাদবিশিষ্ট। স্ত্রীপুরুষের মিশ্রভাব অতি বিস্ময়কর। বাঙ্গালা ভাষার মাথায় পাগড়ি 'ঙ' যেমন কোনও কার্য্যে লাগে না, এখানে নারীকুলের নিকট পুরুষ তেমনি উপেক্ষণীয়। গুজরাতী রমণীরা পুরুষের নিকট কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। আমি সেই জনতার মধ্যে যাইয়া বালগোপাল দর্শন করিতে পারিতেছি না দেখিয়া, একজন বৈষ্ণব কহিলেন, দেবদর্শনে আসিয়া ভিড়ের ভয় করিও না। মুম্বাদেবী পূর্ব্বে কোর্টে ছিলেন, এক্ষণে এদিকে আসিয়াছেন। এখানে অনেক গুলি জৈনমন্দির আছে। একস্থানে দেখিলাম, পার্শ্বনাথের দেহ সম্পূর্ণ হীরকমণ্ডিত। জ্যোতির্ম্ময় দেহ, প্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে। পারসি দেবালয়ের নাম অতেশ বেহরম। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সন্নিকটে চন্দনকাষ্ঠ ও ধর্ম্ম পুস্তকের পণ্যশালা দেখিয়া কোন্‌টি অগ্নিদেবতার মঠ, স্থির করিতে হয়। একদা প্রার্থনা-সমাজ দেখিতে যাইলাম। সেই দিন উড়িষ্যা হইতে আগত জনৈক নববিধানীবাঙ্গালী হিন্দীভাষায় উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার সহচর একটি উড়িয়া গীত গাইয়া আমাদিগকে হাসাইলেন। পরে মহারাষ্ট্রীয়-সঙ্গীত হইল। ১৮৭২ অব্দে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর নিহিত হয়। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ এই সমাজের প্রধান নেতা। ইহার পুত্র খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কন্যা ইংরাজ বিবাহ করিয়াছেন। রাজপথে বাঙ্গালী দেখিলে প্রথমতঃ তাঁহাকে স্বর্ণকার বলিয়া বিবেচনা করা উচিত, তাহার পর পরিচয়ে যাহা স্থির হয়। অন্যূন চত্বারিংশৎ স্বর্ণকার কালবা দেবীরোড প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করে। তাহাদের আট খানি দোকান আছে। তাহারা মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা হইতে এক শত কুড়ি পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

আমাদের বাসস্থান সদর রাস্তার উপর। বাতায়নে বসিয়া নগরের লীলা দিব্য নয়নগোচর হয়। নিশা অবসান হইয়াছে। পারসী নরনারী ভজনালয়ে ও সিন্ধুতীরে উপাসনা জন্য গমন করিতেছে। হিন্দুস্থানী দ্বিজ সফেণ দুগ্ধ যোগাইতে চলিয়াছে। গুজরাতি ব্রাহ্মণ পুষ্পপাত্র লইয়া সমুদ্র পূজা করাইতে যাইতেছে। "বাটলে, বাটলে হোসে' এই বলিয়া খালি বোতল ক্রেতা ফিরিতেছে; কচুর শাকওয়ালী এবং মিঠা অর্থাৎ লবণ বিক্রেতা ভার মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে। কুনবি জাতীয় শব অনাবৃত মুখে গীতবাদ্য সহযোগে চিতাভূমি অভিমুখে বাহিত হইতেছে। সীতাফল বিক্রেতা গ্রাহক অনুসন্ধান করিতে অপারগ হইতেছে না। হলুয়া বিক্রেতা বাটীর উপর পর্য্যন্ত উঠিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। বোম্বাইয়ের মিষ্টান্নের মধ্যে 'হলুয়া' অতি প্রসিদ্ধ। উহা তিন চারি প্রকারের প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ, হিন্দুস্থানী মোহনভোগ হলুয়ার ন্যায়। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ণ সময়েও মহারাষ্ট্র-সীমন্তিনিগণ শাল গায়ে না দিয়া বাটীর বাহির হন না। আমাদের বাটীর সম্মুখে জনৈক রাজকর্ম্মচারী বাস করিতেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। গৃহিণী অঙ্গরাগ করিয়া সর্ব্বদা দর্পণে মুখাবলোকন করেন। কর্ত্তা দোলায় বসিয়া দুলেন। গুজরাতে হিন্দু মুসলমান সকলের ঘরে দোলনা আছে। আমার প্রতিবেশী কিন্তু মহারাষ্ট্রী। ভৃত্যবর্গ কেবল কৌপীন পরিধান করিয়া অনায়াসে নারী সমক্ষে বিচরণ করিতেছে। বালকগণ কোট, পেনট্রলন পরিয়া খালি পায়ে বিদ্যালয়ে চলিয়াছে। অপরাহ্ণে বস্ত্রবিক্রেতা "এ বাঁধড়ি" বলিয়া চীৎকার করে। পুষ্পবিক্রেতা মহারাষ্ট্র-রমণীর শেণ্ডা (কবরী) ভূষিত করিবার জন্য মোগরি, চম্পেলি, যুই, চম্পা, গুলছেড়ি ও গুলাব বিক্রয় করিতেছে। ঘটনাক্রমে যদি সকল পুষ্পাভরণ বিক্রীত না হয়, তাহা হইলে মালাকার ঐ পুষ্প কোন দেবালয়ে দান করে। ধনবান্ রমণীরা মাসিক ১০।১৫ টাকা মালিকে দেয়। 'পিস্তাচু' বিক্রেতা কবিতা আবৃত্তি করে।

"খারা পিস্তা ভুঁজেলা,
মগজনা ফাঁটেলা।
দুনিয়ানা সুধরেলা,
সুরত পী আবেলা।
এক খায় তো বীজাহু মন থায়,

তো ভীজো পৈসা লেবা যায়!
চখে সো ইয়াদ রখে বারা বরষ।"

অর্থ,—লবণমাখা পেস্তা, ভাজা ও মাথা কাঁটা। শুনিয়া সুধরান, সুরত হইতে আনান। একজন যদি খায়, তবে আর জনের মন ধায়। অন্য জন পয়সা আনিতে যায়। চাখে যে স্মরণ রাখে বার বরষ। চীনের বাদামওয়ালা হাঁকিতেছে,—"লে তিনি ভুঞ্জেলি সিঙ্গা, গরম, গরম।" তুষারবাহী,—"এ আইস এ আইস" করিয়া ক্লান্ত হইতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলেও আইসক্রীম ও গণ্ডেরি রব শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। মেহতাজীর পত্নী একদিন কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে দিলেন। তাহার মধ্যে বিশেষ রূপে কথিত গন্ধ দ্রব্যযুক্ত আমিক্ষা (ছানা) ছিল। মেহতাজীর পুত্র আমাদের জ্ঞান সহায়। তিনি বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীতে কি প্রভেদ, তাহা বুঝেন না; এজন্য একদা কহিলেন,—"তোমাদের ভৃত্য কটিদেশে বস্ত্র জড়াইয়া জড়াইয়া কাপড় পরে, কিন্তু তোমরা সেরূপ পর না কেন?" তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ মহা নগরীতে খাপরার চাল করে কেন? তিনি কহিলেন, তবে কিসের চাল করিবে? ছাদ যে পাকা হইতে পারে, এ জ্ঞান তাঁহার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বনিয়াদের মধ্যে সুরাপানের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ "ইউ-ডি কোলন্" পান করেন। এদেশে ক্ষৌরকার্য্যের বেতন সুলভ নহে। নাপিতের নিকট অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার কথা। এখানকার নাপিত দেখিতেছি, সেরূপ সামাজিক নহে। গুজরাতের গ্রামে হাজাম ক্ষৌর ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মও করে। চিকিৎসাকর্ম্ম তাহা দ্বারা কিছু না কিছু সম্পন্ন হয়। সে প্রেমিকের উকীল। হাজাম নহিলে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তাহারা পুরুষানুক্রমে গ্রামে মশালচীর কর্ম্ম করে। তাহাদিগের স্ত্রী ধাত্রী কর্ম্ম করে। সকল দেশেই নাপিতের নিকট দর্পণ থাকে, এক বাঙ্গালায় তাহা নাই। আমাদের বাটীটি এত বড় যে, ইহাতে ৪।৫ শত লোক বাস করে। আমরা দুইটি ঘর লইয়াছিলাম, তাহার ভাড়া সাত টাকা দিতে হইত। দুই দিন থাকিলেও একমাসের ভাড়া দিতে হয়। মিউনিসিপাল কমিটির টেক্স কলিকাতা হইতে কম। বাটীর ভাড়া প্রতি শতকরায় ১৪ টাকা দিতে হয়।

গ্রাণ্ট রোডে পাঁচটি দেশীয় নাট্যশালা আছে। এই সকল নাট্যশালায় মহা-

রাষ্ট্রী, গুজরাতী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় প্রায় প্রত্যহই হইয়া থাকে। আমরা রিপন রঙ্গভূমির দ্বারে যাইয়া উপনীত হইলাম। ইহা ইংরাজী প্রণালীতে গঠিত; গ্যাস-আলোকে প্রভাময়; অঙ্গনে সরবত, চা ও কাফি পানের স্থান। প্রোগ্রাম পাওয়া গেল না। ঐক্যতান-বাদ্য নাই। ড্রেস্ সার্কেলের একদিকে পুরুষ, অন্য দিকে মহিলাগণের স্থান। বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীলোকের স্থানে যবনিকা দেওয়া আবশ্যক হয় নাই। দর্শকবৃন্দ সকলেই উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া বসিয়াছেন। বিচিত্র মস্তকশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সঙ্গীত-শাকুন্তল মহারাষ্ট্রী ভাষায় অভিনীত হইতেছে। দৃশ্যপট ও অভিনয় উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষে অভিনয় করিতেছে, এই দোষ। পাত্রী অর্থাৎ স্ত্রীবেশধারী অভিনেতাদিগকে দেখিলেই ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বোধ হয়। কচ্ছ-বিলোলিত-কবরী মেষশৃঙ্গবৎ। আর এক দিন একটি হিন্দুস্থানী নাট্যমন্দিরে গিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলাম, পরে জানিলাম সে বিভাগ নাই, সুতরাং বাদানুবাদ করিয়া মূল্য হ্রাস করিতে হইল। প্রথমে মুজরা, পরে নাটক আরম্ভ হইল। এ দলে স্ত্রীঅভিনেত্রী ছিল। অঙ্গে বর্ণক লেপন করায়, স্ত্রীলোকের সৌকুমার্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। ধীবরের নৃত্য দেখিয়া স্থানীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইল। শ্রোতৃগণ সকলেই প্রায় মুসলমান। কোলাহল নিবারণের জন্য দ্বারবান্ যষ্টি উত্তোলন করিয়া হুঙ্কারবে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

পারসিরা ইংরাজের মত গম্ভীর। দুই একটি বৃদ্ধ ব্যতীত কেহ আপনা হইতে আমাদের সহিত আলাপ করে নাই। বণিয়াদের মধ্যে অনেকে ডাকিয়া কথা কহিয়াছে। লোক যেমন বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, তদ্রূপ উপস্থিত সামগ্রীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। দুই তিন ব্যক্তি আলাপ করিয়া কহিলেন, এখানে এমন কি দৃশ্য আছে যে, তোমরা কলিকাতা হইতে মুম্বই দেখিতে আসিয়াছ। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমরা জনৈক পরিচিত মহারাষ্ট্রীর সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে নওয়ারিতে পঁহুছিলাম। দেওয়ালী উপলক্ষে বাটীর পুরোভাগে বেদি রচনা করিয়া যোষাগণ বিবিধ বর্ণের চূর্ণ দ্বারা আলিপনা দিতেছে। আমি বাহিরে বসিতে চাহিলাম, তিনি কহিলেন, কেন তোমাদের দেশের মত আমাদের দেশে আব্রু পরদার ব্যবহার নাই। বিদায় কালে পান সুপারি দিলেন। প্রাতঃকাল, স্নানাদি হয় নাই, এই হেতু আমরা তাম্বুল গ্রহণ

অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, উহা অবশ্য গ্রহণীয়, কারণ, ওটি সম্মানের বিষয়। এক জন মহারাষ্ট্রী তাঁহার দোকানে ডাকিয়া স্বদেশ-জাত আগপেটি অর্থাৎ বিলাতি দিয়াসলাই ও আতর দেখাইলেন। রজরস্-কুট ছুরী কাঁচির ন্যায় বাঙ্গালায় যে সকল অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দেশীয় বলিয়া বিক্রয়ের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

এ সময় হাইকোর্ট প্রভৃতি বন্ধ থাকায় পুলিস ধর্ম্মাধিকরণে বিচার দেখিতে যাইলাম। গাইকয়াড়ের এক খানি হীরকের ধুকধুকি হারাইয়া যায়। সেই হীরা খানি ৩ খণ্ড হইয়া বিক্রীত হইয়াছে। তাহার একখণ্ড দিল্লি নিবাসী জনৈক সাধুর নিকট আর এক জন হিন্দুস্থানী সরাওগী (শ্রাবক) ক্রয় করিয়া অভি-যোগে পতিত হইয়াছে। মণিখানি বিচারপতিকে প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি একটি বিচারের জন্য এই স্থানে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়া ছিল। দাদাজী ভীকাজী তাঁহার পত্নী, (ডাক্তার সখারাম অর্জ্জুনের স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর কন্যা) রুক্মা বাই এর নামে বিবাহ সম্বন্ধীয় স্বত্ব পরিণত করিবার জন্য অভিযোগ করেন। রুক্মাবাই বিদ্যাবতী-ললনা। দশ বৎসর হইল, তাঁহার বয়ঃক্রম যখন এগার বৎসর, সেই সময় দাদাজীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বামীগৃহে যাইতে ও তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে অসম্মতা হন। তিনি কহেন,—উক্ত ব্যক্তির শ্বাসরোগ আছে এবং ক্ষয়-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, অপিচ সে স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে অপারগ। বিশেষতঃ যে সময় তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন স্বাধীন-মত দিবার তাহার (স্ত্রীর) বয়স হয় নাই, অতএব সে বিবাহের জন্য তিনি দায়ী নহেন। ইহাতে বিচারপতি পিনহে স্বামীর পক্ষে কোনও কথা না শুনিয়া, খরচা সমেত স্ত্রীর পক্ষে ডিক্রী দিলেন। জজ বিবেচনা করিলেন, যখন রুক্মা দাদাজীর গৃহে যাইতে সম্মত নহেন, তখন একটা ঘোড়া বা বলদের দখল পাওয়ার অধিকারের মত দাদাজী উহার দখল পাইতে পারেন না। বিচারটা বুঝি 'ইকুইটি' অনুসারে হইয়াছে। এই নিষ্পত্তিতে বাল্যবিবাহ নিবা-রণার্থ রাজনিয়মপ্রার্থী বেহরামজী মলবারি প্রভৃতি 'সুধরাণেওয়ালা' অর্থাৎ সমাজ-সংস্কারকগণ জয়লাভ করিলেন।

বাণিজ্যের অবস্থা সর্ব্বত্র সমান। মাল কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, লাভ কমি-য়াছে। তাড়িতবার্ত্তা ও বাষ্পীয়যান, দ্রব্যের মূল্য সকল দেশে এক করিয়া

রিয়াছে। যাহাদের ঘরে দ্রব্যজাত উৎপন্ন হয়, তাহারা বিলক্ষণ সম্পত্তিবান্ হই-তেছে। যাহারা ক্রয় বিক্রয় করে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ লাভের ভাগী হয়। বাঙ্গালা হইতে এখানে চাউল, রেশম ও চটের ব্যবসায় চলিতে পারে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতে উক্ত স্থান হইতে ইংলণ্ডে তুলার আমদানী একেবারে রহিত হইয়া যায়। কেবল ভারত হইতে রপ্ত নি চলিতে থাকে। ইহাতে বোম্বাই আশীকোটী টাকা উপার্জ্জন করে। একবারে এত অর্থ পাইয়া বোম্বাই সুদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। বহু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ভূমি ভরাটের জন্য নানাবিধ সম্প্রদায় স্থাপনা হইয়া যায়। ব্যাকবে রিক্লেমেশন কোম্পানীর অংশপত্র পাঁচগুণ অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বিবিধ জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর সেয়ার অর্থাৎ অংশ অসম্ভবরূপ অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। এই সময় বোম্বাইবাসিগণ কলিকাতার পোর্টক্যানিং সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ১৮৬৫ অব্দে আমেরিকার যুদ্ধাবসান-সংবাদ বোম্বাই নগরীতে প্রচার হইবামাত্র তুলার বাজার এককালে পড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ের অংশমূল্য অত্য-ধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে। ইহাতে সেয়ারের অধিকারীবর্গ বুঝিল যে, তাহাদের টাকা কেবল কতকগুলি কাগজ মাত্র। সুতরাং সমস্ত ভূমি ভরাটের কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া পড়িল। ব্যাঙ্কওয়ালারা উহাদিগকে টাকা ঋণ দিয়া কুসীদ লাভ করিত, অতএব কয়েকটি ব্যতীত সকল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেল। যাহা হউক, এই বিপত্তিতে এখানকার বাণিজ্যের স্থায়ী ক্ষতি কিছু হয় নাই। তুলার রপ্তানি যেমন কমিবে অনুমান হইয়াছিল, তাহা হইতে পারে নাই। এদেশ হইতে তুলা যাইয়া ম্যান্‌চেষ্টরে বস্ত্রে পরিণত হয় এবং পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া লাভের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া, অত্রত্য অধিবাসিগণ কাপড় ও সূতার কল করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে যাবৎ লাভ দেখে, তাবৎ লোক সেই কর্ম্ম করিতে যায়। অধুনা এত বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে যে, বিক্রয়ের স্থান-সংকুলন হইতেছে না। ইংরাজের রাজ্য এতদূর বিস্তৃত যে, তাঁহার দেশে সূর্য্য কখনও অস্তে যান না। উহাদের বিক্রয়ের স্থানের অভাব কি? এখানে আর নূতন কলের আবশ্যক নাই, নূতন হট্টের অনুসন্ধান হইতেছে। অত্রত্য অনেক অধিবাসীর সহিত আমরা মানকজী পেটীটের কল দেখিতে যাইলাম। তুলা ধোনার স্থান হইতে, তন্তু নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন, কাপড় ভাঁজ-করা পর্য্যন্ত দেখা

হইল। এই যন্ত্রের মূলধন চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। চারি হাজার পঞ্চাশ অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশের কল্পিত মূল্য সহস্র মুদ্রা। ঐ মূল্যই প্রদত্ত হইয়াছে। দুইখানি এঞ্জিন বা কল চলিতেছে। এই এঞ্জিন দুই শত সপ্ততি অশ্বের বলধারণ করে। একষট্টি হাজার দুই শত আটচল্লিশটি টাকু ঘুরিতেছে। এগার শত চুরাশী থানি তাঁত আছে চুরানব্বই হাজার মন তুলা ব্যবহৃত হয় (বার্ষিক)। প্রত্যহ আটাইশ শত লোক কাজ করে। এতদ্ভিন্ন এই নগরে আটচল্লিশটি কাপড় ও সূতার কল আছে। প্রদর্শককে বিদায় দিয়া, আমরা ভিক্টোরিয়া ফিটন যোগে করাতের কল দেখিতে যাত্রা করিলাম। অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া যন্ত্রশালায় প্রবেশ করিতে হইল। এখানে সর্ব্বপ্রকার কাষ্ঠই বাষ্পীয় যন্ত্রের বন্ধনী সহ যোজিত হইয়া নানা প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে কর্ত্তিত হইতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। মরিশশ ও চীন হইতে গতবৎসর প্রায় দশ লক্ষ মণ চিনি আমদানী হইয়াছে। আগরা বিভাগ হইতে ঘৃত আনাইয়া এখানে ব্যবসায় করা যাইতে পারে। এদেশে ঘৃতের কাটতি অল্প। ভুসি মালের ব্যবসায় অতি সমৃদ্ধ দেখিলাম।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে মানকজী দিনশা পেটীট নামক পারসি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। 'কিংবদন্তী' অনুসারে ইঁহার সম্পত্তি দুই কোটী টাকা। সরজম শেঠজী জিজি বাই এর বংশে ইদানীং কার্য্যক্ষম কেহ নাই। সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইলেও, ইঁহাদের বহু অর্থ নিঃসৃত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ইঁহারা চীনের সহিত বোতলের ব্যবসায় করিয়া উন্নতি লাভ করেন। যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ২২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তিনি এখন যোত্রহীন হইবার উপক্রান্ত হইয়াছেন। প্রেমচাঁদ স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া উক্তবিধ ও অন্যান্য দান করেন। কাপোল বণিয়াদের অগ্রণী সর মঙ্গলদাস নাথু ভাই। ধনগর্ব্ব অধিক হওয়ায় কুটুম্বদের সহিত অসদ্ব্যবহার করাতে বণিয়াদের মধ্যে আর একটি দল হইয়াছে। সেই দলের অধিপতির নাম ত্রিভুবন দাস। বণিয়ারা বল্লভাচারী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বলিলে, উত্তর হিন্দুস্থানীয় দেশে রাম সীতার উপাসক বুঝায়। বাঙ্গালা অথবা এখানে তাহা নহে। ঐশ্বর্য্যবান্ ও ভোগবান্ বণিয়া রাধাকৃষ্ণের উপাসক।

বিষ্ণু স্বামীর অনুশিষ্য তৈলঙ্গদেশীয় ভট্টবল্লভাচার্য্য, শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি গোকুলে বাস করিতেন। প্রথমে সন্ন্যাসী

হইয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্য কহিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই। অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই। বনবাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। উত্তম বসন-পরিধান, সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর। শ্রী আচার্য্যের শিষ্য রাণাব্যাস সহমরণোদ্যতা এক রাজপুতনীকে কহিয়াছিলেন, তোমার রূপলাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পণ না করিয়া, শবের উপর নিক্ষেপ করা অতিশয় অনুচিত। রূপলাবণ্য দ্বারা ঈশ্বরের সেবা কথাটি ক্রমশঃ বহুবিপত্তির মূল হইয়া পড়িল। রাধাকৃষ্ণের,—পুরুষপ্রকৃতির কুকবি-কল্পিত অমন কুৎসিত মূর্ত্তি যখন আদর্শ, তখন আর শ্রেয়ঃ কোথায়? বৈষ্ণবদের রাধা ধ্যান, রাধা জ্ঞান। এমন কি, গোকুলস্থ গোস্বামীরা ভৃত্যকে আহ্বান করিতে হইলে, রাধা বলিয়া ডাকেন; শ্রীবৃন্দাবনে গভীর রাত্রিতে প্রহরী রাধে, রাধে, বলিয়া রব করে। বল্লভাচারীদের গুরু মহারাজ নামে অভিহিত। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া উঁহাদের সংখ্যা ৩০।৪০ হইবে। শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিবেচনা করে। ভক্তশিষ্য, স্ত্রী বা পুরুষ হউন, গুরুকে তনু, মন, ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। মহারাজ অতিশয় সমৃদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করেন। ইহা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ হেতু, নানাবিধ উপায়ে শিষ্যদিগের নিকট হইতে ধন দোহন করা হয়। তৎসমুদায় যথা;—গুরু দর্শন ৫৲, স্পর্শ ২০৲, গুরুপদ প্রক্ষালন ৩৫৲, গুরুকে দোলায় বসাইয়া দোল দেওয়ার জন্য ৪০৲, চন্দনলেপন ৪২৲, একাসনে উপবেশন ৬০৲, মদন মূর্ত্তির সহিত অর্থাৎ গুরুর সহিত এক গৃহে অবস্থিতির জন্য স্ত্রীলোক শিষ্যের পক্ষে ৫০৲ হইতে ৫০০৲, গুরু বা তাঁহার সেবকের পদাঘাত খাইবার জন্য ১১৲, কোড়া আঘাত খাওয়া ১৩৲, রাস-ক্রীড়ার জন্য স্ত্রীলোক শিষ্যের পক্ষে ১০০৲ ২০০৲ গুরুর প্রতিনিধি দ্বারা রাসক্রীড়া ৫০। ১০০৲, গুরুর পানের পিক খাওয়া ১৭৲, মহারাজের স্নানোদক পান অথবা যে জলে মহারাজের বস্ত্র ধৌত হইয়াছে, সেই জল পান জন্য ১৯৲ টাকা দিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্রের কলুষিতমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বৈষ্ণবের হৃদয় এমনই কলুষিত করা হইয়াছে যে, মহারাজের ব্যবহারে তাহারা কিছু দোষ দেখে না। গুরু, ধর্ম্মের নামে অনায়াসে রমণীর সতীত্ব হরণ করিতে পারেন। করষণ দাস মুলজী নামক বণিয়াসমাজসংস্কারক,

এই গুরু-ভক্তির বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেন। ভক্তবৃন্দ ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই বিষয় আদালতে যাওয়াতে নানা কুৎসা প্রকাশ হইল। এক্ষণে করষণ দাস জীবিত নাই। সহিপৎরামরূপরাম নামা আর একজন সংস্কারক অধুনা দেখা দিয়াছেন; তবে তিনি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।

"জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র অশুভ-ফলপ্রদ। উহাতে জন্ম হইলে দোষ-প্রতিপ্রসবের জন্য সেই নক্ষত্রের নামানুসারে সন্তানের নাম রাখা হয়। যথা জেঠান্ধী, মূলন্ধী। এদেশে গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা আপন নামের পর পিতৃনাম যোগ করিয়া তাহার পর কৌলিক উপাধি সংযোজন করে। অনেকের কৌলিক উপাধি নাই, কেবল পিতার নাম ব্যবহার করে। বিবাহিতা স্ত্রী পতিগৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। বধূর নাম ধরিয়া ডাকা ভাল দেখায় না, একারণ একটি নূতন সংজ্ঞা প্রদান করিতে হয়। বিবাহের দিন কন্যা পতিগৃহে উপস্থিত হইলে, গৃহ-দেবতার সম্মুখে দম্পতী উপবিষ্ট হন। বরের মাতা তাঁহার বধূর যে নাম রাখা স্থির করেন, তাহা একপাত্রে তণ্ডুল রাখিয়া তদুপরি অঙ্কিত করতঃ জায়া-পতির কাণে সেই নাম বলিয়া দেন। স্বামীর নাম বিশ্বেশ্বর হইলে স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবাঁ হইলে রুক্মাবাই অবধারিত হইয়া থাকে।"

কুনবী দুই প্রকার। লেওয়া ও কড়ুয়া। কুনবী জাতির বিবাহ লগ্ন বড়ই চমৎকার। ১২ বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে, গায়কবাড় পরগণার উমা-গ্রামস্থ ভবানীর পূজারিগণ কর্তৃক বৈবাহিক-ক্ষণ স্থিরীকৃত হয়। সেই দিন দুগ্ধপোষ্য হইতে যুবতী পর্য্যন্ত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। দ্বিজাতি ভিন্ন বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবা বিবাহকে নাত্রা বলে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার শাড়ীর অঞ্চলে গ্রন্থি দেওয়া হয়। গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী, এক অশ্বে আরোহণ করিয়া জনতার মধ্য দিয়া গীত বাদ্যের সহিত গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিতগণ পতি পূজা করাইয়া নাত্রা কার্য্য সমাপন করেন। বিবাহানুষ্ঠানে অন্য কিছু আবশ্যক হয় না। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সম্মতিক্রমে বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থলালসায় বশ করিতে পারিলে,

স্ত্রী আপনার অভিলষিত-নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। কেহ কেহ গর্ভস্থ-ভ্রূণের বিবাহ সম্বন্ধ করেন। উভয়েরই যদি একবিধ সন্তান জন্মে, তবে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, নচেৎ বিকলাঙ্গ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলেও বিবাহের অন্যথা হয় না। কোনও পামরের স্ত্রী দশ বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, স্বামী সেই বালকের একটি তের বা পনর বৎসর বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। ইহাতে এক কার্য্যে দুইটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। সে ব্যক্তি গরিব বলিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে অক্ষম, আজ হউক, কাল হউক, পুত্রের জন্য একটি স্ত্রী চাই। সুতরাং দুই কার্য্য সমাধার জন্য উক্ত প্রণালী শীঘ্রই অবলম্বন করে। এরূপ ঘটনা অবশ্য অল্প, কিন্তু প্রকৃত বটে।

এখানে প্রতারণা করিয়া ইন্‌সল্‌ভেন্ট লওয়া অর্থাৎ দেউলিয়াপড়া বিলক্ষণ চলিত আছে। হিন্দু, মুসলমান ও পারসি সকলেই এ বিষয়ে পটু। কেহ কেহ পাঁচ ছয় বার দেউলিয়া হইয়াছেন। গুজরাত ও গুজরাতী নামক গ্রন্থপ্রণেতা ঐ কার্য্যকে কলিচুণকিয়ান নাম দেন। তিনি বলেন, ঐ আইনের আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হইলে বোত্রহীন ব্যক্তিও হঠাৎ ভাগ্যবান্ হইয়া উঠে। কেহ পত্নী বা মাতাকে অতুল স্ত্রী-ধন করিয়া দেয়। কেহ বা ধর্ম্মশালা নিম্মাণ করিয়া দেয়। ঐরূপ ব্যক্তি প্রায়শঃ নূতন আবাস প্রস্তুত করে। নব ব্যবসায় আরম্ভ হয়।

গুর্জ্জর ব্রাহ্মণের মধ্যে নাগরগণ অতি রূপবান্। আবু শৈলের নিকট তাঁহাদের আদি বাস স্থান। মহম্মদ গজনি উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করিলে যে সকল নাগর মুসলমানপক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথক্ জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহারা বাণিজ্য ও লিপি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা মেহতা শ্রেণী নামে অভিহিত। অপর শ্রেণীর নাম ভিক্ষু। তাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী। ভারতের মধ্যে সাম বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই জাতির মধ্যে আছে।

ইউরোপীয় উপনিবেশীদের ঔরসে এতদ্দেশীয় অন্ত্যজনারীর গর্ভে যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা ভারতীয় পর্ত্তুগীজ বা গোয়ানী নাম ধারণ করে। স্ত্রীলোকে দেশী পরিচ্ছদ পরে ও খৃষ্টীয় দেবালয়ে উপাসনা করিতে যাইবার সময় আপাদমস্তক শুক্লাম্বরে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। পুরুষে হ্যাট্ কোট্ ধারণ করে। আমাদের দেশে রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতিতে উক্ত পরিচ্ছদধারী ফিরি-

দিয়া যেরূপ সেতার সম্মান লাভ করিয়া থাকে, এখানে তদ্রূপ নহে। ইহারা এখানে সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য। কারণ, ইহারা অনেকেই পরিচারকের কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই জন্য টুপির মান হইতে পারে নাই।

ধনবান্ মুসলমান মদিরা ও কামিনীরাজ্যে বাস করে। গ্রাম্য মুসলমান সকলেই পূর্ব্বে হিন্দু (অংশই হীন) ছিল। এখনও অনেকটা হিন্দুবৎ চলে। তাহাদের কিন্তু অধিকাংশই নির্ধন। খোজা ও বোরা প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহু আঢ্য ব্যক্তি আছেন। মোল্লাকে ১০।১২ বার যিনি আক্রমণ করিয়া গৃহে আনিতে পারিয়াছেন, তিনি অতি ভাগ্যবান্। বহুবার তদায় সমীপে উপস্থিত হইতে পারাও প্রশংসার বিষয়।* মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈশ্বরের দূত জেব্রাইলের নামে একখানি অনুরোধ পত্র লওয়া আবশ্যক। এজন্য মোল্লাকে প্রভূত অর্থ দিতে হয়। সমাধির সহিত উক্ত পত্র খানি প্রোথিত করিতে পারিলে, শেষ বিচারের দিন মৃত ব্যক্তি তাহা দূতকে দিতে পারে। তখন জেব্রাইল আল্লার নিকট ভালরূপ অনুরোধ করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়া দেন। বোরা শব্দের অর্থ ফরিয়া। তাঁহাদের নাম যথা,—আদমজী, বিনজিদমজী ইত্যাদি। বিন বলিতে জনক বুঝায়। ধনহীন গুজরাতী মুসলমান এক ব্যক্তি প্রথমে বিলাতি দিয়াসলাই বেচিতে আরম্ভ করিল। দিন এক আনা উপার্জ্জন হইল। উহার সমস্ত খরচ না করিয়া কিছু বাঁচাইল। দুই আনায় সে একটি পরিবার চালাইতে পারে। শেষে ছোট খাট দোকান হইল। ক্রমশঃ অর্থ যেন আপনা হইতেই সঞ্চিত হইতে লাগিল। খরচ যত অধিক হউক না, আয়ের টাকা কখন সমস্ত ব্যয় করিবে না। সে লিখা পড়া জানে না, কিন্তু জ্ঞানবান্ হইয়াছে। সে পরিমিত ব্যয় করে বলিয়া কৃপণ নহে। যদিও অর্থ কি বস্তু তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, কিন্তু যখন মনে করে, তখন প্রচুর ব্যয় করিয়া থাকে। গরিবানাটা অতি কষ্টকর বোধ করে না, এবং বড়মানুষীটাও অতি প্রবলভাবে বুঝে না। সে ব্যক্তি জনপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু অন্য বিষয়ে নিতান্ত সরলবুদ্ধি। রাজনৈতিক বিষয়ে কিছুমাত্র অনুরাগ রাখে না। যেরূপ কেন অসুবিধা হউক না, যতদূর কেন ত্যাগ স্বীকার করিতে হউক না, শান্তির জন্য তাহা করিতে প্রস্তুত। বোম্বাই নগরের বিত্তশালী মুসলমানের প্রকৃতি উক্তবিধ নিরীহ ভাবের নহে। তাহা অনেকটা উগ্র। স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা

ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। এখানে আসিলে ঐ প্রথাটিকে মুসলমানী বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হিন্দু-সম্ভ্রান্ত-নারী অনাবৃত বদনে বিচরণ করিতেছেন, আর দীন মুসলমানের ভার্য্যা অবগুণ্ঠনে রহিয়াছেন। হিন্দু রাজ পরিবারের মধ্যে পাদসাহী সম্ভ্রমের অনুকরণে আবৃত শকট, বা শিবিকায় রমণীর গতায়াত প্রথা আছে।

ইউরোপীয় শব্দবিদ্যা অনুসারে পারসি জাতি আমাদের সহোদর। তাঁহারা বলেন, কীলক রূপা শিল্প লিপি, অবস্থা নামক পারসিক শাস্ত্রের খণ্ড নামক বিভাগের গাথ সংজ্ঞক প্রাচীন ভাগ ও ঐ শাস্ত্রের অবশিষ্ট ভাগ এই তিনটির এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত। এ তিন পারসীক ভাষার সহিত ভারত-বর্ষীয় বৈদিক সংস্কৃতের এরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই চারিটি ভাষাকে একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন দেশভাষা বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। অবস্থার কিয়দংশ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; ঐ অনুবাদ ভাগের নাম জেন্দ্। পহ্লবী অর্থাৎ জেন্দ বাহ্লীক (বাল্খ) অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ছিল। অত্রত্য অগ্নি দেবালয়ে ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য দুই একজন পুরোহিত নিয়োজিত আছেন। বর্ণমালা শেমেটিক প্রণালীতে দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিত হয়। যেমন ফারসি শেমেটিক নহে, অথচ আরব্য বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পয়ম্বরের নাম জোরো অস। সেই জন্য পারসীদিগকে জোরো অস-ত্রিয়ন বলে। এজাতিতে দুই লক্ষ লোক আছে। অধিকাংশ বোম্বাই সহরে বাস করে। ইঁহাদের মধ্যে উকিল, ডাক্তার, হাকিম অনেক আছেন। যদি কাহার ভিক্ষাজীবীর অবস্থা ঘটে, তাহার সহায়তা জন্য ধর্ম্মশালা আছে। কেহ কখন কোন পারসীকে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাইবে না। সেই জন্য পারসী অঙ্গ-নার মধ্যে বেশ্যা নাই। ইরাণী পারসী হইতে গুজরাতী পারসী কিছু বিভিন্ন। তাহার কারণ, এদেশের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ও হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ বলিতে হইবে। অধুনা বিশুদ্ধ পারস্য রক্তের শরীর অতি বিরল। কিন্তু এখন আর ইহারা অন্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয় না। পারসীদের পঞ্চায়েৎ সভা আছে। তাহা দ্বাদশ জন শেটিয়া শ্রেণীস্থ প্রবীণ পুরুষদ্বারা সংগঠিত। পুরোহিত অর্থাৎ দস্তুর সাহেব সমাজের নানা কার্য্য করেন। যে টাকা দেয়, তাহার জন্য রাত্রি দিন উপাসনা করেন। ইঁহাদিগকে শব বহন করিতে হয়। বিবাহসম্বন্ধ

করা ও বিবাহ ভঙ্গ করা এতদুভয়ের ইঁহারাই কর্ত্তা। পারসী নরনারী ঢাকাই মসলিন বা অন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত অঙ্গরক্ষা ধারণ করেন, তাহার নাম সদরো। স্ত্রী পুরুষের কটিদেশে উর্ণা নির্ম্মিত উপবীত থাকে। তাহাকে কুস্তি বলে। যগ্ন পুস্তকের ২২ অধ্যায়ে আছে, এজন্য কুস্তির ২২ খেই; বৎসর দ্বাদশ মাসাত্মক, একারণ উহাতে ১২ গ্রন্থি দিতে হয়। মস্তক অনাবৃত রাখা স্ত্রীপুরুষের পক্ষে অতি ভয়ানক কর্ম্ম। তাহাতে শয়তানের দৃষ্টি হয়। সেই জন্যই বুঝি যতদূর হইতে পারে, পাগড়ি উচ্চ করিয়াছে। স্ত্রীলোকে এক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র শিরে জড়াইয়া রাখে। ইদানীং রমণীসমাজ কুন্তলদাম সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত রাখা অন্যায় বিবেচনা করিতেছেন, তাহাতে বন্দ ক্রমশঃ পশ্চাৎভাগে সরিয়া যাইতেছে। কালক্রমে হয়ত একবারে শাড়ীর মধ্যে লুক্কায়িত হইবে। বাটীতে অবস্থান কালে ইহারা ইজার পরিধান করিয়া থাকেন; বাহির হইবার সময় তাহার উপর রেসমি চীনের শাড়ী চড়াইয়া দেন। পারসী অঙ্গনার মুখ খানি যেমন সরলতার ছবি। (গুজরাতী হিন্দু ললনার মুখ বিলাসপূর্ণ। মহারাষ্ট্র সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী, দেবী প্রতিমার মত আমার সম্মুখে এক একবার প্রতিভাত হয়। তাহার মুখ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।) ধর্ম্মনিরত পারসী প্রাতরুত্থান করিয়া, ত্রিদন্তী কুস্তি উন্মোচন করতঃ দিবাকর যে দিকে উদিত হইতেছেন, সেই দিকে চাহিয়া তিন বার ঝাপটা দিয়া জেন্দ ভাষায় বলেন; "শয়তানকে পরাজয় কর"। তাহা হইলে শয়তান সে দিন তাঁহার আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। স্নানের পর প্রকৃত উপাসনার আরম্ভ হয়। প্রার্থনাপুস্তক জেন্দ ভাষায় গুজরাতি অক্ষরে লিখিত। উহা অগ্নির নিকট আবৃত্তি করা আবশ্যক। রন্ধনশালা, বৈঠকখানা বা আলো বেহরম হউক, অগ্নি থাকিলে এ সকল স্থানেও আবৃত্তি চলে। অন্য সময় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বাপী, তড়াগ, সমুদ্র, নদী, তরু, গুল্ম বা পর্ব্বতসন্নিধানে আরাধনা হইতে পারে। দিবসের বিভাগ অনুসারে পাঁচবার নমাজ করা আবশ্যক। বহুক্ষণ আবৃত্তি করেন, কিন্তু কি বলিতেছেন, তাহার একটি বাক্যও বুঝিতে পারেন না বলিয়া, নিজ কামনা গুজরাতি ভাষায় বলিয়া উপসংহার করা হয়।

দেওয়ালী পর্ব্ব উপস্থিত। এ নগরে বৎসরের মধ্যে এইটি প্রধান উৎসব। গৃহসংস্কার ও নূতন খাতা, এই দুইটি প্রধান ব্যাপার। আলোকমালার কথা

বলা আবশ্যক, কারণ তাহা এককণের আল। বোম্বাই ভারি রাজ দীপ—নগরী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অমাবস্যার দিন ক্রফর্ডমার্কেট খাতখারিমাজার ও পারসিবাজারে উত্তীর্ণ হইলে, বোধ হইল যেন, আলোকের নদীতে নিমগ্ন হইয়াছি। ইহা কাশীধামের দেওয়ালী নহে; সর্ব্বত্র কাচ পাত্রে দীপ সন্নিবেশিত। (পূর্ব্বে এই দিনে ঠগ সম্প্রদায় ভবানীর নিকট নরবলি দিত।) প্রাকৃত আচারে সমুদ্র জলে প্রদীপ ভাসান হয়। ঐ দীপ জলা বা নির্ব্বাণ হওয়া দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় হয়। পরদিন বর্ষ আরম্ভ হইবে, কিন্তু চতুর্দ্দশীর রাত্রেই নূতন বহির অর্চ্চনা হইল। আরও আশ্চর্য্য এই যে, বর্ষগণনার যে সম্বৎ ব্যবহৃত হয়, তাহা চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ। আর্য্য জাতির পুরাকালে অগ্রহায়ণ মাসে নব-বর্ষের আরম্ভ হইত, সেই জন্য মাসের নাম অগ্রহায়ণ। নতুবা কেবল মার্গশীর্ষ বলিলে চলিত। পূর্ণিমার দিন, মাস শেষ হয় বলিয়া তিথির নাম পৌর্ণমাসী। এদেশে অমাবস্যায় মাস পূর্ণ হয়। বর্ষ-আরম্ভের উক্ত সময় অনুসারে বোধ করি দেওয়ালীর দিনে ব্যবসায়ীদের অব্দ আরম্ভ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু অব্দ ব্যবহারের জন্য বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ লইতে হয়। দেওয়ালীর জন্য আত্মীয়ের বাটীতে নানা মিষ্টান্ন উপহার যাইতেছে। নরনারী বেশভূষা করিয়া কুটুম্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছেন। এই উৎসবটা এমন ব্যাপক যে, ঘরের মধ্যে ও বাহিরে সমান স্রোত বহিয়া থাকে। এই আহ্লাদ-সমুদ্রের তাবৎ দী নির্ব্বাণ না হইতে দিয়া উষাকালে পুনাগমন উদ্দেশে বোড়ি বন্দর ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। ভারতের মধ্যে এত বড় ও বহুব্যয়সাধ্য রেলওয়ে ষ্টেশন আর দ্বিতীয় নাই।

মহারাষ্ট্র।

মনুষ্যদেহে যেমন অস্থি, পৃথিবীর স্থলভাগে সেইরূপ পর্ব্বত। এই জন্য পর্ব্বতের নাম ভূধর। ঘাটাখ্য পর্ব্বত অরঙ্গাবাদ হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত বিশাল প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বোধ হয়, সমুদ্রকে ভারত প্লাবিত করিতে নিষেধ করিতেছে। এই পর্ব্বতের উত্তর ভাগকে সহ্যাদ্রি কহে। বদলাপুর অতিক্রান্ত হইলে পর্ব্বতের শোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল। ভোরঘাট উত্তানপথে উঠিবার জন্য করজট নামক স্থানে যাইয়া বৃহৎ ইঞ্জিন লওয়া হইল এবং নামিবার কালে শকট শ্রেণী যদি গড়াইয়া পড়ে, সেই জন্য পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণার্থ কয়েকখানি ব্রেক শকট যোজনা হইল। এখান হইতে লনৌলি পর্য্যন্ত ১৬ মাইল অদ্রিঅঙ্কে লৌহবর্ত্ম উন্নত এবং আনত ভাবে চলিয়াছে। ঘাট পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বধারে যাওয়া আবশ্যক। অবশ্য প্রাকৃতিক ছেদ আছে, তাহার নাম ভোরঘাট। সেই সরণি অবলম্বন করিয়া সানুনির্ম্মাণ করতঃ গিরি কটক ভেদ করিয়া পথ গিয়াছে। চড়াই দুই সহস্র ফিট। এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাইবার জন্য বহু সেতু আছে। মোহকীমলি সেতু ১৬৩ ফিট উচ্চ। সহ্যাদ্রির শোভা অবশ্য মোহজনক। তরুগুল্ম ও নির্ঝর, এ সকলের অপ্রতুল নাই, কিন্তু আমরা পর্ব্বত বলিলে, হিমবৎ স্মরণ করি। বড় বড় পাইন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। চক্ষু নীহার মণ্ডিত শৃঙ্গ দেখিতে চায়। ভৈরব ভাব যদি না দেখিতে পাইলাম, তবে আর অদ্রির সৌন্দর্য্য কি? অনেক শৈল দেখিলাম, হিমালয়ের ছবি অন্যত্র মিলিল না! ঘাট পর্ব্বত, আর এক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের কারণ হইতেছে। এমন পর্ব্বতগাত্রে পথ (রেল) কোথাও দেখি নাই। ভারতের মধ্যে ইহা একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান। বাষ্পীয় যান এখানে ব্যোমযান স্বরূপ হইয়াছে। আকাশে গাড়ী ছুটিতেছে, মর্ত্ত্যলোকে গ্রাম, শস্যক্ষেত্র ও অবিরল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথ কঙ্কণ প্রদেশ শোভা করিয়া বিরাজ করিতেছে। যে স্থলে প্রভূত প্রস্তর কর্ত্তন করিতে হইবে, সেখানে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পথ হইয়াছে। দ্বিদশতি (বিংশতি) সংখ্যক বা ততোধিক টনেল

হইবে। অন্ধকারে যখন ঐ পথে যাইতে হয়, আরোহীগণ "বিট্ঠল হরি" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। রিভরসিং ষ্টেশনে যাইয়া দেখা গেল, আর সম্মুখে পথ নাই। যে পথ আসিয়াছি, তাহার উপর স্তর দিয়া চলিতে হইল। বহু উচ্চে খণ্ডালার বাঙলা দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ তথায় পৌঁছিলাম। এই স্থান মৃগয়াপ্রিয় মানবের বাঞ্ছনীয়। ব্যাঘ্র ও হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। এ বনে বারশিঙ্গা পাওয়া যায়। বেলা দুইটার সময় পুণ্যপত্তনের গণেশ খিন্দ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাষ্ট্র রাজধানী পুনানগরে অবতরণ করিয়া এক ব্রাউহাম ভাড়া করিয়া "রাজমান্য রাজেশ্বরা" অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত সাঠে মহাশয়ের বাটীতে যাত্রা করিলাম। পথি মধ্যে কয়েকখানি মাড়য়ারির মুদিখানার দোকান দৃষ্ট হইল। ইহারা দেখিতেছি সর্ব্বত্র আছে। সকলেই ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু ইহারা নাহিলেও চলে না।

সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বতী (পার্ব্বতী) দর্শন করিতে যাওয়া হইল। পর্ব্বতের উপর এই পার্ব্বতীর মন্দির সাতারা রাজের স্মরণার্থ বালাজী বাজীরাও কর্ত্তৃক পানিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মহারাষ্ট্র গৌরব চিরদিনের জন্য পাণিপথের যুদ্ধস্থলে বিসর্জ্জন দিয়া বালাজী ভগ্নমনে প্রত্যাগমন করিয়া রোগ শয্যায় শয়ন করিলেন এবং এই শৈলে প্রাণত্যাগ করিলেন। হরিগোবিন্দ আমাদিগকে দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া একটী বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন ও ইংরাজী ভাষায় কহিতে লাগিলেন,—এই স্থান হইতে পেশোয়া বংশের শেষ ভূপতি, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, দুই সহস্র আটশত সৈন্য কর্ত্তৃক তাঁহার অষ্টাদশ সহস্র যোদ্ধাকে খিরকি নামক স্থানে পরাজিত হইতে দেখিয়াছিলেন। যে বৎসর বাজীরাওর রাজ্য ইংরাজ গ্রহণ করিলেন, সেই বৎসরেই বজ্রাঘাতে এই বাটী ভগ্ন হইয়া যায়। মন্দিরজীবী অনাথগণের সাহায্যের নাম করিয়া প্রদর্শক ঠাকুর আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এখান হইতে অবতরণ করিয়া মুলামুতা তটিনী উপরে বন্দ উদ্যান ভূমিতে বিচরণ করিবার সঙ্কল্প হইল। পুনার নরনারী সন্ধ্যাকালে এই প্রদেশে ভ্রমণার্থ উপস্থিত হন। ইংরাজী বাদ্য উত্তম হয়। উদ্যানের নূতনত্ব এই যে, টবে বসান গাছ দ্বারা উপবন রচিত। একটী প্রস্রবণে ছত্রের আকারে বারিধারা উত্থিত হইতেছে। বন্দ জল প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্য। কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হইলাম। প্রভূত জলরাশি মহাবেগে সশব্দে

পতিত হইয়া ফেণিল ভাবে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবমান হইয়াছে। বাঁধ ছাপাইয়া ধারাগুলি স্ফটিক রেখার ন্যায় নিপতিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রপাতের সৌন্দর্য্য আর একরূপ দেখিলাম। আলোক ক্ষীণ বলিয়া বাঁধ বা জল দেখা যাইতেছে না। কেবল জলের যে ভাগ ক্ষুব্ধ হইয়া শ্বেত হইয়াছে, তাহাই চন্দ্রিকা মাখিয়া নয়ন পথগামী হইতেছে। দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব।

চতুঃ শিঙ্গি দেবীর মন্দির "ডোঙ্গরের" (পাহাড়) উপর। সোপানাবলির উভয় পার্শ্বে সানুদেশে ইতস্ততঃ কুনবীমরঠগণ আহারান্তে কাদম্বরী সেবা ও তাস ক্রীড়া করিতেছে। সে দিন দেবীর পর্ব্বাহ। দেবালয়ের অভ্যন্তরে যাইয়া মদিরার গন্ধ পাইতে লাগিলাম। এটি বীরমার্গ অনুবর্ত্তীদের স্থান। দেবীর গলদেশে তাম্বুলবল্লির মালা। ভাত, লুচি ও মদ্য দিয়া নৈবেদ্য হইয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোকের উপর দেব আবির্ভাব হইয়াছে, সে নানা প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। দেব পূজা করিয়া পূজারি রমণীর নিকট এক খণ্ড নারিকেল প্রসাদ পাইলাম। পর্ব্বতের নিম্নে এক চত্বর আছে, উহাতে বলিদান হয়। নানা ফরণবিশ কৃত দেবায়তনের নাম বেলবাগ। প্রাতঃকালে মৃদঙ্গ ও বাণা সহযোগে নারায়ণ সমক্ষে স্তুতি গীত হয়। একাদশীর দিন অপরাহ্নে বিপুল জনতা দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য নরনারী উপবেশন করিয়া কথকতা শ্রবণ করিতেছেন। কথক দণ্ডায়মান হইয়া মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন করতাল ও মৃদঙ্গ লইয়া পশ্চাৎ রহিয়াছে। কথক যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কীর্ত্তন অন্তে ব্যক্তি বিবেচনায় আলিঙ্গন ও প্রণাম গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ দেবতার কিছু প্রসাদ লইয়া বিদায় হন। কীর্ত্তন সরস করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে টুকারামের অভঙ্গ নামক কবিতা ব্যবহার করেন। (টুকারামের ইষ্টদেবতা বিঠোবা পানঢর পুরে অবস্থিত। সম্প্রতি তত্রত্য মহা উৎসব উপস্থিত। বিসূচিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।) তুলসীবাগ পুনার মধ্যে প্রধান দেবালয়। একজন "সাউকার" কয়েক বর্ষ হইল, প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরের আকার —রাজসিংহাসনের ন্যায় কতকগুলি তোরণ (খিলান) উপর্য্যুপরি গ্রথিত হইয়াছে। মন্দির উচ্চ হওয়ায় সেইরূপ আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়া শিখর দেশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যহ মন্দি-

য়ের তাবৎ প্রকোষ্ঠে আলিপনা দেওয়া হয়। ইহা সুখসাধ্য করিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত "রোলর" মধ্যে চূর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে আপনা হইতে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। গর্ভগৃহে রাম লক্ষ্মণ জানকী বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছেন। প্রাঙ্গণের প্রাচীরে রামায়ণ প্রতিপাদক চিত্র অঙ্কিত আছে ও ইহার নিম্নে লীলার নাম লিখিত হইয়াছে। যে দেবালয়ে সমারোহ আছে, আগন্তুক ব্যক্তি সে স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে অর্দ্ধেক নগর দেখার ফললাভ করিতে পারেন। এই স্থান ও বাঁধসন্নিহিত উদ্যান এখানকার মধ্যে ভ্রমণের বিলাস ভূমি।

বোম্বাইয়ের অনেক প্রধান ব্যক্তি এখানে বাস করেন। প্রাবৃট্‌কালে গভর্ণরের পুনায় নিবাস হয়। বোম্বাই অপেক্ষা এখানকার জলবায়ু উত্তম। বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজিসৈন্য এখানে অবস্থিতি করেন। সহরে বিজাতীয় হর্ম্ম্যনির্ম্মাণপ্রণালী প্রবেশ করে নাই। অবশ্য একথা ইংরাজপল্লি সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। জোশী হল বা সার্ব্বজনিক সভাগৃহ ও স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্য্যালয়টি বোম্বাই প্রণালীর কাচের সার্শিমণ্ডিত। অধিবাসীগণের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোট পেণ্টুলেন পরিধান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে, পরিধান দেখিলে, যে ইংরাজি নবিশ নহে, তাহাকে চিনা যায়। এখানে "সুধারণে আমাকে" ও (সংস্কারক) মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দীর্ঘ শিখা রাখিতে হয়। পায়ে দেশীয় উপানৎ। পরিধেয় কখন রজকালয় দর্শন করে নাই। এইরূপ পুরস্থাধোত প্রশস্ত রক্তকূল বস্ত্র ও উত্তরীয়। দীর্ঘ অঙ্গরক্ষাটী কিন্তু পরের বাড়ী দিতে হয়। মস্তকে রথচক্রের মত শিরোবেষ্টন। স্ত্রীলোকে কাছা কোঁচা দিয়া গাত্র আবৃত করিয়া যে দেশী রঙ্গিন সাড়ি পরিধান করে, তাহার অন্যথা হইবার নহে। আমরা পারসি মহিলার সাড়ি দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনার গৃহিণীর জন্য ক্রয় করিতে পারি, কিন্তু মরাঠী অঙ্গনা কদাপি তাহা ব্যবহার করিবেন না। শ্লথ পাদুকা ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে দূষ্য নহে। বাঙ্গালার ন্যায় ছত্রদণ্ডের বহুল ব্যবহার আর কোথাও নাই। সুদরিদ্র কৃষকগণ সজ্জা করিয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে ছাতাটী লইবে। এ বিষয়ে কলিকাতাবাসিদের এক কৌতুকাবহ ব্যবহার আছে। রৌদ্র বা বৃষ্টিতে পারগ পক্ষে আতপত্র লইয়া যাইবেন না, যদি লইলেন, বৃষ্টি রৌদ্র না থাকিলে মাথায় দিয়া

যাইতে হইবে। কলের জল লইবার জন্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পৃথক্ কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণাচা হৌজ" "শূদ্রাচা হৌজ"। যখন এপথে প্রবেশ করিয়াছি, বস্ত্র প্রক্ষেপের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন, নতুবা যে মরঠ জাতির বাস বলিয়া দেশের নাম মহারাষ্ট্র বা মরঠ্ঠা হইয়াছে, সে মরঠ শব্দে কেবল শূদ্র বুঝাইবে কেন? একদা শ্মশান দেখিতে যাওয়া হইল—এখানে (ঘুঁটে) দ্বারা চিতা প্রস্তুত হয়। ডাল ও রুটি দ্বারা পূরক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গভর্ণরের কাউন্সিল হল অতি বৃহৎ গৃহ। এখানে অনেকগুলি তৈল মিশ্র রঙ্গের চিত্র আলম্বিত আছে। দেশের খ্যাতিমান্ ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবার কার্য্য ইহাতে নির্ব্বাহ হইল। যাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম যথা—খান বাহাদুর পদমজী পেসতনজী, খান বাহাদুর নৌশির ওয়ানজী, পেসতনজী, সোরাবজী, ফ্রামজী পটেল, ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ, সর মঙ্গল দাস নাথুভাই, ডাক্তার ভাউদাজি, কোচিনের রাজা, সর সালারজঙ্গ, ভাউনগরের ঠাকুর, মোরভীর ঠাকুর খণ্ডেরাও গায়কয়াড় এবং সর ত্র্যম্বক মাধবরাও, ও শঙ্কর শেট। এই বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাসাদ অবলোকন করিয়া যদি পেশয়ার ভবন দর্শন করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে জগতের বৈচিত্র চমৎকার অনুভূত হইবে। শনিবার পেট আমাদের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিত, এখানে একটী প্রাকার বেষ্টিত, বাটীতে মহারাজ পেশয়া বাস করিতেন। প্রহরীর অনুমতি লইয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কাল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। দুর্ভেদ্য প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যে কেবল পতিতভূমি অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর সকল আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তরুণ পেশয়া মধুরাও অট্টালিকার উপর হইতে পতিত হইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নানা ফারনাবিষ রাজকার্য্য ভার ও ক্ষমতা ধারণ করিতেন। তিনি পেশয়ার ভ্রাতাকে বন্দী করায় মধুরাও অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপনাকে কর্ম্মচারীর অধীন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া সভায় আসা ত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত শয়ন গৃহের বাহির হইতেন না। বিজয়াদশমীর দিন না হইলে নয় বলিয়া সৈন্তগণের সমক্ষে দেখা দিলেন এবং রাত্রে দরবারে সরদার ও দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন

কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না। এই ঘটনার দুই দিন পরে ইহলোক ত্যাগ করিবার জন্য ছাদের উপর হইতে পতিত হন। ফুহারার উপর পড়ায় দেহ অতিশয় ক্ষত হইল ও দুই খানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গেল। তারপর দুই দিন গত হইলে প্রাণ বহির্গত হইল। তাঁহার অতি প্রিয় বাবারাও ফড়কের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মরিবার সময় বলিয়াছিলেন, নানার শত্রু বাজীরাও মসনদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আর এই "জুনাবাড়া" তেই ১৭৭৩ খ্রীঃ ওঃ ৩০শে আগষ্ট ঊনবিংশ বয়সে নয় মাস মাত্র রাজ্যকালে নারায়ণ রাও তাঁহার রক্ষক সোমর সিং ও এলিয়া কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নারায়ণ তদীয় পিতৃব্য রঘু-নাথ রাওকে এই বাটীর এক দেশে বন্দী দশায় রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আপন মুক্তি কামনায় ঐ ঘাতকদ্বয় দ্বারা পেশয়াকে ধৃত করিবার জন্য আজ্ঞা লিপি দেন। রঘুনাথের পত্নী আনন্দী বাই গোপনে সেই লিপির ধৃত শব্দ হত শব্দে পরিবর্ত্তিত করিলেন, নারায়ণ পিতৃব্যকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি নিষেধ করিলেও সোমর সিং অনুমতি পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। এই সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আগমন করিলাম। এই বাটীর চতুর্দ্দিক্ বাজার, সেই জন্য এই স্থানের অপর নাম মণ্ডি। সম্মুখে তরকারি ও বিবিধ ফল এবং লঙ্কা মরিচ ও পলাণ্ডু, সকল বস্তুই অপরিমিত ভাবে বিক্রয় হইতেছে। এক পার্শ্বে কুম্ভকারের দ্রব্যজাত, অন্য পার্শ্বে ইন্ধন বিক্রয়ের স্থান। বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় হয়। লিমজীর হোটেল এই দিকে। অধিক রাত্রে এখানে আসিলে বিলক্ষণ কৌতুক দেখিতে পাওয়া যায়। লিমজী পরিহাস করিয়া বলেন, আমার হোটেল কেবল ব্রাহ্মণ জাতির জন্য স্থাপিত। অন্যকে মদ্য মাংস বিক্রয় করি না; ফলতঃ ইংরাজি-শিক্ষিত নিরামিষ-ভোজী পুনার ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে গোপনে মদ্য মাংস ব্যবহার করা অন্যায় বিবেচনা করেন না।

পুনানগরে তিন খানি নাট্যশালা আছে। টীকিট বাজারে বিক্রয় হয়। আমরা একজন মহারাষ্ট্রীয় সহচরের সহিত কর্ণপর্ব্ব অভিনয় দর্শন করিতে গেলাম। নিয়মিত সময়ে নাট্য আরম্ভ না হওয়ায় কিয়ৎকাল বহির্দ্দেশে থাকা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী ভবন হইতে যন্ত্র সঞ্চালিনীর কোকিল কণ্ঠ গীতি নিঃস্বন আগমন করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। রঙ্গভূমির মুখপটের চিত্রের দৃশ্য

অতি ভয়ানক। দশভুজা অসুর সংহার করিতেছেন। প্রথমতঃ শংখ ঘণ্টা বাজাইয়া গণপতির পূজা হইল। তাঁহার পর সরস্বতী বন্দনা করায় তিনি স্বয়ং কটিদেশে বাহনের অবয়ব সংলগ্ন করিয়া আগমন করতঃ মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। একজন ইংরাজ সাজিয়া আসিয়া ব্রাহ্মীর সহিত পরিহাস করিতে লাগিল। সরস্বতী পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, আমরা দেবতা, আমার সহিত এ ব্যবহার করিও না। এইরূপ ভাবে প্রস্তাবনা আরম্ভ ও শেষ হইয়া কাব্য আরম্ভ হইল। পাত্রের গেয় গান গুলি পটের বাহিরে মহারাষ্ট্রীয় কীর্ত্তনের প্রণালীতে মৃদঙ্গ ও মন্দিরা সহযোগে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক গীত হইতে লাগিল। অভিনেতাদের অঙ্গবিক্ষেপ এমন প্রবল যে, আলোকের একটী কাচনালী পতিত হইল। এ দলে দুই একটী স্ত্রী অভিনেত্রী আছেন। এতদ্দেশে অবরোধ প্রথা না থাকায় কুলবতীর দ্বারা অভিনয় হওয়ার প্রতিবন্ধক নাই। তথাপি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালায় যাঁহারা বারস্ত্রী কর্ত্তৃক অভিনয়ের বিরোধী, তাঁহারা এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। বিশেষতঃ কলিকাতার মত স্থান, যে স্থানের রুচিতে বেশ্যাবৃত্তি-নিরতা ঠিকে চাকরাণী পুরস্ত্রীগণের সহিত থাকিতে পায়, সেখানে নটী কুলটা হইলে নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। স্ত্রীচরিত্র পুরুষে অভিনয় করিলে দৃশ্য অস্বাভাবিক হয় বলিয়া স্ত্রীলোক গ্রহণ করা হইয়াছিল। অধুনা কলিকাতার রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজে; এ কুদর্শন সহ্য হইতেছে। রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত আমরা থাকিতে অক্ষম বলিয়া কুঞ্চিকা আনাইয়া দ্বারের তালকোদ্ঘাটন করতঃ বিদায় লইতে হইল।

এদেশের প্রাকৃত লোক মল্লযুদ্ধকে অতিমাত্র প্রিয় জ্ঞান করে। তাহারা নাটক অভিনয় দেখিতে যায় না। কুস্তি অবশ্য দেখিবে। রঙ্গস্থলে প্রবেশের মূল্য এক আনা বা দুই আনা। প্রবর্ত্তক জয়ীকে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার দিয়া থাকেন।

নাট্যশালার দ্বারে নিবিড় জনতার মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য দর্শকের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল। একজন পঞ্জাবীর শিষ্যের সহিত এক মরঠ্ঠার শিষ্য ক্রীড়া করিল। শেষোক্ত ব্যক্তি জয়লাভ করিবামাত্র তাহার ওস্তাদ সাগ্‌রিদকে লুফিয়া লইলেন ও গুম্ফে চাড়া দিতে

লাগিলেন। আত্মীয় লোকের সহিত অভিবাদন ও করমর্দ্দন হইতে লাগিল। কেহ জয়ীকে ব্যজন করিতেছে, কেহ বা অঙ্গের ধূলা মুছাইতেছে, তাহার আজ আহ্লাদের সীমা নাই। যে পরাভূত হইয়াছে, সে কোথায় লুকাইল, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যখন উভয়ে মল্লভূমিতে অবতরণ করিয়া করস্পর্শ করিয়াছিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে বৈরভাব ছিল না। কিন্তু অবস্থা ব্যতিক্রমে একের পৃষ্ঠে পতিত হইয়া মুখে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে ও মনিবন্ধ দ্বারা প্রহার করিতেছে। দেখিলে জ্ঞান হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাচক্র মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায়। জেতার বন্ধুগণ তাহাকে সুপরিচ্ছদ ও জরির পাগড়ী পরিধান করাইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে পুর মধ্যে লইয়া চলিল। এ ক্ষেত্রে কোনও উচ্চবর্ণের লোক দেখিলাম না। এই মহাপুরুষেরা বাঙ্গালায় যাইয়া বর্গির হেঙ্গাম করিতেন। ইহাদিগকে দলবদ্ধ দেখিলে রঘুজী ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিতকে (১৭৪৩—৫১ খৃষ্টাব্দ) স্মরণ হয়। এই কুস্তি দেখার দিন প্রাতে অত্রত্য প্রার্থনা সমাজে যাওয়া হইয়াছিল। অনারেবল রাওসাহেব মহাদেবগোবিন্দ রানড়ে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। আমার পরিচিত একটি বাঙ্গালা ব্রহ্মসঙ্গীত মরাঠীতে গীত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গালার বস্তু বলিয়া আমি প্রার্থনা সমাজে বসিয়া আত্ম গৌরব অনুভব করিলাম।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ জাতিভেদ প্রভৃতি নিবারণ উদ্দেশে ১২ বার জন ছাত্রকে লইয়া পরম হংস সভা স্থাপন করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার পর সামাজিক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। পাঁউরুটি ভক্ষণ ও মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করিতে হইত। ঐ সভার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাইয়ে প্রার্থনাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে সভ্যেরা বিবেচনা করিয়াছেন, সামাজিক নিয়মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইলে সমাজসংস্কার আপনি হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মোৎকর্ষ, বিদ্যাবিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা, গার্হস্থ্য প্রণালী সংশোধন হইলে, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি আপনি উঠিয়া যাইবে। ইদানীং যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন, নাসিক যাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করতঃ তাঁহারা হিন্দুসমাজে গৃহীত হন। দুই একটি ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু সমাজে তাহারা স্থগিত আছে। মহাদেব গোবিন্দ রানড়ের স্ত্রীবিয়োগ হইলে অনেকে আশা করিয়াছিলেন, ইনি কুমারী

বিবাহ করিবেন না, কিন্তু সমাজ ভয়ে বিধবা বিবাহ করিতে পারিলেন না। রাজনৈতিক শিক্ষায় পুনা বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। যে মহাশয় সার্ব্বজনিক সভার প্রাণ, সভ্য শ্রেণীতে তাঁহার নাম নাই। রাজসদনে উক্ত সভা হইতে যে সকল আবেদনপত্র পাঠান হয়, তাহা উঁহার লিখিত। দেশ হিতকর কোন সমিতি বা অপর কার্য্যে যাইয়া যদি ইংলিশ রাজপুরুষ দেখিতে পান, তাহা হইলে অদৃশ্য হন। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চ্চা দেখিতে পাইব। বেদ ধ্বনিতে কর্ণ পবিত্র হইবে। যজ্ঞীয় ধূমের দর্শনলাভ হইবে। ইংরাজ অধিকারে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। "বেদোত্তেজনী সভাকে" বেদপাঠীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। সময়ে সময়ে এক এক জন বৈদিক ভ্রমণ করিতে আসিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া যান।

প্রভুজাতি এদেশের কায়স্থ। মদ্য মাংস ভক্ষণ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কুক্কুট মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। ইহারা লেখা পড়া দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শেনেবি ব্রাহ্মণও মৎস্য মাংস ভোজী। এদেশের বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডাকর ও মৃত ভাউদাজী এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। চিতপাবন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ক্যাম্বেল কহেন, মনুষ্যজাতির আদিম জন্মস্থান হইতে সরস্বতী ও সিন্ধু নদ বাহিয়া সমুদ্রপথে এই জাতি কঙ্কন ভূভাগে আসিয়া আবাস স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের মধ্যে বাস না করায় অনার্য্য রক্ত সংমিশ্রণ হয় নাই। দেশস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা চিতপাবনদিগকে অধম বিবেচনা করেন। পেশয়া এই শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করায় কোকনস্থ ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ড নামক গ্রন্থে চিত পাবনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু অপকর্ষ বর্ণিত থাকায়, বাজিরাও ঐ পুস্তকের তাবৎ খণ্ড নষ্ট করেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চানক্য কোকনস্থ ছিলেন। কল্যাণ নামক স্থানে তাঁহার বাটী ছিল। রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পটু। রাজা যে জাতির হউন, তরবারি তাঁহার হস্তে থাকুক, কিন্তু ব্রাহ্মণ মেধা ও লেখনার বলে রাজ্যের শাসন কার্য্য করিবেন। ইদানীং বোম্বাই রাজ্যে তাবৎ না হইলেও অধিকাংশ লেখাপড়ার কার্য্য এই জাতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্তা "লিওয়ার্নর" আজ্ঞা করিয়াছেন, পারদর্শিতা অনুসারে আর না দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট

বৃত্তির এক ভাগ বিদ্যোপার্জ্জনবিমুখ কুনবি প্রভৃতি জাতির ছাত্রকে দেওয়া হইবে। সার্ব্বজনিক সভা অতি কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের উত্তর আরো কর্কশ হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, সমস্ত লিখন পঠনের কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চায়। উহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই ব্রাহ্মণ জাতির যন্ত্র পুনার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি তার স্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। সার্ব্বজনিক সভারও ঐ কর্ম্ম। এখানে হাই স্কুল নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ শ্রেণী পর্য্যন্তের সকল শিক্ষক গ্রাজুয়েট্। তাঁহাদের সংকল্প গভর্ণমেণ্টে চাকরি করিবেন না। এই বিদ্যালয়ে যাহা লাভ হইবে, তুল্যাংশ করিয়া গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীজাতির কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। পণ্ডিতের ঘরের কন্যা হইলে অল্প সংস্কৃত পঠন অভ্যাস হয়। বোধ হয় এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইংরাজী শিক্ষার জন্য ফিমেল হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই সময় সয়াজীরাও গায়কয়াড় এখানে আগমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য রেলওয়ে ষ্টেশন সজ্জিত করা, সার্ব্বজনিক সভা হইতে পান শুপারি দেওয়া প্রভৃতি নানা আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ পান নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় মাহারাষ্ট্র ভূপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, স্থিরীকৃত হইল। ইতি পূর্ব্বে স্কুল ইনস্পেক্টর কর্তৃক সে দিনকার সভায় কি কার্য্য হইবে, তাহার অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ছাত্রীগণ কর্তৃক ন্যাসনেল অ্যান্থম্ গীত হইবে লিখিত ছিল। ডিরেক্টর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে কহেন, উক্ত সঙ্গীতের সময় সভাস্থ সকলকে ইংরাজী প্রথা অনুসারে মহারাণীর প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। তাহাতে অধ্যক্ষগণ কহিলেন, দর্শকদের মধ্যে বহুবৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক হইতে পারে. তাহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, সুতরাং "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গান হইয়া কাজ নাই। নিয়মিত সময়ে সভায় যে অনুষ্ঠান-পত্র দেওয়া হইল, তাহাতে যে স্থানে সঙ্গীতের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া দেওয়া হইল। লিওয়ার্ণর তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত সঙ্গীতের এক অংশ বালিকাদিগকে গাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন, এবং গভর্ণমেণ্টে এসংবাদ

স্থাপন করিলেন। ঋগ্বেদের মরাঠী অনুবাদক (বেদার্থযত্ন সম্পাদক) ও হাই-কোর্টের অনুবাদক শঙ্কর পাণ্ডারঙ্গ পণ্ডিত ন্যাশনল আন্থেম্‌ গীত হইবার কথা মসিধারা কর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন। লিওয়ার্ণর কহিলেন, গায়কবাড়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহারা এই কর্ম্ম করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিলেন, "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গীত ন্যাশনেল আ্যানথমের অনুবাদ নহে। উহা দিল্লীর দরবার উপলক্ষে রচিত হইয়াছে, অতএব সে স্থলে দণ্ডায়মান হইবার প্রথা রক্ষা না করা দূষ্য হইতে পারে না। গুজরাতিরাও কহিলেন, "রাণী জীনো ছন্দ" গাইবার কালে শ্রোতৃবর্গকে দাঁড়াইতে হয় না। এই বিতণ্ডা সমাধানের জন্য ভিক্টোরিয়া গীতিকা ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বোধ হওয়ায় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ হইল, তথাপি শঙ্কর পাণ্ডা রঙ্গ কর্ম্ম পাইলেন না।

কলিকাতার প্রথানুসারে আমরা পার্শ্বের বাটীর লোকের সহিত আলাপ করিতাম না, এবং তাঁহাদের সংবাদ রাখিতাম না। ধারণা ছিল, এ নগরে বুঝি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। একদিন পথিমধ্যে একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আলাপ হয় নাই কি করিয়া সম্ভাষণা করিব, এ বিলাতী ভাব, প্রবাসে মনে উদয় হইতে পারে না; অথবা পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেবল মাত্র দন্ত বিকাশ করিয়া সম্ভাষণ করিলে চলে না। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেইল পথ প্রস্তুত উপলক্ষে দশ বার জন বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এদেশের বৈচিত্র্য কি? তিনি স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান প্রণালীর কথা বলিলেন। কাশীতে অনেক দক্ষিণী আছেন। সুতরাং আমার চক্ষে এ দৃশ্য অভ্যস্ত হইয়াছে। সেরিং সাহেব কাশীকে Type of India কহিয়াছেন।

অনাবৃত মুখে সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত হওয়াকে যদি স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে, তাহা দক্ষিণাপথে আছে। এতদ্ভিন্ন আর কিছুতে নাই। স্ত্রীলোক সকল বিষয়ে পরাধীন, বাস্তবিক প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা কোনও দেশে হইতে পারে না। দুর্ব্বল বলবানের অধীন হইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ যখন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, তখন একেবারে সকল বিষয়ে অন্যের অধীন হইতে পারে না। বাঙ্গালীর গৃহে কি স্ত্রী স্ব—অধীন নহে? সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত গৃহস্থকে স্বামিনীর অনু-

রোধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাল্যবিবাহ যে রহিত হইতেছে না, তাহার মূল স্ত্রীলোকের অমত। মহারাষ্ট্রে সধবার চিহ্ন "কুঙ্কু" ও "বাঙ্গড়ি"। অবশ্য কুমারীতেও তাহা ব্যবহার করে। বিধবা দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পায় না। ভোজে যায় না। বরযাত্রী প্রভৃতির দলে যাইতে পারিবে না। কুঙ্কু অর্থাৎ টিপ না পরিয়া সধবার পক্ষে মুখ দেখান নিষিদ্ধ। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই করণ্ডি হইতে উপকরণ বাহির করিয়া তিলক করা আবশ্যক। বিলাসিনী রমণী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ পরে। কিন্তু অন্যে আধুলি পরিমাণের পর্য্যন্ত পরিয়া থাকে। সন্তান হইলে ৪০ দিন অশৌচান্তে নূতন চুড়ী পরা আবশ্যক। তাহাকে বাল্যন্ত চুড়া কহে। চাউল পান শুপারি একটা নারিকেল এবং কয়েকটা পয়সা দিয়া সিধা সাজাইয়া চুড়ী বিক্রেতার সম্মুখে রাখিয়া হাত যোড় করতঃ নারী অভিবাদন করে। বাঙ্গড়ি-বিক্রেতা বলে, জন্ম এয়োতি হইয়া থাক। অন্য সময় প্রকৃত মূল্য দিয়া চুড়ী পরিবার কালেও অভিবাদন করিতে হয়। হাতের চুড়ী যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে, এ কথা বলিতে নাই। কারণ চুড়ি যে এয়োতি। স্বামীর জন্য যদি কাহারও নিকট অনুরোধ করিতে হয়; তবে কহে, আমার হাতের চুড়ী রক্ষা কর। স্বামী মরিলে শব বাটী হইতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গড়ি ভাঙ্গিয়া মাথার চুল মুড়াইয়া একত্র করিয়া "চোলিতে" বাঁধিয়া দেয়। কুঙ্কু মুছিয়া এক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। অন্যের সে মুখ নিরীক্ষণ করা দূষ্য। বাটীতে অপর কোন বিধবা থাকিলে সেই ঘরে খাবার দিয়া আসে, নতুবা পুরুষে দেয়। সধবা বা কুমারী সেই ঘরে যায় না।

গণেশ বাসুদেব জোশী প্রভৃতি যে লওয়াদ অর্থাৎ সালিসী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। যে সময়ে বাঙ্গালায় পাবনার প্রজা বিদ্রোহ ঘটে, তাহার কিছু পূর্ব্বে এ দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে রায়তেরা উপদ্রব করিয়াছিল। হাটের দিন মাড়ওয়ারি ও মহারাষ্ট্রীয় বণিকের দোকান লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। খাতা পত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্র করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে বৃটিশরাজ দক্ষিণী কৃষকের কষ্ট-নিবারিণী বিধি প্রচার করিলেন। এই আইন অনুসারে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে মধ্যস্থের নিকট যাইতে হয়। তিনি

আপসে না মিটাইতে পারিলে বিচারালয়ে যাইবার অনুমতি দেন, তাহার পর আদালতে আবেদন গ্রহণ হইতে পারে। সুদের সুদ কিম্বা অতিরিক্ত হারে সুদ চুক্তিসম্মত হইলেও গ্রাহ্য নহে। রায়তের ভূমি সম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে দেনায় তাহা বিক্রয় হইবে না। দেনার ডিক্রীজারীজনিত কারাবাস নিষিদ্ধ। অন্যূন পঞ্চাশ টাকার ঋণ পীড়িত কৃষিজীবী ইন্‌সলভেন্সি লইতে পারে। মহাজন সম্বন্ধে যেরূপ প্রজার কল্যাণকর বিধান হইল, গভর্ণমেণ্ট আপন রাজস্ব আদায় ব্যাপারে তদ্রূপ উদার আইন করিতে পারেন না।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত অস্থায়ী। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী। সুখের জন্য মনুষ্য শ্রম স্বীকার করে। ইহাতে যে সুবিধা ঘটে, তাহাতে সে ব্যক্তির স্বত্ব জন্মান উচিত। সে সুবিধা টুকু যদি বলপূর্ব্বক অন্যে অধিকার করিতে চায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আবার অপরের দ্বারা অন্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কেহ সুখী হইতে পারে না। এজন্য অন্যের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা মনুষ্য সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতাবতা ভূমির উপর প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। ভূমির উৎকর্ষ হইলে যদি খাজনা বৃদ্ধি হয়, তবে প্রজার স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল না। প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া সেই কার্য্যের বেতন স্বরূপ রাজা কর পাইতে পারেন। তাই বলিয়া রাজা ভূম্যধিকারী নহেন। যে ভূমি আবাদ করিয়াছে, সে-ই ভূমির অধিকারী। অদ্যাপি তাতার জাতি যে ভূমিখণ্ড দখল করিয়া কৃষিকার্য্য করে, তাহার শস্য গৃহীত হইলেই অন্য লোক সে ভূমি ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তাহারা এক স্থানে স্থায়ী হয় না বলিয়া স্বামিত্ব হারায়। ভূমি অধিকারের মূলে বল প্রয়োগ না হইয়া শ্রমশীলতা দেখা যায়, পরিশ্রম করিলে স্বাভাবিক স্বত্ব জন্মে। সাঁওতাল পরগণায় কমিশনর সাহেবের নিকট কতকগুলি সাঁওতাল একখানি থালে একটু মৃত্তিকা ধান্য ও টাকা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা খাটিয়া ভূমিতে শস্য উৎপাদন করি, তবে সে জন্য আপনার টাকা লন কেন ?

ভারতের অপর স্থানের ন্যায় পুরাকালে মহারাষ্ট্র রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্পর্কশূন্য ছিল। মহারাষ্ট্র ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ কহেন, সম্ভবতঃ গোদাবরীর তীরে আধুনিক ভীর নগরের সমীপে টগর নামক রাজ-

ধানীতে রাজপুত ভূপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পর কুহমার বা কুনবী জাতীয় শালিবাহন সেই রাজাকে বধ করিয়া গোদাবরী তীরস্থ বর্ত্তমান মুঙ্গী পাটন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর দেবগিরী অর্থাৎ দৌলতাবাদের দেবগড়ে মহারাষ্ট্র রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমান দেখা যায়, তখন দেবগিরিতে যাদব রাম দেবরাও রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংরাজের মত মুসলমাণী রাজ-প্রণালী সর্ব্বসংহারক ছিল না। দেশীয় লোকে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত, কেবল মুসলমান সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রাম্য কর্ম্মচারীর মধ্যে মহার বা ধেড় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; সে পথ-প্রদর্শক, চৌকিদার ও চরের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভ্রমণকারীর অশ্বের জবস আনয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। যদি অন্য উপায় না থাকে, ভ্রমণকারীর দ্রব্যজাত তাহাকে বহন করিয়া আপন সীমার বাহিরে দিয়া আসিতে হইত। গ্রামাধিকারীর অপর নাম মকদম, পটেল বা দেশমুখ। কৃষি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, চৌকিদার নিয়োগ ও বিবাদভঞ্জন প্রভৃতি কার্য্য ইহার দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। যে বিরোধ পটেল দ্বারা না মিটিত, তাহা তিনি পঞ্চায়তের হস্তে মীমাংসা করিতে দিতেন। ফৌজদারি ব্যাপার উপরিতন কর্ম্মচারীকে দিতে হইত। গ্রামলেখকের অপর নাম কানুন গো, দেশ পণ্ডা বা কুলকরণী। পটেল, কুলকরণী ও চৌগুলাতে গ্রামের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ভূমির নিষ্কর ভোগ করিতে পাইত। বার্ষিক হিসাব রাখাই কুলকরণীর কাজ। তাহার পুস্তিকায় ভূমি সম্বন্ধীয় তাবৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। গ্রামাধিকারী ও গ্রামলেখক কর্ম্মচারীর উপর কোনও সময়ে দেশাধিকারী ও দেশলেখক কর্ম্মচারীর পদ ছিল। উক্ত সকল পদই পুরুষানুক্রমে চলিত। গ্রামাধিকারীর ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া দেশাধিকারী রূপে পরিণত হইতে পারিত। অধিরাজের ক্ষমতা দুর্ব্বল হইলে সেই দেশাধিকারী স্বামী হইয়া রাজা হইয়া পড়িতেন।

মুসলমান সাম্রাজ্য এমন হীন হইয়া গিয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দিতে সেই অধীন মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্ব্বত্য ভূমি হইতে যখন বহির্গত হইয়া মস্তক উন্নত করিতে লাগিল, তখন লোকে তাহাদিগকে এক অপরিচিত নূতন জাতি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিউনেরী দুর্গে শিবাজী ভোঁসলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি আপন নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। অল্প বয়সেই অস্ত্র শস্ত্র চালনায় নিপুণতা লাভ করেন। ধনুর্ব্বিদ্যা বিলক্ষণ শিখেন। কুরুপাণ্ডব ও রাম রাবণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় উত্তেজিত হইতেন। কেহ বলে, সেই উত্তেজনায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে এক দস্যু দলে মিলিত হন। বিজাপুরের নিজামশাহি রাজ্যে তাঁহার পিতা চাকরি করিতেন। শিবজী নানা প্রতারণা ও অপকর্ম্ম করিয়া রাজ্য উপার্জ্জন করেন। সকল রাজ্যেরই মূলে ছলনা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি আছে। রাজ্য সুশাসন জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রজা আপন ক্ষমতা রাজাকে দিয়াছে ও রাজা প্রকৃতিবর্গের সেবক স্বরূপ আপনাকে জ্ঞান করেন, এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজা একটি নরহত্যা করিলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়, কিন্তু রাজা সহস্র মানবকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করিলেও অপরাধী নহেন। তাহার কারণ উক্ত যুদ্ধ দেশের হিত সাধন জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কথিত হয়। এই সকল কারণে শিবজী নিন্দনীয় না হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তিনি আপনাকে রাজপুতবংশীয় বলিয়া নির্ণয় করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি মরঠ। তাঁহার চিত্র দেখিলে বন্যরাজা বা দস্যুপতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শিবজীর গূঢ়চর হাইরাজী ভবানী দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, এমন বাক্য প্রচার জন্য নানা কাহিনী গ্রন্থন করিতেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে ছত্রপতি শিবজী যবন মর্দ্দন ব্রত সমাপ্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোকনে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া চিতাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। স্বদেশবৎসল শিক্ষিত নব্য মরট্টা অধুনা উক্ত মহাত্মার দেহাবশেষ পুনায় স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির দেহ সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া ফরাসি ভূমিতে নীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা নির্ব্বাসনে ছিল বলিয়াই আনীত হইয়াছিল। ছত্রপতি শিবজী রায়গড়ে বাস করিতেন এবং তাঁহার মহৎ কার্য্য কলাপ ঐ স্থান হইতে অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং সে মহাপুরুষের স্মৃতি চিহ্ন ঐ স্থানে থাকাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইল। রায়গড় বিজন স্থানে অবস্থিত থাকায় পুনায় আনয়নের প্রস্তাব হইয়াছিল। শিবজী অতিশয় দক্ষ ও অনলস পুরুষ ছিলেন। সেই সকল গুণে উত্তরাধিকারীরা কেহই তাঁহার

তুল্য হন নাই। সাম্বজী ওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাহাতে বিদ্রূপ করায় নরাধম শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা করিল। শাহুর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রি-সমাজে এই কয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিনিধি—পরশুরাম ত্র্যম্বক। অষ্ট প্রধান মুখ্য প্রধান—বালাজী বিশ্বনাথ; (অন্য উপাধি পেশয়া)। অমাত্য অম্বারাও বাপুরাও হনবন্তি সচিব নারুশঙ্কর। মন্ত্রী—নারু রাম শেনবী। সেনাপতি—মামসিং মেরে। সুমন্ত—আনন্দ রাও। ন্যায়াধীশ—হোনজী অনন্ত। পণ্ডিত রাও মুদ্গলভট্ট উপাধ্যায়। রাজ প্রতিনিধির বল খর্ব্ব করিয়া মুখ্যপ্রধান অর্থাৎ পেশয়া ক্রমশঃ রাজ্যের বিধাতা হইয়া উঠিলেন। রাজা জগদীশ্বরের ন্যায় সাক্ষী স্বরূপ রহিলেন। তাহার পর যাহা হইবার কথা, তাহাই হইল। পেশয়া রাজ্যের স্বামী হইলেন। হোলকর সিন্ধিয়া তাঁহার পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিল। জন্ম গুণে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় কিছু গৌরব নাই। ক্ষমতা না থাকিলে বা ঘটনা চক্র (যাহাকে অদৃষ্ট কহে) অনুকূল না হইলে সে বিভব রক্ষা হয় না। মহারাষ্ট্র রাজ্যে শিবজী ভোঁসলে ও বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিল না। বাজীরাও পেশয়া হোলাকরকে শাসন করণার্থ বৃটিশ রাজ্যের সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। অবশেষে সেই মহাবলে ক্ষুদ্র বল লীন হইয়া গেল। হায়! মহারাষ্ট্র রাজ্য কয় দিন থাকিল! ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক শিবাজী রাজোপাধি গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও হইতে ইংরাজ সে রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। ১৫৪ বৎসর মাত্র সময়। কেহ কেহ কহেন, ভারতে বৃটনবাসী প্রবেশ না করিলে, মুসলমানের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাট হইতে পারিতেন। দিল্লী হইতে বহু অন্তর হওয়ায় দক্ষিণাপথে মুসলমান পরাক্রম দৃঢ় হইতে পারে না। এই সুযোগে শিবজী দেশীয় ছিন্ন ভিন্ন দল একত্রিত করিতে সমর্থ হওয়ায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। তাঁহা হইতে কিছু বা বালাজী বিশ্বনাথের দ্বারা উক্ত রাজ্যের সমুন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন রাজনীতি অনুসারে তাবৎ সেনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূপতি প্রতিপালন করিতেন না; কর্ম্মচারীদিগকে নিরূপিত সংখ্যক বল পোষণের জন্য ভূসম্পত্তির অধিকার দিয়া রাখিতেন। রাজা ক্ষীণ হইলে উক্ত সেনাপতিরা স্বয়ং সেই প্রদেশাধিকারী হইতে পারিতেন। মহারাষ্ট্র

রাজ্যের এই একটি কারণ। যে কারণে উক্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই কারণেই অবনতি হইল। নেতার ক্ষমতা বিসদৃশ হওয়ায় বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইল। শেষ পেশয়া এমন ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন যে, ভদ্রলোকে তাঁহার বাটীতে স্ত্রী পাঠাইতে সাহস করিতেন না।

মহারাষ্ট্রীয়দের বখর নামক জাতীয় ইতিহাসে "সিংঘ" গড় পুনরধিকারের শৌর্য্য বৃত্তান্ত অতি শ্লাঘার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। হণ্ট উইক্ কৃত বোম্বাই প্রদেশের বিবরণ পুস্তকে সিংহগড় পুনার সন্নিহিত জানিয়া, উক্ত স্থানে অবশ্য যাওয়া উচিত, স্থির করিলাম। সহ্যাদ্রি ও তাহার সমুদয় প্রত্যন্ত শৈলের ভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু অত্যন্ত দুরারোহ। এদেশে তাহার উপর অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। এটী তাহার অন্যতর। পুনা, সিংহগড় হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত। ৪ ক্রোশ যাইয়া খড়কবাসলা জলাশয় দেখিতে পাওয়া গেল। পুনার নালোত্থিত জল এই স্থান হইতে যায়। একটী স্রোতস্বতীর মুখে পর্ব্বতাকার বাঁধ দিয়া হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাঁধটি অর্দ্ধক্রোশ হইবে। উহার গাত্রে অপূর্ব্ব কৌশল-সম্পন্ন বারি মধ্যস্থ ছিদ্র পরম্পরা দ্বারা জল বাহির হইতেছে, যেন পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া উৎসগুলি হইতে স্রোত নির্গত হইয়াছে। কেবল খড়ক বাসলার স্থাপত্য কৌশল দেখিবার জন্য একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এদেশে আসিয়াছিলেন। সিংহগড়ের পাদদেশে যাইয়া শকট ত্যাগ করতঃ চেয়রবাহিদের সাহায্যে শৈলে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪১৬২ ফিট্। কিন্তু এখানে ভূমির উচ্চতা স্বভাবতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮২৫ ফিট্ হইবে, সুতরাং ২৩৩৭ ফিট্ ক্রোশ উর্দ্ধে যাইতে হইবে। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইবার জন্য এখনও দুর্গের প্রাচীর রহিয়াছে। দুইটী তোরণের মধ্য দিয়া যাইয়া অবতরণ করা হইল। শিবাজীর সিংহগড়ে এক্ষণে ইংরাজের গ্রীষ্ম অপনোদন জন্য কয়েকখানি বাঙ্গলা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আমরা আহারীয় সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলাম, প্রথমতঃ তাহার সৎকার্য্য করিবার জন্য এখানে "জীতাপানি" পাওয়া যায় কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘাটিয়া একটি কুণ্ডের নিকট লইয়া গেল। তাহার জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ। সেই "ঘাট মাথায়" প্রস্রবন জলে মৎস্য কর কর করিতেছে। দুই একটী প্রাচীন মন্দির দেখিলাম, তাহাতে বিগ্রহ নাই। রামরাজার (শিবজীর পৌত্র) মন্দির ভাল অবস্থায় আছে। ছত্রপতির

পাদুকা (খড়ম) শিবলিঙ্গের নিকট রক্ষিত হইয়াছে। গ্রাণ্ট ডফ বখর পুস্তক হইতে এই স্থানের সংগ্রাম বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;—"মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে (১৬৭০ খ্রী) রজনী সমাগত হইলে রায়গড় হইতে এক দল মাওলী সৈন্য লইয়া তন্নাজী মালুশ্রে সিংহগড় লক্ষ্য করিয়া অভিযান করিলেন। সেনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কিছু দূরে একদল রাখিয়া অপরগুলি পর্ব্বতের পাদমূলে স্থাপন করিলেন। যে ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও দুর্গম, সে দিকে হঠাৎ প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া একজন যোদ্ধা সেই দিক্ দিয়া অদ্রি শিখরে আরোহণ করিয়া রজ্জু নির্ম্মিত অধিরোহিণী বাঁধিয়া দিল। তদবলম্বনে একে একে সকলে উঠিয়া রজ্জু নিম্নে নিক্ষেপ করিল। দুর্গ মধ্যে তিন শত লোক প্রবেশ করিতে না করিতে তত্রত্য রক্ষি রাজপুত সৈন্য সন্ধান পাইল। একজন ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইল, অমনি একটা শাণিত বাণ ধানুকীর হস্ত মুক্ত হইয়া নীরবে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। অস্ত্র-নিঃস্বন ও কোলাহল শুনিয়া তন্নাজী তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করা হইতে লাগিল। শীঘ্রই মশালের আলোকে উভয় পক্ষই প্রকাশিত হইলেন। মরিয়া হইয়া যুদ্ধ চলিল। মাওলিরা সম্পূর্ণ সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য সংখ্যায় অধিক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তন্নাজী মালুশ্রে হত হইলেন। তাহাতে যোদ্ধৃবর্গ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া রজ্জুময়ী অধিরোহণীর দিকে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে তন্নাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী সসৈন্য প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমাদের মধ্যে কে আপন পিতার শব মাহার কর্ত্তৃক গর্ত্তে নিহিত হওয়া দেখিতে পারে।" * "সকলকে কহ অবতরণের সোপান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহারা

* মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পতিত হইলে যদি সম্ভব হয়, তবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শব সঙ্গে লইয়া যায়। সেনাপতির মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নীচতার কায বলিয়া গণ্য। বাপ শব্দ ভারতীয় সৈন্য মধ্যে সম্মান ও উৎসাহ প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়। ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধ কালে "চলো মেরা বাপ" বলিয়া দেশীয় সিপাহিগণকে আহ্বান করেন। ইংরাজীতে **Come on my boys** বাক্য ব্যবহৃত হয়।

যে শিবজীর প্রকৃত মাওলী সৈন্য, তাহা প্রমাণিত করিবার অবসর উপস্থিত।" এই উৎসাহ বাক্য, তন্নাজীর শোক, নূতন সেনার আগমন ও সেনা-নায়কের উপস্থিতি এই কয়েকটা কারণে তাহারা এমন স্থিরসঙ্কল্প হইল যে, আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। তাহাদের "হর হর মহাদেব" রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে জয়লাভ হইল। দূরস্থ শিবাজীকে সে বার্ত্তা জানাইবার জন্য একখানি তৃণ-নির্ম্মিত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সঙ্কেত করা হইল। মাওলীদের হতাহতের সংখ্যা তিন শত। সূর্য্য উদয় হইলে দেখা গেল, পাঁচ শত রাজপুত তাহাদের অধ্যক্ষ উদয় নামা যোধের সহিত নিহত হইয়া বীর শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। কয়েকজন মাত্র ধৃত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। অনন্যোপায় শত শত লোক পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে যাইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল। শিবাজী কহিয়াছিলেন, আমার আর কি লাভ হইল, তন্নাজী মালুশ্রে মরিয়াছেন। সিংহ হত হইয়াছে, আমাকে কেবল তাহার গহ্বর অধিকার করিতে হইল।

জিজুরি জনপদ পুনা হইতে ১৪ চৌদ্দ ক্রোশ। যাতায়াতের ফিটন ভাড়া ১০৲ দশ টাকা। চালক প্রত্যূষে ছাড়িয়া ১১ টা রাত্রে বাটী আনিয়া দিবে কহিল। ডেক্যানি অশ্বের পরাক্রম অদ্ভুত। পথ দূর হইতে দেখিলে তাহার তরঙ্গায়িত আকার দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে পার্ব্বত্য সরিৎ পথের উপর দিয়া পথ করিয়াছে। সকল কথা বক্তব্য না হইলেও যাহাতে অতিশয় আরাম লাভ করা গিয়াছে, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সেই পাষাণময়ী ভূমির উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তটে প্রাতঃকৃত্য করিয়া মন বড় প্রীত হইল। মধ্যাহ্নকালে "পার্ব্বতীর" ন্যায় শৈলোপরি খণ্ডবার দেবালয় পরিদৃশ্যমান হইল। তীর্থস্থানে পাণ্ডার অভাব হয় না। আমরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সোপান শ্রেণী অধিরোহণ করিতে লাগিলাম। ভক্তগণ মানসিক পূর্ণ হওয়ায় দেব উদ্দেশে পর্ব্বতের নানা স্থানে সোপান, তোরণ ও দীপদান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। খণ্ডবা মহারাষ্ট্রীয়দের কুলস্বামী অর্থাৎ গ্রাম্যদেবতা। ইনি শিবের অবতার বিশেষ। খণ্ডেরাও ঠাকুরের মন্দির হোলকর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেবার নিয়ম রাজোচিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সোমবতী অমাবস্যায় সাসওয়াড় গ্রামের নিকট করানদীতটে মেলা হইয়া থাকে। খণ্ডবার সওয়ারি সে সময়

তথায় উপস্থিত হয়। মন্দিরের বাহিরে খণ্ডবার বহা অসি রক্ষিত আছে। তাহা কোষ নিষ্কাসিত করিয়া রক্ষি কহিল, ইহা দ্বারা মহাদেব দানব সংহার করিয়াছিলেন। আমি কহিলাম, অসুর বধের জন্য কি তাঁহাকে শস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়?

এই খড়্গের সহিত মুরলিগণের বিবাহ হইয়া থাকে। হরিদ্রা প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করা হয়। কুনাবি প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতির সন্তান না হইলে মানিয়া থাকে, আমার সন্তান হইলে প্রথমটি খণ্ডবাকে দান করিব। মনস্কামনা সিদ্ধি হইলে কন্যাটী আনিয়া মহাদেবের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া তাহার গলদেশে তাগা বাঁধিয়া বাটী লইয়া যায়। তাহার আর অপর পুরুষের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেবতার সেবার জন্য পিতা মাতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুত্র সন্তানও দেবতাকে দান করিয়া বিদায় করিয়া থাকে। ঐরূপ স্ত্রীর নাম মুরলী ও পুরুষের নাম বধা অথবা বাঘিয়া। জিজুরিতে অনুমান ১৫০ মরলী আছে। অনেকে ভিক্ষা করিবার জন্য স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। ব্যভিচার তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নৃত্যগীতের ব্যবসায়ও করে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এখন আর কেহ মুরলী ছাড়ে না। সংবাদদাতা কহিল, তাহার জ্ঞানে বার বৎসর হইল শেষ একজনকে মুরলী করিতে দেখিয়াছে। অপ্রত্যক্ষমূলক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে কত ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ কেহ কল্পনা-প্রধান, কেহ বা সন্দেহ-প্রধান। এজন্য অতি বিদ্বান লোকও কুসংস্কারাপন্ন হয়। প্রথম হইতে যাহা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত ভাবনা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সাসওয়াড় গ্রামের মধ্যদিয়া পথ, একারণ উক্ত গ্রাম দর্শন করণার্থ গাড়ী হইতে অবতরণ করা হইল। এদেশে দেখিতেছি, গ্রাম ও নগর একই ভাবে গঠিত। সহরে খোলার ঘর, গ্রামেও তাই। গ্রামে ভূমি সুলভ, কিন্তু বাটীগুলি সহরের মত একস্থানে সন্নিবেশিত। পথ সঙ্কীর্ণ। গৃহস্থের ফল মূলের বৃক্ষ নাই। সুতরাং গ্রাম শোভা রহিত। পেশয়াদের পারিবারিক বাটী এই গ্রামে। এখানে অবস্থান কালে পেশয়া পুরন্দরের দুর্গ উপহার পান। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার করায়ত্ত হন। অদ্যাপি তাঁহার সেই বাটী ধরাশায়ী হয় নাই। পুনায় পেশয়ার স্মৃতিচিহ্ন সমুদায় অগ্নিকর্ত্তৃক লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক,

আমি এখানে আলায় কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম। বাটীর প্রাচীর প্রস্তর গ্রথিত। লক্ষ্ণৌনগরে দেশীয়দের দৌরাত্ম্য-চিহ্ন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভগ্ন বাটী রক্ষা করা হইতেছে, দেখিয়া আসিয়াছি। আর এখানে পেশয়ার-প্রাসাদে ইংরাজের গুলি গোলার চিহ্ন দেখিলাম। সিংহদ্বারের কবাট তীক্ষ্ণশির কিলক জালে আচ্ছন্ন। প্রদর্শক কহিল, শত্রুপক্ষীয় হস্তীতে যেন ভগ্ন করিতে না পারে, এ কারণ এরূপ কীলক দেওয়া হইয়াছে। তখন বেলা নাই, তথাপি বাটীর মধ্যে যাইয়া উপরে উঠিলাম। সেই বাটীতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া সেই সঙ্গে পেশয়ার পরাক্রম অস্তমিত হওয়ার ভাব মনে উঠিল। তথায় জন মাত্র নাই, পেশয়ার কুলেও কেহ নাই। বাটী চারি মহল। দ্বিতল। মেরামত শূন্য। সময় হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া পড়িলেই হইল। মানুষের শক্তি কি ক্ষণভঙ্গুর! হে কাল, তুমিই বলবত্তর।

থলঘাট দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাতঃকালে পুনা হইতে রেল পথে যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কথিত স্থানে গাড়ী আসিল। বোরঘাটের ন্যায় থল-ঘাটে পর্ব্বতের উপর দিয়া লৌহ-পথ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোরঘাট শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান হইল। রাত্রি ১০ টার সময় নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে টাঙ্গাযোগে তিন ক্রোশ যাইয়া উপাধ্যায়ের বাটীতে বাসস্থান পরিকল্পিত হইল। এই নাসিক দক্ষিণবাসীদের কাশী। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রানুজ এই স্থানে স্থূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জনস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এখানে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে। এই থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চক্রতীর্থ হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র, নিজাম রাজ্য, সরকার প্রদেশ দিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৪৫০ ক্রোশ হইবে। বাটীর জল যেমন পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইয়া বাটী পরিষ্কার রাখে, পৃথিবীর জল নদী দিয়া বহিয়া সেইরূপ ধরা পবিত্র করে। উৎপত্তি স্থান নিকট বলিয়া এখানে গোদা-বরীর পরিসর ও গভীরতা অল্প। সে জন্য স্নান প্রভৃতির সুবিধা করণার্থ কুণ্ড ও প্রণালী নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। স্থান বিশেষ উচ্চ নীচ হওয়ায় জলের পতন সুন্দর দেখায়। নদীর উভয় পারে বসতি ও দেবমন্দির, সুতরাং জল ভাঙ্গিয়া কুণ্ডের আলবালের সাহায্যে পার হইতে হয়। নানা স্থানের রাজগণ দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের গঠন বহুবিধ। আমরা

অতি আগ্রহের সহিত পঞ্চবটি দর্শন করিতে গেলাম, সেখানকার বৃক্ষ অতি অকিঞ্চিৎকর। অতি অল্প দিনের পাঁচটী বটবৃক্ষ সমীপে এক খানি খোলার ঘরে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। রামচন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ অদ্যাপি এখানে তাহা দেখিতে পান। নাসি-কের গোদাবরী তীর অতি রমণীয়। নগরে দর্শনীয় কিছু নাই। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, কাশীর ন্যায় মনোরম নদী তীর জগতে আর নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, নাসিক সে বিষয়ে হীন নহে। এখানে আমার চক্ষে কোনও কোনও বিষয় কাশীর গঙ্গাতীর অপেক্ষা সুন্দর দেখাইল। এখানকার গঙ্গার প্রবাহ সংকীর্ণ, সেজন্য উভয় পারে ঘাট ও মন্দির রচিত হইয়া বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময়ী মরাঠী ব্রাহ্মণ-ললনা সতত গোদাবরী কূল আলো করিয়া রহিয়া-ছেন। গৃহদেবীগণকে স্নানের পর পূজাদি করিতে প্রায় দেখা যায় না। গৃহকর্ম্মেই ব্যস্ত থাকেন। দিবাভাগে যে কোন সময়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাও, দেখিবে, বাইরা বস্ত্র ধৌত করিতেছেন ও দূর হইতে সোপানের উপর বস্ত্র-তাড়নের পট পট শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নদীর তট এক স্থানে পর্ব্বতময়, সেই খানে পাহাড় কাটিয়া সোপান খোদিত হইয়াছে। চন্দ্রমা-শালিনী সন্ধ্যাকালে তদুপরি উপবেশন করিয়া দেবালয়ের রৌশনচৌকি শুনিতে শুনিতে এবং রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত রশ্মি নিরীক্ষণ করিয়া কাশীর অহল্যা বাইয়ের ঘাট মনে আসিল। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করেন। তজ্জন্য গোদাবরী তট দীপ-আলিতে মণ্ডিত হইয়াছে ও দেওয়ালির উপঢৌকন দারুকাম অর্থাৎ পটাকা রমণী হস্তে পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইয়া আনন্দলহরী তুলিতেছে। কপালে-শ্বর রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অদ্য রাত্রে শিঙ্গার বেশ হইয়াছে। বহু নরনারী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দিরে দুইটী অশ্ব সজ্জিত করিয়া সেবার জন্য বিগ্রহের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। নদী তীরে শিবলিঙ্গের উপর পিত্তলের শিবমূর্ত্তি বসাইয়া দিয়াছে। আতুর সন্ন্যাসী-দের সমাধিস্থান মার্জ্জিত করিয়া সন্তানগণ দীপ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়দিগের মধ্যে প্রথা আছে, প্রাচীন গৃহস্থ মোক্ষ লাভ করিবার জন্য

মৃত্যুকালে শঙ্করমার্গানুযায়ী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। সেই কারণে নাসিকে দুই চারি জন দণ্ডি থাকিলেও বহু সমাধি (গঙ্গাতীরে) দৃষ্ট হয়। কপুরথলার রাজার ইংলণ্ড যাইতে ইডন নগরে মৃত্যু হয়। তাঁহার শব গোদাবরী তীরে যে স্থানে দাহ করা হইয়াছে, তথায় একটী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্য স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ ইংরাজী প্রথানুযায়ী মন্দির রচিত হইয়াছে। এই স্থানে ফল মূল বিক্রয়ের হট্ট সমাবেশ হইয়া থাকে। পর পারে সাপ্তাহিক হট্ট হয়। নদী তীরে আসিলে, এ জনপদের সকল লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জন সংখ্যা ২২৪৩৬।

পাণ্ডুলেনা অবশ্য দর্শনীয়। প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব না। বোধিসত্বের কৃপায় চটি জুতা পায়ে থাকিলেও উঠিতে পারিলাম। আমি যত গুলি পর্ব্বত-খোদিত দেবালয় দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ। ইহাতে অনেক গুলি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ অভ্যন্তরে নানাবিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তি অধুনা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতা হইয়াছেন। একটি কন্দরের বাহিরে পালি অক্ষরে অতি বিস্তৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাহার অর্থ প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই লিখনে ভূমি প্রভৃতি দানের উল্লেখ আছে এবং যে অব্দ আছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ১১৮ হইতে ১২০ দৃষ্ট হয়। বিদেশীয় পণ্ডিত কহেন, অশোকের অনুশাসন লিপির পূর্ব্বে লিখন প্রথা দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত অক্ষর আর্মেনিয়ন বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। ভারতীয় সকল প্রকার অক্ষরই সেমেটিক বর্ণমালা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মে ইহুদি, দর্শন শাস্ত্রে গ্রীক, রাজনীতিতে রোমান ও নীতি শাস্ত্রে আক্সন্ জাতিকে উত্তমর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় পরদ্রব্যগ্রাহী ব্যক্তি যদি কহেন, আমাদিগের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত ও লিপিকার্য্য আর্মানিদের কাছে পাইয়াছি, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পাণ্ডুলেনার এক জন "ঘাটির" সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বোধ হয় প্রহরী, কিন্তু আমাদের কাছে পাওনার দাবি করিতে লাগিলেন। এ সকল মঠে আর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় একজন পীতবাসা ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলাম। তিনি নেপালি বৌদ্ধ, তাঁহার

নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, শাক্য বংশে স্বাতিধর্ম্ম-ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান পূজা করিতে আসেন। শেষগর্ভ নামক শাল-গ্রাম শিলার গাত্রে চন্দনের সহিত কুঙ্কুম কর্পুর প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করেন। তদনন্তর পঞ্জিকা উদ্‌ঘাটন করতঃ তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করা হইলে গন্ধপুষ্প অক্ষত সহকারে পূজা হইয়া থাকে। এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণের বর্ত্তি দ্বারা আরতি শেষ করিয়া "দেব লোকং গচ্ছ" প্রভৃতি কথিত হয়। ইত্যাকার অর্চ্চনাকে ভিক্ষু মহাশয় রত্নমণ্ডল সমাধি কহেন। শালগ্রামের গাত্রে বুদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জ্ঞান হইল। শালগ্রাম শিলা এক প্রকার ত্বগাধার দেহ (Mollusca), শিরঃপদী (Cephalo poda), বর্গের বহু কোষ্ঠী (ammon-iteda) জীবের দেহাবশেষ মাত্র। গঙ্গাপুরা নামক স্থানে গোদাবরীর একটি জল প্রপাত দেখিতে যাত্রা করা হইল। পাহাড়ের উপর হইতে অনেক নীচে, সুতরাং প্রবলবেগে জলরাশি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া মহাশব্দে পতিত হইয়া ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, সেই জন্য এই প্রপাতের নাম দুধস্থলি হইয়াছে। মন যদি নিতান্ত নীরসও হয়, তথাপি জলের এই উচ্ছ্বাসের সহিত হৃদয়কে উথলিয়া উঠিতে হইবে। বারিধারা ক্ষুব্ধ হইয়া যে স্থানে পতিত হইয়া নয়ন ভুলাইতেছে, সেখানে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে শিলাতলে উপবেশন করতঃ ছবি-খানি হৃদয়ে আঁকিতে চেষ্টা করিলাম। একজন জালিক জলের পতন-মুখে মৎস্য ধরিতে লাগিল।

ত্র্যম্বক ক্ষেত্র নাসিক হইতে ১০ ক্রোশ। এতদ্দেশীয় লোকের ভ্রম আছে যে, গোদাবরী শৈল-দুর্গোপরি উড়ুম্বরী মূলে উৎপন্না হইয়াছেন এবং সেই জন্য উক্ত স্থানের নাম গঙ্গা দ্বার ও তন্নিম্নে সেই অনুযায়ী কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান তীর্থজীবিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক গৌতমী গঙ্গা এখানে উদ্ভূতা হন নাই। এখান হইতে যে ধারা বহির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা নালার কঙ্কর সিক্ত হইতেছে না। স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এখানে গঙ্গা গুপ্তা হইয়া যাইতেছেন। আমরা যখন ত্রি-অম্বকে পৌঁছিলাম, তখনও কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসব শেষ হয় নাই। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ এবং পট্ট বস্ত্র পরিহিত না হইলে ব্রাহ্মণগণও দেব

সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্র্যম্বকেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া, প্রকৃত প্রস্রবণের উপর শয়ান শেষশায়ী প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ যুক্ত চৌদিকে মণ্ডপ বিশিষ্ট উৎসজল পূর্ণ কুশাবর্ত্ত নামক মনোহর কুণ্ডসমীপে মহামরী দেবীর বলি প্রেরণ দেখিতে উপস্থিত রহিলাম। এ গ্রামে তিন সহস্র লোকের বাস। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া অন্নপাক করা হইয়াছে। একখানি গরুর গাড়ীতে ভাত বোঝাই দিয়া তাহার উপর রক্তবর্ণ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও প্রজ্জ্বলিত মশাল প্রোথিত করিয়া দিলে অগ্নিহোত্রী ও দেশমুখ সেই স্থানেই দেবীকে বলি [ভাতের গাড়ী] নিবেদন করিয়া দিলেন। যুগন্ধরের উপর একটী নারিকেল ভগ্ন করিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত শকট পরিচালন করা হইল। বলি গ্রামের বাহির দিয়া আসিলে, তবে জানপদগণ অন্ন ভোজন করিতে পাইবেন। পাণ্ডা গণপতি শঙ্কর শুক্ল মহাশয়ের বাটীতেই আমাদের আহার করা স্থির হইল। আমার সহচর বিদেশীয়ের অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া, "মুরমুরে" [মুড়ী] ও পেঁড়া খাইলেন। উপাধ্যায় পত্নীরা পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ একটী বধূ পাতের উপর দুই তিন প্রকার চাটনি দিয়া গেলেন। অন্য জনে প্রত্যেক পাত্রে একটি করিয়া দোনা রাখিয়া দিলেন। তৃতীয় যাতা অন্ন আনিলেন। ভাত অতি অল্প পরিমাণে দিতে দেখিয়া ভাবিলাম, এ দেশের লোকের আহার কি এত কম? আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে ডাবু বলে, সেই হাতায় করিয়া চাপিয়া এক হাতা ভাত পাতের উপর উল্টাইয়া ঢালায় মাথাটী গোল হইয়া রহিল; যে দোনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তরল ঘৃত প্রদত্ত হইলে এবং অধিকাংশ ব্যঞ্জন দিলে পর ভোজন আরম্ভ হইল; যে উপকরণটি ওদনের সহিত মুখে দেওয়া যায়, হয় কটু নতুবা অম্ল। এত ঝাল যে, কিছুতেই আমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিবেশন-কারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুপ" চাই। আমি বুঝিতে না পারায়, কি বস্তু প্রশ্ন করায়, তিনি কহিলেন, ঘৃত। ভোজনের প্রথম অবস্থায় ঘৃত আবশ্যক হয় জানি, সুতরাং কহিলাম, না। তাহার পর "পোলি" দিয়া গেল। সিদ্ধ বুটের ডাল শর্করা যোগে দলিয়া যে রুটিতে পুর দেওয়া হয়, তাহার নাম "পুরন্-চ্যা পোলি"। উষ্ণ ঘৃতে নিমজ্জিত করিয়া তাহা খাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঘৃত আনিলে আমি ঘি চাহিয়া লইলাম

এবং পোলি দ্বারা উদর পূরণ করিলাম। যে পোলি পরিবেশন হইতেছিল, তাহাও উক্ত। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রুটি মহারাষ্ট্রীয়দের প্রধান খাদ্য; এই জন্য ভাত অল্প করিয়া প্রথমে দিতে হয়। একটি বৌ ক্লান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইজি তুমি আহার করিতে কেন বস নাই। তিনি কেবল না কহিলেন। পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক আহার করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, ইনি দেবরাণী, অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, কে উঁহাকে অগ্রে দিবে? পুনায় একদিন মরাঠী আহার করিয়াছি, তাহার উপকরণ ও চুক্র আমাদের পক্ষে অখাদ্য। সূপ ও শাক একত্রে—কচু শাক কুটিয়া দিয়া ডাল রন্ধন হইয়াছিল। তাহা এত ঝাল যে, দুই একবারের অধিক মুখে দেওয়া সম্ভব নহে। অকিঞ্চিৎকর কড়ী খাইয়া দেখিলাম। একটি চুক্রের অত্যন্ত গুণ শুনিলাম, তাহার নাম সার। পাচক কহিলেন, এদেশে সকলে ইহা পাক করিতে জানে না। ইহা কর্ণাটি দেশীয় সামগ্রী। ইহাতে আবার ঔষধের কাজ হয়; জ্বর হইলে সার উপকারী। এই অমূল্য বস্তু জিহ্বায় প্রদান করিয়া দেখিলাম, পক্ক তিন্তিড়ী গুলিয়া লঙ্কা সহযোগে ধনিয়া শাক বাসিত করা হইয়াছে। সে দিন অম্ল ও কটু রস বিহীন ডাল ভাতে পাইয়াছিলাম বলিয়া, কিছু গুদন উদরস্থ করিতে পারিলাম। স্বাদ গ্রহণের জন্য একখানি জওয়ারা ও একখানি গোধূমের রোটিকা দিয়াছিলেন। জওয়ারার রুটি দেখিতে মলিন, কিন্তু গোধূম অপেক্ষা মিষ্ট। রুটি ঘি মাখা নহে, কিন্তু দুধে ফেলায় মরাদের ঘৃত ভাসিতে লাগিল। বাজরীর রুটি তৃতীয় স্থানীয়, কৃষাণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকে তাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে। চৌধরি নামক এদেশের এক তরকারি আমরা পুনা ও বোম্বাইতে রাঁধিয়া খাইয়াছি। শিখরেণ বড় প্রসিদ্ধ খাদ্য, দধি জলহীন করিয়া সর্করা এলাফল এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। আমরা বাজারে ক্রীত যে শিখরেণ খাইয়াছি, তাহা বিশেষ সুখাদ্য নহে। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে অনেক হিন্দুর চা ও কাফি-পানিয়ের দোকান আছে। ত্র্যম্বকে গঙ্গাদ্বারের ৩২টী সোপান উঠিয়া "ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মখ্যাতা চে মালক" রঘুনাথ বাপু শাস্ত্রী কবীশ্বর "ধর্ম্মপেটী" লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক প্রস্তুত চা পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বিদায় কালে কহিলেন, আমার বাটীতে পান গুপারি লইতে যাইও।

দেবগিরি।

অপরাহ্নে আমরা নান্দগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মেল কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যালয়ে অবস্থিতি করিলাম। তিনি পারসী। আমরা জলযোগের উদ্যোগ করিলে অংশুমৎফল উপহার পাইলাম। ঔরঙ্গাবাদ এখান হইতে ২৮ ক্রোশ। এক-খানি ডাকের টাঙ্গায় যাতায়াতের ভাড়া ৫০৲ টাকা। আমরা রাত্রি ৮টার সময় "টপাঙ্গে" উঠিলাম। শকটচালক স্থানে স্থানে অশ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল ও বিউগল ধ্বনিত করিয়া "ভূমনি" পরিচালকের ত্রাস উৎপাদন করতঃ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া চলিল। পর্ব্বত-সন্নিহিত স্থানে শীতের জন্য কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মুখাবরণ মুক্ত করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করতঃ দুই এক বার দেখিলাম, ধরা জ্যোৎস্নাময়ী, 'ফুটিতেছে চন্দ্র ঘনদলে দলি'। ৫ ক্রোশ পরে কাসরি গ্রাম অতিক্রম করিয়া নিজাম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। উভয় রাজ্যের সীমা গোলাকার প্রস্তরের স্তূপ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। বেল ৯ টার সময় ঔরঙ্গাবাদের পরপারে গণ্ডানালা তীরে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বৃটিশ সেনানিবাসে বালাজীর মন্দিরে অবস্থান হইল। ইংরাজ মিত্ররাজ্য রক্ষার জন্য একটু স্থান অধিকার করিয়া, তাঁরে আপন অনুচর স্থাপন করেন। সে স্থান দেশীয় রাজার হইলেও শাসন কার্য ইংরাজের হস্তে থাকে। বিবি মকবরা অর্থাৎ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তনয়া রবিয়া দুরাণীর গোরস্থান ও পনচক্কি দর্শন করিয়া, ঔরঙ্গাবাদে তালুকদার দোয়েম মহাশয়ের নিকট দৌলতাবাদের দুর্গ প্রবেশার্থ অনুমতি পত্র গ্রহণ করিলাম। রজনীর শেষযামে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অনুসরণ করিয়া যাত্রা করা হইল।

কিছু বেলা হইলে প্রাচীর বেষ্টিত দৌলতাবাদের বিধ্বস্ত পুরীমধ্যে প্রবেশ করা গেল। এই না সেই স্থান, যেখানে মহম্মদ তোগলক শা (যিনি রৌপ্য মূল্যে তাম্রমুদ্রা চলিত করেন) দিল্লির অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক

উদ্ধার করিয়া আনয়ন করতঃ রাজধানী স্থাপন করিয়া দেবগড়ের দৌলতাবাদ নামকরণ করিয়াছিলেন? ঔরঙ্গাবাদ প্রদেশে আগমন করিয়া আমি এই অদ্ভুত দেখিতেছি, যেন মরাঠি ভূমিতে হিন্দুস্থানী জনপদ তুলিয়া আনা হইয়াছে। সর্ব্বত্র টুপি ও পায়জামা পরিহিত মুসলমান নয়ন গোচর হওয়ায়, বিশেষতঃ তাহারা হিন্দি ভাষা ব্যবহার করায়, ঐ ভাব মনে উঠিয়াছে। পূর্ব্বদিন ঔরঙ্গাবাদ যাইবার সময় ও অদ্য বহুদূর হইতে প্রাসাদশোভিত কর্ত্তিতবপু বৃত্তাকার উত্তুঙ্গ দেবগিরি দর্শন করিয়া কৌতূহলী হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। দুর্গের প্রথম ভিত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, ঔরঙ্গবাদের তালুকদার পরিদর্শনে আসিয়াছেন। অদ্য তিনি এখানে মোকাম করিয়া, দুর্গরক্ষী সেনাগণের শিক্ষা চালনা দেখিবেন। নিজাম-উল-মুল্কের সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র ইংরাজদিগের সিপাহির ন্যায়। প্রবেশ পথে কয়েকটি ক্ষুদ্র তোপ দেখিলাম। তালুকদার এক জন পারসী। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। দারোগা দুর্গ দেখাইবার জন্য এক জন অনুচর ও মশালচি সঙ্গে দিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া একটী জয়স্তম্ভ অর্থাৎ মিনার নয়ন গোচর হইল। প্রথম মুসলমান অধিকার কালে ঐ চিহ্ন স্থাপিত হয়। তাহার পর আর একটি প্রাকার। দ্বার রুদ্ধ, কাটা কপাটমধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। দ্বার রক্ষক সান্ত্রী কহিল,—"তোমাদের নিকট যদি বিলাতি দিয়াসলাই বা কোন প্রকার শস্ত্র থাকে, বাহিরে রাখিয়া যাও।" পথ ক্রমশঃ উচ্চ হওয়াতে এখন সোপান দ্বারা অবতরণ করিতে হইল। তৎপরে পরিখা। খাতের উপর সেতু আছে। প্রকৃত দেবগড় এখন আরম্ভ হইল। পর্ব্বতখানি একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। পিণ্ডাকার শিবের মত। অগ্রভাগ সঙ্কীর্ণ। মূল হইতে ১২০ ফিট ঊর্দ্ধে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর কর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণ সরল করা হইয়াছে। সেতু রক্ষার জন্য পরপারে অস্ত্র প্রক্ষেপার্থ ছিদ্র সমন্বিত গৃহ অতিক্রমণ করিয়া কয়েকটি সোপানযোগে উপরে উঠা হইল। তাহার পর গিরির অন্তরে প্রবেশ করিয়া উপরে যাইতে হইবে। দ্বারদেশে শিলায় খোদিত কার্য্য দেখিলেই, হিন্দু শিল্প বলিয়া চিনিতে পারা যায়। মশালের আলোক সাহায্যে সুড়ঙ্গ পথে দুই একটি গৃহ পার হইয়া উপরে উঠা গেল। এই পথ ক্ষুদ্র উপল-

কাটে পাষাণ খুদিয়া প্রস্তুত। এতদ্ভিন্ন কেল্লায় উঠিবার দ্বিতীয় পথ নাই। রিপু যদি এ পর্য্যন্ত তমসাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতিবিধানের জন্য সুড়ঙ্গ মুখে উপর হইতে লৌহ খর্পর রক্ষা করিয়া অগ্নি স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। উপরে সোপানের সংখ্যা এত অধিক যে, মধ্যে আমাকে বিশ্রাম করিতে হইল। দুর্গ নাম অন্বর্থ হইয়াছে বটে। ক্রমশঃ বারদ্বারিতে পৌছিলাম। ইহার মধ্য স্থলে প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে আলয়। দুর্গ মধ্যে এইটি কেবল আশ্রয় স্থান। অন্য সমতল ভূমি বিরল। এখানে জীবন ধারণ জন্য একটি উৎস আছে। আরও কিছু উঠিয়া গিরিরাজের শিখরদেশে সমুপস্থিত হইলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটি প্রাচীন শতঘ্নী পূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছে। একটির নাম কালাপাহাড়। দ্বিতীয়টির নাম মেড়া। তোপের যে দিকে ওর্ব্বাগ্নি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিপরীত ভাগে মেষের মুখ নির্ম্মিত আছে বলিয়া ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় শতঘ্নীটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে নিজামের ধ্বজতলে রক্ষিত। নাম, বালাহিশার; কিন্তু মহারাষ্ট্রী মুণ্ডা অক্ষরে শ্রীদুর্গা অভিহিত হইয়াছে। পারস্য লিপি তিন তোপেই আছে। শ্রীদুর্গা বা বালাহিশার হিন্দু ও যবন উভয় রাজ্য দেখিয়াছে। কত লোক ইহাকে আপন বলিয়াছে, ইনি বসিয়া রহস্য দেখিতেছেন। এত বড় তোপ এরূপ দুর্গম স্থানে আনয়ন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয়, পর্ব্বতের উপরেই ঢালাই হইয়া থাকিবে। বদ্ধ-দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে পারিয়া যে, আমরা গিরিদুর্গের এ সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা। আমি এইটি লইয়া তিনটি পার্ব্বত্য দুর্গ উপরে উঠিয়া ছিলাম,—তারাগড়, সিংহগড় ও দেবগড়। বলাবাহুল্য যে, দেবগড় সর্ব্ব প্রধান। দেবগিরির ন্যায় স্থান পরাজয় করিবার, পূর্ব্বকালের একমাত্র উপায়, দুর্গ অবরোধ করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের আগমন রহিত করা; তাহা হইলে অধিবাসীগণকে আত্ম সমর্পণ করিতে হইত। নতুবা তখন আক্রমণ করিয়া কেহ দুর্গ জয় করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে যখন কেবল ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি সাহায্যে যুদ্ধ হইত,তখন দুর্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অধুনা মাউন্টেন ব্যাটারি সৃষ্ট হইয়া দুর্গ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দিন খিলজি অষ্ট সহস্র সামন্ত সহ উপনীত হইলে, রাজা রামদেব রাও বহু নগরী রক্ষণে অপারগ হইয়া, এই দেবগিরিতে

আশ্রয় লইয়াছিলেন। নরপুঙ্গব হরপাল দেব প্রভৃতি যবন হস্ত হইতে এই দুর্গ উদ্ধার মানসে অবরোধ করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর জীবিত অবস্থায় হরপালের সম্পূর্ণ চর্ম্মোত্তোলন করিয়া বধ করেন। তাহার পর ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে, শাহজি বিজয়পুরের সুলতান মহম্মদ আদিল সার পক্ষ হইয়া এই দুর্গ আক্রমণ করেন।

রৌজা একটি বিনষ্ট নগর। ঔরঙ্গজেব পাদসাহের এই স্থানে সমাধি আছে। রৌজায় তাঁহার গুরুর কয়েকটি প্রস্তরময় শৃঙ্খল দেখিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা অখণ্ড প্রস্তরে কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে পর্ব্বতে ইলোরার গুহা খোদিত হইয়াছে, তাহার মস্তকমার্গে অবতরণ করিয়া বিরুল গ্রামে স্নান আহারের জন্য যাওয়া হইল। গ্রামের বাহিরেই স্থান প্রাপ্ত হইলাম। বিটপীযুক্ত বাপীতটে অহল্যা বাই নির্ম্মিত খণ্ডবাদেবের মন্দিরে আশ্রয় লইয়া ভৃত্যকে গ্রাম মধ্যে ভক্ষ্য আহরণে পাঠাইলাম। অগ্নিহোত্র নিরত গজানন শাস্ত্রী আসিয়া ঘুস্মেশ্বর দর্শন ও সেখানে রুদ্রী পাঠ করাইবার জন্য প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, নিজামের শাসন প্রণালী উদার। হিন্দুর দেব সেবার জন্য বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই গ্রামে ১৫৯৪ খ্রীষ্টীয় শকে সাহজী জন্ম গ্রহণ করেন। মন্দিরে বসিয়া শুনিলাম, একজন গুরু জলাশয়ের বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক্ তীর্থের নাম করিয়া যাত্রীদিগকে স্নান করাইতেছেন। ধন্য বিশ্বাস! সুপান্নদ্বারা উদরের পূজা করিয়া উঠিতে বেলা প্রায় দুইটা হইল। এক্ষণে চির প্রার্থিত ইলোরার গুহা দর্শন করিতে চলিলাম।

প্রকৃত দেবগিরি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যায়ত, কিন্তু উচ্চ নহে। মধ্যভাগ অপেক্ষা ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশঃ অবনত। বিস্তার অর্দ্ধক্রোশ। ভারতের আশ্চর্য্য স্থানের মধ্যে এ শৈল অবশ্য গণনীয়। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৩৪ টি বাটি পর্ব্বতের অঙ্গ খোদিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার কোন অংশও গ্রথিত নহে। প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ ও মেজিয়া সকলই একখণ্ড প্রস্তরে প্রস্তুত। প্রিন্স অব ওয়েলসের দেখিবার কথা ছিল বলিয়া, তদবধি সার সালারজঙ্গ এই স্থান পরিষ্কার করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ৩৪ টি দেবায়তনের মধ্যে ১২ টি

বৌদ্ধ ১৭ শৈব ও ৫ টি জৈন। বর্জেস্ সাহেব দর্শকবর্গের সুবিধার জন্য যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল গুহা কাহা কর্তৃক কোন সময়ে নির্ম্মিত, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এ বিষয়ে কেবল ইলু নামক রাজার উপাখ্যানই ইতিহাস। নির্ম্মাতারা অবশ্য ভাবিয়াছিলেন, আমাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া চিরদিন সংসারে খ্যাতি রাখিবে। খ্যাতি অবশ্য আছেই, কিন্তু কাহার, একথা বলিবার উপায় নাই। এক স্থানে ধর্ম্মের স্তর অনুসারে কেমন পূর্ব্বাপর ভাবে বৌদ্ধ, শৈব ও জৈন ভজনালয় গুলি রচিত হইয়া উঠিয়াছে। এক মতের পর কালসহকারে অন্য মত উদ্ভব হইল ; ইলোরার গিরি তাহার নিদর্শন রাখিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একস্থানে কার্য্য কিছু বিচিত্র। শাক্যমুনি ৬২৩ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, ৮০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ৫৪৩ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার ধর্ম্ম অবনত হইতে আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়া নবমে ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইল। তবে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে। চট্টগ্রামে বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছে। তাহাদের ধর্ম্মভাষা তুরানীয়া বা মগ। নেপালে ১৪০০ ঘর বৌদ্ধের বাস। তাহারা আর্য্যবংশীয়। বৌদ্ধভাব রক্ষা ও মূল ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু নেপালিরা তুরানীয় জাতি। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে কখনও সর্ব্বব্যাপী হয় নাই। যে সময় ঐ ধর্ম্ম উন্নত হইতে ছিল, তখন শৈব সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন।

মায়াদেবীসুতের এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়। সেই ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া, এমন স্থায়ী হইল যে, উহার প্রভাবে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং চির জীবন তাহা দ্বারা পরিচালিত হইলেন। উপদেশ প্রচার করিলেন ; সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও। অতি ভয়ানক উপদেশ। ইহাতে উন্নতি চেষ্টা একেবারে নিবৃত্তি পায়। মায়াবাদের মূল ঐ উপদেশের উপর জন্ম লাভ করিয়াছে। বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি অন্যান্য পূর্ব্ব-বিষয় যাহা হিন্দু যতির সেবনীয়, তাহা বুদ্ধ কর্তৃকই শিক্ষিত। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়া কহিয়াছেন, বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়, তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান

হয় না যে, অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। অতএব বীজাদিতে চৈতন্য ও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই। অর্থাৎ বলা হইল যে, জগতের কোনও চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মে অতিদৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, জীব নিজ কর্ম্মদ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে বুঝিয়া বুদ্ধ, তাহার মূল যে জন্ম, যাহাতে তাহা আর না হয়, তজ্জন্য নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য ধ্যান যোগ আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, নিভৃত স্থানে গিরিকন্দরে বৌদ্ধ ধনিকেরা যতিদিগের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা উপস্থিত স্থানের অতি চমৎকার নৈপুণ্য দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। যদি ঐ সঙ্কল্প ও অন্যবিধ সংস্কার না থাকিত, তাহা হইলে দিলয়াড়া ও দেবগিরির মন্দির কোথায় পাইতাম ?

আমাদের সহিত একজন প্রদর্শক সঙ্গ লইলেন। স্থানীয় লোকে প্রধান দেবালয় গুলির বিবিধ নাম রাখিয়াছে। আমরা ধেড়ওয়াড়া পরিত্যাগ করিয়া মহারয়াড়া, বিশ্বকর্ম্মা বা সুতার কা ঝোপড়া এবং দোথাল প্রভৃতি দর্শন করিয়া তিন থাল নামক বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করিলাম। এই গুহা তিন তলা। প্রথম তলার নাম পাতাল। দ্বিতীয় তলার নাম মর্ত্ত্য লোক এবং তৃতীয় তলার নাম স্বর্গ। এই জন্য নাম হইয়াছে তিন থাল অর্থাৎ তিন লোক। ইহার গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের দিগম্বর মূর্ত্তি ধ্যান মুদ্রা ধারণ করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট। প্রাচীরের সর্ব্বত্র পদ্মাসনোপবিষ্ট স্ত্রী মূর্ত্তি, তাহাদের মস্তকে বুদ্ধ দেবের অবয়ব খোদিত রহিয়াছে। বিরুল গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে রামচন্দ্র বলিয়া সিন্দুর দ্বারা তাঁহার হস্ত পদ ও গলদেশ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন। প্রবেশ-দ্বারে দুই প্রকাণ্ড দ্বারপাল স্থাপিত আছে। মর্ত্তলোক স্বর্গের তুল্য। গর্ভ স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রাচীরে স্ত্রী পুরুষ দ্বারা উপাসিত হস্ত্যাদি বাহন বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। প্রধান প্রতিমা স্বর্গলোকে স্থাপিত মূর্ত্তির তুল্য, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবী কহেন; পাতাল লোকে নিবিষ্ট তদ্রূপ বিগ্রহকে নাগরাজ কহে। মন্দিরে যাইয়া ছত্র বদ্ধ করিলে

অদ্ভুত শব্দ হয়। তৎপরে রাবণকা কর ও কর্ণ অবতার দেখিয়া কৈলাস রঙ্গ মহলে পৌঁছিলাম। দেবগিরিস্থ দেবালয় সকলের মধ্যে এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, বোম্বাইয়ের ঘারাপুরি বা নাসিকের পাণ্ডুলেনা আমি যে কয়টি পর্ব্বতখোদিত বিমান দেখিয়াছি, এখানকার মত এমন বিস্ময়জনক স্থাপত্য দ্বিতীয় দর্শন করি নাই। কৈলাস, শৈলতলে খোদিত হইয়া মস্তকের পাষাণ ভাগ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে। যেন শূন্য স্থানে, আনীত প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত মন্দির। একটি বৃহৎ চতুঃশাল ভবন মধ্যস্থলে, প্রাঙ্গন মধ্যে শিখর চূড়া-সম্বলিত অত্যুচ্চ মন্দির দিবাকর প্রভায় বিরাজ করিতেছে। উঠান ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ। ইহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব তোরণ, বাদ্যশালা ও মন্দির গৃহ আছে। উঠানের অপর তিন দিকে অতি সুরম্য স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত অলিন্দ। উহার প্রাচীরে অর্দ্ধ স্তম্ভ আকারে বহু ছড় থাকাতে তাহা অসংখ্য চতুষ্কোণাকার স্থানে বিভক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাদি মূর্ত্তি আছে। কোন স্থানে রাবণ আপন মুণ্ডচ্ছেদ করত মহাদেবের পূজা করিতেছেন। কোনও স্থানে পার্ব্বতীর শিবলিঙ্গ পূজা। কোথাও বা হরপার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাশ ক্রীড়া করিতেছেন, সম্মুখে নাগ ও নন্দী উপস্থিত। ঐরূপ অন্যত্র ক্ষীরোদশায়ী, বরাহ অবতার, নৃসিংহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালীয় দমন, বটুক ভৈরব, কপাল ভৈরব, নবযোগিনী ভৈরব ইত্যাদি বহুল মূর্ত্তি এবং রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস উত্তোলন প্রভৃতি। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা পৌরাণিক ব্যাপার খোদিত হইয়াছে। ইহাতে কি পর্য্যন্ত শ্রম ও ব্যয় হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে হইলে মন ভ্রান্ত হইয়া পড়ে! যে রাজার আজ্ঞায় এই অদ্বিতীয় কীর্ত্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহার সম্পত্তি অনুভব করিতে গেলে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। বাদ্যশালার সেতু অতিক্রম করিয়া (নিম্নদেশে) নন্দিগৃহের তলভাগে, যেখানে মন্দিরের উপর উঠিবার সোপান, সেই স্থানটি গাড়িবারান্দার ন্যায়। তাহার সম্মুখে অর্থাৎ প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে দিগ্ হস্তী কর্ত্তৃক আনীত জলপূর্ণ উত্তোলিত কুম্ভতলে, কমল বনে, নালনী-দলযুক্ত জলোপরি মহালক্ষ্মী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ভাস্কর্য্য বিদ্যার অতুল ক্ষমতায় জল পর্য্যন্ত পাষাণে খোদিত হইয়াছে। কমলদলে কয়েকটি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপশ্চাতে কৈলাস প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদ-

মন্দির পঞ্চকের মধ্যগত একশত হস্ত উচ্চ এক অপূর্ব্ব মন্দির, এবং চতুষ্কোণে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু তত্তুল্য সুচারু রচিত মন্দির চতুষ্টয়, হস্তী ও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে স্থাপিত। প্রধান মন্দির ৪৪ হস্ত দীর্ঘ ও ৩৭ হস্ত প্রশস্ত। গর্ভস্থানে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। দীপ জ্বলিতেছে। নিত্য পূজা হয়। পূজারি দীপের জন্য ঘৃত ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া আমাদের নিকট কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। গৌরী-পট্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কাশীস্থ প্রাচীন আকারের বটে। প্রাচীর ও ছাদের সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ছাদ ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাবিংশতি অর্দ্ধ স্তম্ভোপরি স্থাপিত। ছাদের মধ্যভাগে লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভবন দুই তলা। দ্বিতীয় তল ৬৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৬৫ হস্ত প্রশস্ত। গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ আছে। প্রাচীর নানাবিধ দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণ, তাহাতে দশাবতার আছেন। স্তম্ভগুলি এত উচ্চ, স্থূল ও সংখ্যায় অধিক যে সাদৃশ্য স্মরণ করিতে গিয়া কলিকাতার টাউন হল ভিন্ন আর কিছু মনে আসিল না। হিন্দু স্থাপত্যের এক দোষ আছে যে, তাহা আলোক হীন হয়, এই কথা ইংরাজ কহেন। এখানে সে কথা প্রযুক্ত হইবার নহে। দ্বারগুলি অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত এবং অসংখ্য। স্তম্ভ সকল অতি মনোহর। অগ্রভাগে চমৎকার কারু কার্য্য নিবেশিত হইয়াছে। অধুনা এই প্রকার প্রস্তরের স্তম্ভ কোন স্থানে রচিত হইতে দেখা যায় না। এক্ষণকার স্তম্ভের প্রণালী অন্যরূপ হইয়াছে। রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, তেলিকাগান, কুম্ভারবাড়া ও জনবাসা প্রভৃতি গুহা দর্শন করিয়া দুমার লেনায় প্রবেশ করিলাম। দুমারলেনা একটি প্রশস্ত দেবায়তন। ইহার মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ। ঘারপুরির সহিত তুলনীয়। ভিত্তিতে এক স্থানে হরপার্ব্বতীর বিবাহ অতি সুন্দর খোদিত হইয়াছে। পার্ব্বতীর পিতা মহাদেবের হস্তে কন্যার পাণি সংলগ্ন করিয়া দিতেছেন। পুরোহিত বাক্য পড়াইতেছেন। উমা শিবের দিকে চাহিতেছেন। মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া অবিবাহিতা উমাকে বাঙ্গালীর চক্ষে ডাগর বোধ হইল। তবে, পর্ব্বতের কন্যা, এই জন্য থাড়ম্ব গঠন। দিনমণি অস্ত যাইতেছেন, দেখিয়া আমরা ব্যস্ত হইলাম। ছোট কৈলাস, ইন্দ্রসভা ও জগন্নাথ সভা দেখা হইল না। ইহাতে পারশনাথ অধিষ্ঠিত।

"দুকূল বাসাঃ স বধূ সমীপং
নিন্যে বিনীতৈ রবরোধ রক্ষৈঃ।
বেলা সমীপং স্ফুট ফেন রাজি-
র্নবৈ রুদন্বানিব চন্দ্র পাদৈঃ॥
তয়া প্রবৃদ্ধানন চন্দ্র কান্ত্যা
প্রফুল্ল চক্ষুঃ কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্ন চেতঃ সলিলঃ শিবোহভূৎ
সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ॥
তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি
কিঞ্চিদ্ ব্যবস্থাপিত সংহৃতানি।
হ্রী যন্ত্রণাং তৎক্ষণ মন্বভূব-
রন্যোন্য লোলানি বিলোচনানি॥
তস্যাঃ করং শৈল গুরূপনীতং
জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলি মষ্ট মূর্ত্তিঃ।"

জব্বলপুর ।

নন্দগ্রাম হইতে জব্বলপুরের পথে রাত্রি প্রভাত হইলে মধ্য ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। চৌদিকে পতিত ভূমি ও গুল্মরাজি নয়নগোচর হইতে লাগিল। পরদিন রাত্রি ৮ টার সময় জব্বলপুরে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উ স্থিত হইলাম।

পূর্ব্বাহ্নে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সঙ্গে লইয়া নর্ম্মদা উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এখানে মিষ্টান্ন অত্যন্ত সুলভ, বোধ হয় চারি আনা সের। এখান হইতে ভেড়া ঘাট ৫ ক্রোশ দূর। প্রধান রাজপথ দিয়া টাঙ্গা চলিল। চতুষ্পথে ফুহারাধারা উৎসিক্ত করিয়া নৃত্য করিতেছে। দেশ সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী, তথাপি নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে দুই একজনকে কচ্ছ দিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা গেল। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রথার ঐটি অবশেষ রহিয়াছে। ভৃগুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাণগঙ্গা সঙ্গম স্থলে নর্ম্মদার প্রসন্ন সলিলে অবগাহন করিলাম। নিমজ্জিত শরীর জল মধ্যে দৃশ্য হইতে লাগিল। স্নানের কল্পনা ছিল না, কিন্তু মারবল পুলিনে শ্যামল দর্পণের ন্যায় প্রশান্ত সরিতের রূপ মাধুরী দেখিয়া স্থির থাকা গেল না। এখানে নর্ম্মদা নাব্য। গর্ত্তের একস্থান উচ্চ হওয়ায়, তাহা অতিক্রম করিয়া মারবল শৈল বিহারার্থ নৌকা আরোহণ করিতে হইল। নৌকার বেতন দুই টাকা দেয়। পুটভেদ মধ্যে নৌকা চলিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, উভয় পার্শ্বে শুভ্র শৈল ব্যক্ত হইতে লাগিল। পর্ব্বত বিশেষ উচ্চ। যেন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত আরোহণে অ চরণ করত হস্ত দ্বারা খনিত্র ধারণ করিয়া নর্ম্মদার জন্য পথ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। শ্বেতবর্ণের উপর রৌদ্রের ছটা পড়িয়া মসৃণ অঙ্গকে দীপ্তিমান্ করিয়াছে, সেই আভা জলে পড়িতেছে, এবং পর্ব্বতের পরপার্শ্বকে উজ্জ্বল করিয়াছে। যে দিকে রৌদ্র লাগিতেছে, তাহার সম্মুখস্থ অপর দিক বরং আরও সুন্দর দেখাইতেছে। যেন চন্দ্রমার মত তেজোময়

অধিক নয়ন ঝলসায় না; এমন অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে আসিলে ভ্রমণ সার্থক বলিয়া বোধ হয়। অহো! আমরা যেন স্বর্গে মন্দাকিনী বক্ষে বিহার করিতেছি। এখানে বুঝি মানুষ আসিতে পারে না, কেবল শুভ্রকান্তি গিরি, নর্ম্মদা ও আমরা রহিয়াছি। পৃথিবীর কোলাহল কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। উপরে উঠিয়া নর্ম্মদার জল প্রপাত দেখিতে যাওয়া হইল। প্রভূত জল জীমূত মন্দ্রে পতিত হইতেছে। আবর্ত্ত উর্ম্মি তুলিয়া ফেনিল বক্ষে অগণনীয় বুদ্বুদ অবিরাম প্রকাশ করিতেছে। অগ্নির উপর কটাহে যেমন দুগ্ধ ধুক্ষিত হইয়া থাকে, অবিকল তদ্রূপ দেখাইতেছে। ধারার শোভা অনেক প্রপাতে সুন্দর দেখিয়াছি, কিন্তু বুদ্বুদের এমন শোভা কুত্রাপি দেখি নাই, এবং কাশ্মীরের বেরী নাগ ও নাসিকের ভুধস্থলি অপেক্ষা ধুঁয়াধার প্রপাতে জল নির্গম বহুল; আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিকটস্থ হইলে বাষ্পাকারে নীত শীকর দ্বারা শরীর আর্দ্র হয়। সূর্য্য কিরণে সেই বাষ্প নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই প্রপাতের নাম ধুঁয়াধার হইয়াছে। যাহা হউক, হ্রাদিনীর তীরে বসিয়া উথলান দেখা বড় আমোদ জনক হইল। প্রপাতের উপর রেবা গভীর নহে, ইহার প্রশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ উপল খণ্ড দেখা যাইতেছে। সন্নিকটে এক উদাসীন আশ্রম নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি হর হর মহাদেব ধ্বনি করিলেন স্থানের গম্ভীরতার সহিত নর্ম্মদার কল্লোলে সে শব্দ মিশাইল। এখান হইতে বাণকুণ্ড দেখিতে গেলাম। ইহাতে বাণলিঙ্গ নামক শিলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নর্ম্মদাতীরে জন সমাগম রহিত বন মধ্যে বায়ান্নটি কুণ্ড আছে। তাহারা পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। উহাদের গর্ভদেশ নাতিশ্বেত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা পূর্ণ। বর্ষাকালে বায়ান্নটিতে জলপূর্ণ হইয়া নদীর আকারে নর্ম্মদায় পতিত হয়। যেটিতে বাণ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লিঙ্গ কুণ্ড, তাহাতে সকল সময় জল থাকে। দিবা অবসান হইয়াছে; আমাদের যে পথ প্রদর্শক, সে বালক—কদাপি উক্ত কুণ্ড পর্য্যন্ত গমন করে নাই এবং যে পথে চলা হইতেছিল, তাহা অত্যন্ত বন্ধুর—প্রতিপদে পৃথক শিলাখণ্ডে পাদ রক্ষা করিতে হয় বলিয়া সে পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না। গৌরী শঙ্করের মন্দির উচ্চ পাহাড়ের উপর স্থাপিত, সোপান গ্রথিত আছে, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ বিতান, অতি রম্য স্থান। আমার শীঘ্র দেখা শেষ করিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে

স্বর্ণাসনে হর গৌরী বিরাজিত; বাহিরে মণ্ডপতলে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দ্রাবিড় গঠনের দেবমূর্ত্তি অন্য স্থান হইতে আনয়ন করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সকল গুলিই খণ্ডিত।

সুরধুনী।

বারাণসী—বরণা ও অসি নামক সরিতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বর্ত্তমান কাশী নগরী। পূর্ব্বে বরণার বাম পারে এক্ষণে যেখানে সারনাথ প্রভৃতি স্থান, সেইখানে প্রাচীন কাশী ছিল। শাক্যমুনি প্রথমে এই খানেই আপন মত প্রচার করেন। নিজ জ্ঞানের উন্নতি করিয়া নির্ব্বাণ লাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কালক্রমে এই স্থানে মরিতে পারিলেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে ইহাই বিশ্বাস দাঁড়াইল। তখন বরণার দক্ষিণ পারে জনপদ হইয়াছে। পৌরাণিক সময় উপস্থিত, পাশুপত মন্দিরে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ড যোজিত হইল। দিগ্‌দেশ হইতে কাশীধামে শরীর ত্যাগ করিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। কাহারা বা ক্ষেত্র সন্ন্যাস করিলেন। তাঁহারা কাশী ছাড়িয়া আর অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। যাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আছে, তিনি প্রতিগ্রহ করেন না। অন্যে যদি ভোজনের নিমন্ত্রণ করে বা কোনও উপহার দেয়, তাহা গ্রহণ করেন না। সর্ব্ববিধায়ে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাই অভিপ্রেত হইয়া দাঁড়ায়। ডফরিণ সেতুর উত্তর বরণা সঙ্গমের পর মাতাজীর আশ্রম। কলিকাতার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এই আশ্রমপদ উত্তম শিলা দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। আমাদের নৌকা যখন ঘাটে পৌঁছিল, মাতাজী তখন গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আগন্তুক দেখিয়া প্রসন্নমুখে তিরোহিত হইলেন। উপরে উঠিয়া দেখি, তিনি বৃক্ষমূলে নামাবলী গায়ে দিয়া জপমালা হস্তে বসিয়া আছেন। প্রবীণ বয়স, বিধবার

বেশ, সৌম্যদর্শন এবং বচনে দাম্ভিকতা নাই। তিনি কহিলেন, যোগ এক্ষণে পণ্য দ্রব্যের মত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণেল অলকট এই একটী উপকার করিয়াছেন, আমরা কহিলে দেশীয় ইংরাজি শিক্ষিত লোক স্বধর্ম্ম ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী হইতেন না, কিন্তু কর্ণেল কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাহাতে আস্থাবান্ হইয়াছেন। মাতাজীর নাম মনমন বাই। তিনি গুজরাতি নাগর ব্রাহ্মণ-কন্যা। আশৈশব কাশীতে আছেন। পিতার নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছেন। এই আশ্রম একজন পেশোয়া সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। মাতাজীর পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হন। ইনি স্ত্রীলোক বলিয়া সন্ন্যাসের অধিকারী নহেন। এজন্য গুরুর চীবর চিত্রপার্শ্বে পুটবদ্ধ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। যোগমঠ শাস্ত্রীয় প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভূগর্ভে পর পর তিনটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সাধক অগ্রে প্রথমটীতে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তদনন্তর প্রথমটার কবাট বন্ধ করিয়া দ্বিতীয়ে ক্রমশঃ বায়ুধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে, নির্ব্বাত তৃতীয় কোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সাধন করেন। জীবিতের দেহতত্ত্ব বিদ্যা অনুসারে শোণিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া আপন কার্য্য নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক পোষণানুপযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং নানা অপরিষ্কার পদার্থ ইহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল অপরিষ্কার পদার্থ মধ্যে কার্বণিক অ্যাসিড্ নামক বায়ু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে বহির্গত করিয়া অক্সিজন বায়ু শোণিত মধ্যে আনয়ন করা শ্বাসক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। কুম্ভক কারণে ঐ কার্বণিক বায়ু বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য যোগীদিগকে এমন আহার বিহার অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে কার্বণিক অ্যাসিড্ অধিক পরিমাণে না জন্মে। আর কুম্ভকের অবস্থায় চৈতন্য রহিত হইয়া পড়ে ও শোণিত প্রবাহ স্থগিত হয়, সুতরাং তখন শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ থাকায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল যোগী বহুদিন অচেতন অবস্থায় ছিলেন দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের শরীর কোনও প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে মাত্র; বল বা কান্তি লুপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন জন্তু আছে যাহারা ছয় মাস নিদ্রা যায়। মানুষেরও এমন পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে, তিন মাস অনাহারে নিদ্রাভিভূত ছিল। যোগারূঢ় ব্যক্তি ঐরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে পারেন। তাহা বলিয়া তাঁহাদের যে অস্বাভাবিক দৈবী

ক্ষমতা জন্মে, এমন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই অভ্যাসের ফল এইমাত্র যে, নিবৃত্তি মার্গের পথিকের পক্ষে চিত্তবৃত্তি নিরোধ সুখের বিষয় হয়। একজন থিয়সফিষ্ট কহিয়াছিলেন, মাতাজী তিব্বত দেশীয় এক মহাত্মা অর্থাৎ লামা। এক্ষণে স্ত্রী শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

গাজিপুর—মাতাজীর আশ্রম হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে "পবহারী" বাবার আশ্রম। ১৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমেনা গ্রাম নিবাসী নারায়ণ দাস তেওয়ারি নিজ পিতৃব্য কর্ত্তৃক স্থাপিত রামানন্দী দেব কুটীরে আসিয়া কয়েক বৎসর কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করত তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করতঃ পাঁচ ছয় বৎসর পরে যোগ অভ্যাস করিয়া যখন প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার পিতৃব্য গত হইয়াছেন। তিনি সেই পর্ণকুটীর খর্পর আচ্ছাদিত করিয়া তদভ্যন্তরে মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে গুহা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সাধনা আরম্ভ করিয়া "পবহারী বাবা" নাম প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে লক্ষ্মণ ঠিকেদার মঠসংলগ্ন প্রাচীর ও কয়েকটী চিম্নি শোভিত উচ্চ ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বাবাজী দেখা দেন না। রুদ্ধ দ্বারের ভিতর পিঠ হইতে বহিস্থ লোকের সহিত কথা কন—চিঠি দেন। রাত্রে পরিচারক পূজার দ্রব্য ও ফরহার রাখিয়া গেলে কবাট খুলিয়া লইয়া যান। যখন দেখা দেন, তখন মেলা লাগে। পুলিষকে শান্তি রক্ষা করিতে হয়। গোরক্ষ-পুরের নিকট পয়কোলি গ্রামে অন্য পবহারীজী বৈরাগীর মঠ আছে। তাঁহা-দের শিষ্য পরম্পরায় ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি সেই পবহারী বহু অনুচর সহিত রামানন্দী সম্প্রদায়ের তীর্থ স্থান ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনিও ফরহারী। পরপারে ইন্দ্রপুর নামক স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একজন রেসম ব্যবসায়ী গোঁসাঞি গঙ্গার উপর নৌকায় বজ্রাহত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করায় সমাহিত হন। পঞ্চাশ বৎসর পরে একজনের স্বপ্ন হইল। তিনি চোরা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যথারীতি পীড়া হইতে মুক্ত হইলেন। সেই স্থান বিজলিয়া বাবা নামে পূজিত হইতেছে। যব, সরিষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের পার্শ্বে পার্শ্বে গোলাপের চাস হইতেছে। ফাল্গুন চৈত্র ব্যতীত এক্ষণে "সালি-গুলাব" "সদাগুলাবের" মত হয় না। গঙ্গাতীর হইতে গাজিপুর দেখিতে কাশীর মত। ইহার ভাষাও তত্তুল্য। রামেশ্বর চিত্তনাথ খিড়কীঘাট প্রভৃতির

মধ্যে রাজা শাস্ত্রির কোঠি বা দুর্গ নামে উচ্চ পাহাড়ের উপর বউড়ইয়া সাহেব অঘোরির শ্বেত গৃহ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা এখান হইতে কর্ডরেল পথে ৪৪৫ মাইল, স্থলপথে ৪৩১ মাইল, জলপথে ৭৮৪ মাইল হইবে।

বক্সর—রামায়ণের তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্রের তপোবন প্রভৃতি স্থান ও অহল্যা যেখানে মানবী হইয়াছিল, সেই সকল স্থান ইহার সন্নিকট। রামরেখা ঘাটে বৈরাগীদের মন্দির আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কেহ কেহ বলেন, রামায়ণের বিবরণ ঐতিহাসিক ঘটনামূলক নহে। রামচন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র হইতে কল্পিত। জগদীশপুরের কুমার সিংহের দায়াদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বক্সরে মৃৎদুর্গ আছে। এখান হইতে ভোজপুর অধিক দূর নয়। "তস্‌লা তেরা কি মেরা"—সকলেই শ্রুত আছেন; পথিক অন্ন রন্ধন করিতেছেন, দস্যু আসিয়া উপস্থিত। যদি বলেন পাকপাত্র আমার, তাহা হইলে ভূমে অন্ন নিক্ষেপ করিয়া পাত্র লইয়া যায়; যদি বলেন তোমার, তবে কহে—খাইয়া পাত্র দাও। এক্ষণে সে কাল নাই, তথাপি কাশী হইতে কলিকাতার জলপথে এই প্রদেশটায় দস্যুভয় বিদ্যমান আছে। রাত্রে নাবিকেরা আমাদের নৌকা নঙ্গর করিয়া রাখিত, ভয়ে তীরে বাঁধিতে পারিত না। বলিয়া বা ভৃগুক্ষেত্রের এক মন্দির মধ্যে বেদীর উপর ভৃগু যে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, পদ্ম যন্ত্রে সেই গায়ত্রী লিখিত আছে। তাহারই পার্শ্বে আবার তদীয় পদচিহ্ন খোদিত হইয়াছে। এখানকার বিষয়ে দর্দ্দুর-মাহাত্ম্য নামক এক গ্রন্থ আছে। এদেশের মৃত্তিকা এমন দৃঢ়, যে গঙ্গার পাড় খুদিয়া সোপানাবলি প্রস্তুত করিয়া জলে নামিবার পথ করা হইয়াছে। এখান হইতে একখান ষ্টীমার দ্রব্যজাত লইয়া বক্সর যাতায়াত করে। উপরে উঠিয়া দুইটী চিনির কারখানা দেখিয়া আসিলাম। সরযূ ছাপরা নগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তেলকাঘাট নামক স্থানে আমাদের রাত্রি যাপন হইল। প্রাতে অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা দেখা গেল—দশ হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না। ভ্রমণ না করিলেই নয়, এই জন্য উপরে উঠিলাম। সেই কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া বহুদূর হইতে ঢেঁড়ি (মটরসুঁটী) বাহিনী রমণীগণ আসিতে দেখিলাম। তাহাদের আনাসিকা সিন্দুর ও রঞ্জিত কুলবস্ত্র এবং লাক্ষাচুড় দেখা গেল। ভাষা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিহারী বেশ দেখা দিয়াছে। এখান হইতে পাটনার ভাষা

হইতে এখানে হস্তী আসে। আরব বণিকগণ আসিবামাত্র ক্রয় করিয়া লয়, পরে মেলায় বিক্রয় করে। এবার কিছু আসে নাই, তত্রাচ এক সহস্র হস্তী আসিয়াছে। ঘোটক চারি সহস্র হইবেক, বলীবর্দ্দের বাজার সম্পূর্ণ দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না, তাহারও সংখ্যা বোধ হয় চারি সহস্র হইবেক। সময়াভাবে মেষ, গর্দ্দভ ও কুকুরের হাট দেখা হইল না। নানাজাতীয় পক্ষীর বাজার দেখা হইল। এক সুচ্ছায় উপবনে নর্ত্তকীরা বায়নার প্রতীক্ষা করিতেছে। দানাপুরে যে হিন্দু বেশ্যা হয়, সেই মুসলমান হইয়া থাকে। বেশ্যা হইলে পরকালে হিন্দুর সদ্গতি রুদ্ধ হয়, বোধ করি মুসলমানের তাহা হয় না, সেই জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে।

ফতুহা—পুনপুনা নদী গঙ্গায় সম্মিলিত হইলেন। প্রাতঃস্নান হইলে আমরা তরণী ছাড়িয়া দিলাম। দেড় প্রহর বেলা হইলে বায়ুর গতি ফিরিল। নৌকা উজাইয়া যায় দেখিয়া মাঝিরা “গিরানী” ফেলিয়া রাখিল। “উজনীয়া” “মেলহনী” “সলিনা” প্রভৃতি নৌকাগুলি, যাহা ফেরতা কালে “দোগায়” অর্থাৎ একবার এপার একবার পরপার করিয়া অতি কষ্টে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতে হইত, এক্ষণে পাল উড়াইয়া চলিয়াছে। আমাদের মাঝিরা অবকাশ পাইয়া স্বদেশ অভিমুখী পরিচিত নৌ জীবীদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, খিলান নৌকা ভাটি যাইতেছে কেন। এক্ষণে যে নৌকায় সওয়ার যায় তাহা কিরূপে বুঝিবে। পশ্চিম হইতে ভুষা মাল লইয়া যায়, পূর্ব্ব হইতে চাউল বা লবণ পাইলে আনে, নতুবা খালি আসে। পশ্চিম হইতে খালি নৌকা যায় না। আমার চিকিৎসক কহিয়াছিলেন, “ঔষধে উপকার হইতেছে না, তবে উহা সেবন করিতেছ কেন? উপকার না হইলে সেই ঔষধ দ্বারা অপকার হয়।” তাঁহারই পরামর্শে নৌকা-যাত্রা করিয়াছি। দেওঘর বাস অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ হইয়াছে। নৌকার গতির সহিত শরীর চালনা হয়। যে দিন নৌকা অধিক চলে, সে দিন ক্ষুধাও অধিক হইয়া থাকে। দুগ্ধ প্রত্যহ আহরণ করিতে হয়। অন্যান্য বস্তু মধ্যে মধ্যে হাট বাজার পাইলে সংগ্রহ হয়। সামান্য গ্রামের দোকানে জনার ও তামাকমাত্র থাকে। আহার বিহার সমস্তই নৌকায়। নৌকা এক্ষণে আমাদের বাটী। বাটীতে যে সকল আততায়ীর সহিত বাস করিতে

দ্রুম, বালমূষিকা, লূতা, গৃহগোধিকা, গঙ্গোলী, প্রভৃতি সকলই এখানে আছেন। বায়ু কিঞ্চিৎ অনুকূল হইলে চলা গেল। অপরাহ্নে ঈশানে মেঘ দেখা দিল, তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, জলের উপর মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। নাইয়াদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—প্রবল ঝড় আসিতেছে। মাঝিরা প্রাণপণে বলিয়া কহিয়া কূলের দিকে ক্ষেপণি চালন করিতে লাগিল। কিন্তু বুঝা হইল, ঝড় আসিয়াছে, সেই সঙ্গে বৃষ্টিও অতি নিকট হইয়া পড়িয়াছে—তটে নৌকা লাগাইতে পারিল না—বায়ুর ভরে দাঁড় কোনও কায করিতে পারিল না। একখানি পারঘাটের নৌকা বহু লোকপূর্ণ হইলেও ছই না থাকায় বায়ুর আঘাত লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া অনায়াসে পারে আসিয়া লাগিল। আমাদের মাঝিরা উদ্যম ছাড়িয়া নারায়ণ যাহা করেন বলিয়া নিরস্ত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইবে? উত্তর দিল—এ পারে আর লাগান যাইতে পারে না। ঝড়ের গতি অনুসারে পরপার অভিমুখে আপনি নৌ চলিল; কর্ণধার কেবল দিক নির্দ্দেশ করিয়া রহিল। নৌকা শীঘ্রই এক চরের নিকট উত্তীর্ণ হইল। তখন প্রধান কেয়ট্ট নঙ্গর ফেলিতে কহিল। শীঘ্রই কিন্তু পবন শান্ত হইলেন, ঘনঘটা রহিল; আজিকার মত আমাদের এই স্থানে বিশ্রাম। কিয়ৎকাল পরে দেখিলাম, বৃহৎকায় বাষ্পীয় তরি ঝঞ্ঝা তরঙ্গ না মানিয়া, বাণিজ্য দ্রব্য আনিতে মন্থর গতিতে পাটনা অভিমুখে চলিয়াছে।

রাঢ়—নৌকা লাগিলে মালাকার সুরধনীকে পুষ্পহার উৎসর্গ করিয়া গলুইয়ে পরাইতে আসে—দধি বিক্রেত্রি দর্শন দেয়—ভিক্ষুক মিলে।* রাঢ় নগরে চম্পা ফকিরদের দৌরাত্ম্য পূর্ব্বে মাঝিরা নৌকা লাগাইতে চাহিত না; তাহারা যাহা কহিবে, তাহাই দিতে হইবে। একজন ছুরিকা আঘাতে আপন শরীর হইতে রুধির বাহির করিয়া, বাঞ্ছিত যাচ্ঞা পূরণ করিতে কহিল।

---

* ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিক্ষা করিতে আসিলে প্রথমে ধানকে কবিতা দ্বারা "মেস্‌মেরাইজ" করত পরে প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

"অর্দ্ধং দানব বৈরিণা গিরিজয়া পাদ্ধং শিবস্যাহৃতং,
দেবেত্থং জগতীতলে পুরহা ভাবে সমুন্মীলতি।
গঙ্গাসাগর মম্বরং শশিকলা নাগাধিপ ক্ষ্মাতলং
সর্ব্বজ্ঞত্ব মধীশ্বরত্ব মগমৎত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনং॥"

রজনী প্রভাত হইলে প্রাতঃস্নায়ীরা দেখা দিলেন। কেহ সীতারাম কহেন না, কেহ রাধাকৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করিবেন না, তাহা লইয়া ঘাটে বিলক্ষণ আমোদ চলিল। প্রাতঃকালের কুয়াসার মধ্য দিয়া এক প্রকার অস্ফুট ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, কারণ্ডবযূথ ঐ শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। নিস্তব্ধ পুলিনে রাজহংস মিথুন বসিয়া আছে। তাহারা একা থাকে না। বলাকাকুল আকাশে আলপনা দিয়া চলিয়াছে। তটোপরি শ্যামল ক্ষেত্র শস্যরাশি বক্ষে করিয়া নয়নানন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চবৃক্ষে শুকবায়স উড্ডীন সংডীন হইতেছে। কোথাও বা কঙ্ক, গৃধ্র বিচরণ করিতেছে। ক্রমে আমরা মোকামা সান্নিহিত হইলাম। পরপারে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে, পারাপারের সুবিধার জন্য ষ্টীম্ ফেরি রহিয়াছে। খুটিহা বড়িহার পরপারে বিষ্ণপুর বেগুসরায়। রামদিঘি নামক স্থানে প্রত্যহ দুই শত মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। খুটিহায় চারণ ভূমির অসুবিধার জন্য গো পার হইতেছে। স্বর্ণাগড়ে একটী পার্ব্বত্য তটিনী বৃষ্টিপাত দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকা লইয়া সুরধনীতে একটী ভিন্ন বর্ণের সুষমা ঢালিয়া বহুদূর চলিয়াছে।

মুঙ্গের—গত বৎসর যেখানে বজরা লাগিয়াছিল, এবার সেখানে আর পটইলা লাগিতে পারিল না। জল সাত হাত নিম্নে পড়িয়াছে। "পাতর" ভূমিকে বর্ষাকালে স্রোতজলে আনীত মৃত্তিকা "কছাড়" করিয়াছে। কাশী কানপুর অঞ্চলে গঙ্গার ক্রীড়া এত দেখি নাই। গঙ্গা পাটনা হইতে প্রবলা হইয়াছেন। পূর্ব্বে শোণ সরযু গণ্ডক সহায়তা করে নাই! তাহাদের বলে এখন কোথাও দ্বিধা কোথাও বা ত্রিধা মূর্ত্তি দেখাইতেছেন। সেই সঙ্গে নরভুক্ কুম্ভীর ও নৌভুক "মসিনার" আকর হইয়াছেন। মসিনা বালুকার এক প্রকার অতিদৃঢ় জলমগ্ন স্তর। তাহাতে নৌকা আহত হইলে খানচাল হইয়া যায়। স্রোত মুখে আনীত মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া পড়িলে ভাগীরথী মুখ ফিরান। যে দিকে ভঙ্গুর মৃত্তিকা থাকে, ঘর বাড়ী, বৃক্ষ বিটপী গ্রাস করত পথ পরিষ্কার করিয়া সেই দিকে ধাবিত হন। পূর্ব্বে যেখানে নদী ছিল সেখানে এক্ষণে গ্রাম বসিয়াছে, গ্রামের স্থানে নদী হইয়াছে। নৌকার যদি পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ভয়ে রাত্রে মাঝিরা কাছাড়ের নিম্নে নৌকা রক্ষা করে না। বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম আলিসা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পরিখার

মধ্যে ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ, অধুনা সুন্দর দূর্ব্বাদল শোভিত মাঠ ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণ ও সৌরভপূরিত বৃক্ষবাটিকামধ্যস্থ বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। একটি ঘাটের নাম কষ্টহরণী। তৎসন্নিকটে মৌদ্‌গল্য আশ্রম ছিল। এখানকার পীরপাহাড় জলপথে আটক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। তন্নিকটেই সীতাকুণ্ড। কথিত আছে, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রামনবমী হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কুণ্ডের জল শীতল হইত, তখন বুদ্‌বুদ বা বাষ্প উত্থিত হইত না, তাহার পর কখন দুই চারি ঘণ্টাকাল শীতল হইতে দেখা গিয়াছে। দুই বৎসরের কথা, দেড় মাসের জন্য একবার শীতল হয়। পাণ্ডারা ভাবিল, এইবার তীর্থ লোপ পাইয়াছে। সীতাকুণ্ডের জলে অন্নপাক হইতে পারে এমত উষ্ণ নহে। অন্তর উৎসেক বন্ধ হইলেই শীতল হয়। প্লীহা প্রভৃতি রোগীর পক্ষে এই জলপান বিশেষ উপকারী। মঙ্গলা বা বিক্রম চণ্ডীর আকার একখানি ক্ষুদ্র পর্ব্বত খণ্ড। তাহা মধ্যে থাকিয়া মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। "মধ্যদেশে মহামায়া" ইত্যাদি তন্ত্রোক্তি অনুসারে চণ্ডীস্থান নেত্রপীঠ অভিহিত হয়। শতবর্ষ পূর্ব্বে রামগিরি নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ এখানে বাস করিতেন। এখানকার ভাষায় বাঙ্গালার গন্ধ পাওয়া যায়। ভূ ধাতুর পরিবর্ত্তে অস ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। "ভবতি"র স্থানে "অস্তি" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখা দিল। প্রাকৃত "হোই" পদ হইতে উৎপন্ন "হয়" শব্দের স্থানে প্রাকৃত "অচ্ছি" শব্দ জাত বাঙ্গালা "আছে"র মত "ছে" ক্রিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। তথাহি,—

পশ্চিমা হিন্দি—নহি হয়।

পূরবী বা ভোজপুরী হিন্দি—নই থয়।

মধ্যদেশী হিন্দি—ন ছে।

হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মধ্যদেশ নাম হইয়াছে। হিন্দির মধ্যে দিল্লীর ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেখানকার ভাষা আমার এমন মধুর লাগিয়াছে যে, কেবল তাহা শুনিয়া কর্ণ শীতল করিবার জন্য আর একবার তথায় যাইতে ইচ্ছা হয়।

জহঙ্গীরা—পুটবন্ধের বাহুল্য বশতঃ মূলধারা পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে বাঘমতী সঙ্গম অতিক্রম করতঃ পুনর্ব্বার আমরা গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম। ৩।৪ ক্রোশ দূরে গ্রাম। চড়ার উপর মহিষের বাথান। স্থানে স্থানে মহিষের

মুখ জলে পড়িয়া রহিয়াছে। এ প্রদেশে এক একজন গোপের (মহতোর) ২।৩ কুড়ি করিয়া গাভী থাকে। সুলতানগঞ্জে গঙ্গা গর্ভে দুইখানি গণ্ড শৈল। একটীর পার্শ্বে চড়া পড়িয়া গিয়াছে—তাহাতে মুসলমানের মস্‌জিদ আছে। পর্ব্বত গাত্রে হিন্দু মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। অপরটীতে উচ্চ শিবমন্দির ও মহন্তের বাসস্থান এবং বহুল দেবমূর্ত্তি খোদিত ও শেষশায়ী এবং হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তির উপর অর্দ্ধ দেবায়তন রচিত হইয়াছে। হরকে জহ্নুমুনি নাম দিয়া তীর্থজীবীরা জহ্নুক্ষেত্র আখ্যা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে পাশুপত সম্প্রদায়ের সমসাময়িক কয়েকটী বৌদ্ধ বিগ্রহ আছে দেখা গেল। ইদানীং সরাউগীরা শেষশায়ীকে পার্শ্বনাথ বলিয়া পূজা করিতে আইসে। অন্য স্থান হইতে কয়েকটা স্তম্ভ ও পুত্তলি আনিয়া গৈরীনাথের (গৌরীনাথ) সন্নিকটে যোজিত হইয়াছে। এখান হইতে দেবগৃহ ৩০ ক্রোশ। বৈদ্যনাথযাত্রীরা জহাঙ্গীরা হইতে গঙ্গাজল "কামরে" লইবে বলিয়া হাঁড়ি ও শিশির বাজার বসাইয়াছে। শত শত লোক দলবদ্ধ হইয়া কামর উত্তোলন পূর্ব্বক "বোলো বম" শব্দের তরঙ্গ বিস্তারিত করিয়া চলিয়া থাকে। প্রত্যাবর্ত্তনের গীত "মাল খাজানা বাবা লেল ভর ভর কামর হিয়া দেল্।" নৌকায় যাইতে যাইতে একখানি গ্রামের নাম পাওয়া গেল "দুধেল"। এদেশে ঘৃত দুগ্ধ যে অধিক পরিমাণে জন্মে, স্থানের এই নাম তাহা প্রকাশ করিতেছে।

ভাগলপুর—আমাদের দেশে যে দাতাকর্ণের কথা আছে, এখানে তাঁহার গড় ছিল। উক্ত গড় চম্পা নগরে অবস্থিত। বেহুলার উপাখ্যানে এই চম্পাই নগরের উল্লেখ আছে। কর্ণ গড়ে এক্ষণে কেবল রাজা কর্ণের উপাসিত মনোকামনানাথ শিব ব্যতীত তাঁহার আর কিছু স্মরণচিহ্ন নাই। জনপদগণ অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে শত সহস্র কলস বারি দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইবে মানসিক করিয়া থাকে। ক্লেভল্যাণ্ড সাহেবের স্মরণ চিহ্ন দেখিলে হৃদয় পুলকিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে ;—

"Without bloodshed or the terrors of authority, employing only the means of conciliation, confidence, and benevolence, he attempted and accomplished the entire subjection of the lawless and savage inhabitants of the Jungle Terry

(forest frontier) of Rajmahal who had long infested the neighbouring lands by their predatory incursions, inspired them with a taste for the arts of civilised life, and attached them to the British Govt. by a conquest over their minds, the most permanent as the most rational mode of dominion."

ভাগলপুর বিস্তীর্ণ সহর। নগরের উপকণ্ঠে কিয়দ্দূর বিচরণ করিলে ধূলায় ধূসরিত হইতে হয়। বাষ্পীয় তরণী নিকটস্থ জলস্থানে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। কহোল ঋষির আশ্রম কাহোল গ্রাম সন্নিধানে। গঙ্গাগর্ভে যুগল শৈলখণ্ড অতিক্রম করিয়া শিলা সঙ্গমের অনতিদূরে বটেশ্বর-নাথের মন্দিরে উঠিবার উচ্চ সোপান শ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। নাতি-দূরস্থিত শৈলমালা সুরধুনী ও তটভূমির সহিত একযোগে মোহনভাবে নয়ন-পথগামী হইতেছে। তাহার পর কুশী নদী গঙ্গায় আসিতেছেন। মণিহারীতে আসাম বাঙ্গালা লৌহপথের বাষ্পীয় শকটশ্রেণী দণ্ডায়মান, সাঁহেবগঞ্জ হইতে জাহাজে পার হইয়া যাত্রী আসিতেছে।

রাজমহল—বিন্ধ্য পর্ব্বতের একটী শাখা রোতস্গড় হইতে আরম্ভ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট হইতে গঙ্গার ধারে ধারে রাজমহলে আসিয়াছে। ভাগীরথী পার হওয়া যেন নিষিদ্ধ। রাজা মানসিংহ এই নগর পত্তন করেন—এই জন্য রাজমহল নাম হইয়াছে। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে সুবাদার সুলতান সুজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "সঙ্গিদালান" জাহ্নবী তীরে অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাজারে সাঁওতাল নরনারী কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। তাতার জাতীয় পাহাড়িয়ারা কৃষ্ণকায় নহে। তাহাদের স্ত্রীলোককে "সুঁদরী" কহে। ইহারা মিথ্যা কথা কহে না। দামিনীকোহনিবাসী সাঁওতালেরা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে নাই। অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব শাসনভার তাহাদের নিজ হস্তে দিয়া ভূমির কর নামমাত্র নির্দ্ধারণ করত পর্ব্বতের নিম্নে বসতি করাইয়া অধীনতা স্বীকার করান। যিনি এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সাঁওতালের শরীরের গঠন দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন খাটিবার জন্যই জন্মিয়াছে, ভাবিবার জন্য নহে। কোন বিষয় সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা

করিয়া প্রকৃত উত্তর পাওয়া ভার। যাহা জিজ্ঞাসা কর—হাঁ বলে। কোন প্রকারে হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচে। তাহাদের মাঝিকে (প্রধান ব্যক্তি) আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে কেহ দেখে নাই। ইংরাজেরা কহেন—সাঁওতাল বিদ্রোহ যে ঘটিয়াছিল তাহার কারণ প্রতিবেশী বাঙ্গালীর অত্যাচার। বন্যগণ কহিয়াছিল, আমাদের কষ্টের কারণ কি বৃটিশরাজ জিজ্ঞাসা করিলে এ ঘটনা হইত না। এক্ষণে সাঁওতালের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ বা খ্রীষ্টান হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রতারণা প্রবঞ্চনা শিখিয়াছে। পর্ব্বত ইহাদের প্রধান দেবতা। তাঁহার নাম "মেরং বুরু।" আমাদের শিব বুঝিবা ঐ দেবতা হইবেন। চড়কের মত তাহাদের পোটা নামে এক উৎসব আছে। এখন আর বাণ ফুঁড়িতে পারে না। একজন সংবাদদাতা কহিলেন, এদনা নামক উৎসব কালে পিঠা, মাংস, মদ্য, নৃত্যগীত শেষ হইলে সন্ধ্যাকালে বৎসরের জন্য সেই একদিন স্ত্রী পুরুষে যদৃচ্ছা ব্যবহার হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানি হোলি পর্ব্বে গালিপাড়া কি এই মূল হইতে উৎপন্ন? সাঁওতালেরা আপনাদিগকে হড় কহে। হড় রমণীরা নৃত্য অতি প্রিয় বস্তু জ্ঞান করে। জমহির নামক নৃত্য রাসলীলার অনুরূপ। ঢাক মাদল ও বাঁশীর বাদ্যসহকারে দ্রাবিড় ধরণে সজ্জিত কেশা এক একটী স্ত্রী এক একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করে। মহাজন সাঁওতালের জমি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। তাহারা কহে জমি যদি বিক্রয় হইবে, তবে দেশের নাম সাঁওতাল পরগণা রাখিলে কেন? ক্রয়ার্থীকে কহে আমাকে মারিয়া ফেল তবে জমি পাইবে নচেৎ আমরাও তোমাকে মারিব বা লুটিয়া লইব। সাঁওতালী ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অপিচ প্রাকৃত ভাষায় সাঁওতাল শব্দ দেখা যায়। এরূপ বিজাতীয় শব্দ প্রবেশে ভাষার মূল গঠনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বিভক্তি প্রত্যয় ও ক্রিয়াপদ লইয়া ভাষার অবয়ব। এ সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিলে নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। সকল ভাষাতেই বিভক্তিগুলি প্রথমে একটী পৃথক্ শব্দ থাকে, তদনন্তর সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করত প্রকৃতির সহকারী হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনও এমন বিভক্তি আছে, যাহা স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। যথা—

"এরা" বিভক্তি।

এরা শব্দের প্রয়োগ—যেমন "এরা যাইবে।" কর্ত্তা কারকে এরা একটী বিভক্তি হইয়া দাঁড়ায়। যেমন "পণ্ডিতেরা কহেন।" এই বিভক্তিরই সংক্ষেপে "রা" হইয়াছে, যথা—"শিশুরা কাঁদে।" করণে "দ্বারা" ও অপাদানে "হইতে" বিভক্তির আকার এখনও বৃহৎ রহিয়াছে। রাজমহলের পর পারে মালদহ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থলে যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য অনেক গুলি গোশকট রহিয়াছে। সেখান হইতে গৌড়ের জঙ্গল বহুদূর নহে। রাজমহল ছাড়াইলে পর্ব্বতের মধ্যে হিন্দুস্থানি দেশ অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানির সন্ধিস্থান নয়ন গোচর হইল না। খোলার ঘরের পরিবর্ত্তে খড়ুয়া ঘর দেখা দিল। তিনপাহাড় হইতে একদল স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে সাঁওতালি ভাব মনে আসে। একহস্তে লাক্ষা ও অন্য হস্তে কাঁসার চুড়ি। নদীতটে চাঁই, কাহার, গোয়ালা, সোণার ও মোদি প্রভৃতি হিন্দুস্থানি উপনিবেশী কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া গেল। কথিত আছে, চৌর্য্য প্রভৃতি কুক্রিয়া করিয়া পলায়ন করত ইহারা স্বয়ং বা ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষে এইস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এক্ষণে কঠিন মৃত্তিকার পাড় আর দেখা যায় না। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছে। ঘাটে কক্ষে কলসি বাঁকমল পরা কোঁচা বিরহিত স্ত্রীলোক দেখিয়া বাঙ্গালী চিনিতে হয়। আমরা ফরক্কা নামক গ্রাম সন্নিধানে মূলধারা (পদ্মা) ত্যাগ করিয়া শাখা নদীতে (ভাগীরথীতে) চলিলাম। ঘাটে হিন্দী ও বাঙ্গালা দুইই শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দস্থানীরা এদেশের বাঙ্গালায় যে একটা বিশেষ স্বর আছে, তাহা সমেৎ বাঙ্গালা কহিতে পারে। ধুলিয়ানে একটি লোকের সহিত কথা কহার আবশ্যক হওয়ায় বাঙ্গালা কি হিন্দী কহিব চিন্তা করিতে হইল। শুঁড়ী জাতীয় লোক একখানি নৌকা করিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেছে। পুরুষের বেশ বাঙ্গালীর মত—স্ত্রীলোকের হিন্দুস্থানীর ন্যায়। জলপথে জনপদ দেখা কেবল ঘট্ট মণ্ডল লইয়া হইতেছে। ঘাটে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক দেখা যায়। হাঁসুলী ও চুড়ি পরা দেখিলে মুসলমান ও রূপার পঁইছে, তাবিজ, নবাদা পরিহিত হইলে হিন্দু স্থির হয়। মাটি দিয়া মাথা ঘসার পদ্ধতি এখনও ছাড়ায় নাই। গ্রামে যদি কেহ দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন, তাহার খড় জড়ান কলেবর মাটি ঝাড়িয়া ঘাটে তুলিয়া রাখিয়াছেন। এ গ্রামে

যে পূজা হয় তাহা সম্বৎসর এ পথে যে চলিবে সেই দেখিতে পাইবে। ছাপঘাটীর মোহানা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এজন্ত করাকা মোহানা দিয়া জঙ্গিপুর নগরে আসিতে হইল। পরপারে তুলসিবিহার দেখা যাইতেছে। এখানে নৌকার "কুৎ" হয়। ভাগীরথী যাহাতে নাব্য থাকেন, সে জন্ত কর সংগ্রাহক পূর্ত্তবিভাগ বিশেষ যত্ন করেন। যেস্থানে চড়া পড়িয়াছে তাহার সম্মুখে বংশ প্রোথিত করত বাঁধ দিয়া অন্তদিকে স্রোত চালান হইয়া থাকে। ছাপঘাটির প্রাদেশিক কথা শুনিতে কিছু অদ্ভুত। প্লুতস্বর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়িক বাক্‌যন্ত্রের আকার ভেদ হইয়া থাকে বলিয়া উচ্চারণ পরিবর্ত্তন হয়। এই উচ্চারণ পরিবর্ত্তন হইতেই নব ভাষা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুরসিদাবাদ—আজিমগঞ্জের অপর নাম সহর। এই জনপদ ও পরপারস্থ বালুচরপুরী বাণিজ্য নিরত ওসয়াল বণিকদিগের বসতিস্থান। নগরের সমৃদ্ধি তদুপযুক্ত দৃষ্ট হইল। মুরসিদাবাদে নবাবের হর্ম্ম্যরাজি ব্যতীত আর কিছু দেখিবার নাই। সৈয়দাবাদে মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া খাগড়া বহরমপুর পাওয়া গেল। প্রাচীন জনপদ গৌরবচিহ্ন অঙ্কে করিয়া সুরধনী তটে লীলা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ইষ্টকালয় ফুরায় না। শিব মন্দিরের আরব্য গঠন, কেবল উপরিভাগে ত্রিশূল দেখিয়া চেনা যায়। স্ত্রীলোকের আভরণ, যথা—শাঁখা ও রূপার অনুকরণ শাঁখা ও মর্দ্দানা, কাঠের মালার মাঝে মাঝে সোণার মালা ও মাদুলি। পলাশী ক্ষেত্র দেখিবার জন্ত নৌকা ত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে তথায় বসতি হইয়াছে। সেখানে যাইয়া একবার চক্ষের জল ফেলিয়া আসা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলাম। কোথায় জয়স্তম্ভ প্রোথিত রহিয়াছে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া গেল। বিজয় প্রস্তরের অতি মসৃণ মর্ম্মর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে—

"Plassey
Erected by the
Bengal government"
—1883—

পুরাতন আম্রবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া পলাশীর যুদ্ধকাব্য একসর্গ পাঠ করা হইল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রশমিত না হইতে হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কাটোয়ার অজয় নদ দেখা দিলেন। মেটিরির নিকট বর্দ্ধমান অঞ্চলের মত বেশভূষা দেখা গেল।

নবদ্বীপ—গঙ্গার জলঙ্গীধারা ভাগীরথীতে আসিয়া মিশিল। এখান হইতে গঙ্গার ইংরাজী নাম হুগলি নদী হইয়াছে। ঘাটে কেহ শিখা বন্ধন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিতেছেন, কেহ বা সন্ধ্যাবন্দন সমাপন করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন। কনৌজীয়া, মৈথিল, তৈলঙ্গী ও বাঙ্গালী বিদ্যার্থীগণ পাকা টোলে পাঠ লইবার জন্য অধিক বেলা করিয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। "ঘটাস্থ ভাবের প্রত্যক্ষ" কিংবা "ধ্বংস প্রাগ্‌ভাবের খণ্ডন" লইয়া কিছুক্ষণ বিতণ্ডা করিতে পারেন, কারণ এখন আর ত্বরা নাই। অপরাহ্ণে পুনর্ব্বার "পাঠ চাওয়া" হইবে। নিমাই কোন্ ঘাটে নৈবেদ্য তুলিয়া খাইতেন জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন এখানে গঙ্গাতীর বাস করিতেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাঁহার রাজধানী আক্রমণ না করিয়া একেবারে নবদ্বীপে আইসেন। যেখানে সেনা থাকিত না, সেখানে বল পরীক্ষা আর কি হইবে। নদীয়া ছাড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পুলিনে বিল্বপত্র ও পুষ্পের নির্ম্মাল্য উৎক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাল্‌নার বর্দ্ধমান রাজের সমাজবাটী ও লালজীর মন্দির দেখিয়া সুখী হইলাম। দারু ব্রহ্মকে মুগেরডালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। দেউলের ইষ্টক অতি পরিপাটী কারুকার্য্যময় ছাঁচে তুলিয়া যোজিত হইয়াছে। সুখসাগরে আমাদের দেশের (খাটুরার) মত কথা শুনিলাম। কিন্তু পরপারের ভাষা তদ্রূপ নহে। বাঙ্গালা লিখিতে যে ভাষা ব্যবহার হয়, তাহার সংজ্ঞা রাঢ়ি সাধু ভাষা হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় আদিকালে বীরভূম বর্দ্ধমান অঞ্চলে গ্রন্থ রচনা হয়। কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা ঐ দেশের সম্পত্তি। শ্রীরামপুরে প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার হইয়াছিল, এবং কলিকাতা রাজধানীর ভাষা ও পুস্তক উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত হওয়ায় এ প্রদেশের ভাষাই লিখিবার বাঙ্গালা হইয়া পড়িয়াছে। বীরভূমের এমন প্রাদেশিক পদ ও শব্দাংশ আছে, যাহা আমাদের অঞ্চলে ব্যবহার হয় না; অথচ লিখিবার কালে প্রয়োগ করিতে হয়।

গঙ্গার পূর্ব্বপারের বাঙ্গালা	হরিরে ডাকিতে হইবে।
গঙ্গার পশ্চিমপারের বাঙ্গালা	হরিকে ডাকিতে হইবেক।

হিন্দিতে দ্বিতীয়ায় যে "কো" বিভক্তি তাহা ও আমাদের "কে" হয়ত এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। হিন্দুস্থানি ভাষায় ১৩ তেরটীর মধ্যে সাতটী ককারাদিক বিভক্তি দেখা যায়। ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাট পাইলে জোয়ার ভাঁটা অনুধাবন করিবার পথ সমুপস্থিত হইল। খালের দক্ষিণভাগে একটী সুবৃহৎ প্রস্তর যোজিত দেবালয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাতে সংলগ্ন একখণ্ড সামান্য লৌহ কীলক আকর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়া থাকে। এ কারণ, "দড়ফা গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বংশবাটী গ্রামের হংসেশ্বরী দর্শন করত হুগলি সেতুর নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাদের কর্ণধার কহে কালিকা ক্ষেত্র অর্থাৎ কলিকাতা ষোল ক্রোশ দীর্ঘ সহর। আমার ভৃত্য পূর্ব্বে কলিকাতা দেখে নাই, সে হুগলি হইতে কলিকাতা আরম্ভ হইয়াছে ভাবিল। বস্তুতঃ কলিকাতার সমৃদ্ধি হুগলি পর্য্যন্ত উছলাইয়া আসিয়াছে বলিতে পারা যায়।

কেরল।

আমরা এক্ষণে দক্ষিণাপথের মালভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া মলয় পর্ব্বতে বিহার করিতেছি। বামে পশ্চিম ঘাট কুলপর্ব্বত; এক খানির পর আর একখানি স্তূপ অগ্রসর করিয়া দিতেছে। গিরিপরম্পরা মধ্যে কাকডিম্বাভ মেঘমণ্ডল আনত হইয়া রহিয়াছে। ক্বচিৎ এক একখানি অখণ্ড প্রস্তরশৈল দৃষ্ট হইতেছে। পর্ব্বত খুদিয়া দেবালয় নির্ম্মাতা কোন নরপতিকে পাইলে ইহা একটি দিব্য দর্শনীয় স্থান করিয়া তুলিতে পারা যাইত। সত্য বটে—

"সুচন্দন বনোদ্দেশো
মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।"

কিন্তু আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় মলয়ানিলে চন্দনের সৌরভ পাইয়া পুলকিত হইতেছে না। মলয়া দেশের বনে যে চন্দন জন্মে, তাহা সুগন্ধি নহে। কর্ণাটে কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-সন্নিহিত ভূভাগ সদ্গন্ধশালী চন্দনের আকর। শকটশ্রেণী নিবিড় বন ভেদ করিয়া চলিয়াছে, জনসমাগমের চিহ্ন নাই। পূর্ব্বে লৌহাদ্ধ আশ্রয়-ভবনে বন্যহস্তী ও বাইসন্ আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমে "বাজরা" শ্রেণীর "কম্বু" বা "রাগী" শস্যক্ষেত্র ও কচ্ছবিরহিতা স্ত্রীকুল সম্মুখীন হইল। গ্রামবাসীর পালিত হস্তী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কল্য আমরা কর্ণাটে ছিলাম। রজনী প্রভাতা হইলে দৃষ্ট হইয়াছে, আমরা দ্রাবিড়ে, অধুনা কেরলে উপনীত হইয়াছি। দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নাবয়ব। ফলবান্ বৃক্ষবাটিকার অন্তরে মধ্যে মধ্যে উচ্চ দেহ বিশিষ্ট বাঙ্গালার তৃণাচ্ছন্ন গৃহের মত তালপত্র আচ্ছাদিত বাসস্থান। শস্যক্ষেত্রে কটিবসনা স্ত্রীজাতি দণ্ডায়মান।

তুলামাসের শেষ দিন উপলক্ষে উৎসবের জন্য নিকটবর্ত্তী জনপদের বহুলোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ট্রেণে উঠিলেন। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর শকট দুইটি পুরুষ ও একটি কিশোরীসহ মহিলা উঠিয়াছেন। মলয়ালি পুরুষটীর মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা; শিরের অপর ভাগ ও শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডিত। তাহার কর্ণে ক্ষুদ্র লিপ্ত কুণ্ডল আছে। পরিধানে কৌপীনসহ বহির্ব্বাস। বৈদেশিক প্রভাবে কোট্ ও টুপি ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীর

পরিধান পুরুষের মত, মস্তকে চিকুরদাম চূড়ার ভাবে সজ্জিত, শ্বেত বস্ত্রখণ্ড মস্তকোপরি হইতে গাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে; কর্ণে সুবৃহৎ হিরণ্যকর্ণিকা কর্ণ-পত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বকের পরিধি মধ্যে অবস্থান করিতেছে। গলে সুবর্ণ মাল্য; মণিবন্ধ অলঙ্কারবিহীন।

সোরনুর ষ্টেশনে অবরোহণ করিয়া গো-যানে উঠিতে হইল। কুচি এখান হইতে ৩৬ ক্রোশ। সুরী নদীর উপর সেতু আছে। পরপার হইতে বোধ হয় কুচিরাজ্য আরম্ভ হইল। ত্রিচুরের পথ অরণ্য ভেদ করিয়া চলি-য়াছে। বনদেবীগণ অনাবৃতবক্ষে সঞ্চরণ করিতেছেন, আমাদের সেদিকে চাহিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কোন যুবতী কাষ্ঠশিরে মন্দগতিতে আসিতেছেন, কেহ বা অন্য কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতেছেন। সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলি নিটোলভাবে দেহ-যষ্টি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নগ্নমাধুরী বীভৎস না হইলে বিশেষ তৃপ্তিকর হয়। আমার সহচর অবাক্ হইয়া গেলেন, আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, সভ্য-তার ছলনা অদ্যাপি এখানে প্রবেশ করে নাই। যে ব্যবহার দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা কেন লজ্জাকর হইবে? পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোড়ে রাজ সমক্ষে নায়ার সীমন্তিনী বক্ষ আবৃত রাখিলে অসম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে বলিয়া গণ্য হইত।

তাপাসহিষ্ণু মপ্লারিগণ তালপত্রের আতপত্র পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া-ছেন। কেরল-ভূপতি পর্য্যন্ত তালপত্রের ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। খদিরবিহীন তাম্বুল সেবনার্থ অপক্ক গুপারি কর্ত্তন ও লিখনসৌকর্য্যের জন্য একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিসংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সৎপথের উভয় পার্শ্বে নাজারা (খ্রীষ্টান) গণের বসতি ও পণ্যবীথিকা। তাহারা যে বৈদেশিকভাবে অনুপ্রাণিত, অঙ্গনাগণের গাত্রাবরণ জামা সে সাক্ষ্য দিতেছে। বালিকারা কর্ণপত্রের ছিদ্র চতুরঙ্গুলি পরিমিত করিবার জন্য দুইটী করিয়া সীসক চক্র আলম্বিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের নিদ্রাকালে রাত্রি একটার সময় গাড়ি থামিল। চালক "কোকাল" কোকাল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্যাপারটী কিছুতেই আমাদের বোধগম্য করাইতে না পারিয়া সে নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে

কিঞ্চিৎ হিন্দীভাষাভিজ্ঞ এক মুপ্পালা (মুসলমান) বালককে নিম্নোখিত করিয়া সমভিব্যাহারে আনিল। কথাটি এই যে, এ স্থানের নাম কোকাল, এখান হইতে "উড়্ডী" (উড়ুপ) যোগে কুচি যাইতে হয়।

উষার আলোক প্রকাশিত হইলে নদীবক্ষে শতাধিক দ্রোণীর ছবি দৃষ্ট হইল। ইহা দ্বারা কুচি হইতে দ্রব্যজাত আনীত ও প্রেরিত হইয়া থাকে। কুচি ও থিরুবাঙ্কোড়ের বৃটিশ্ রেসিডেণ্ট্ ত্রিচুরে বাস করেন। তদীয় দুইখানি তরণী সজ্জিত রহিয়াছে। টিপু সুলতান মালয়ার আক্রমণ করিলে জিমরিণ্ স্বকীয় তাবৎ বলক্ষয় করিয়া দেশত্যাগ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু কুচিরাজ বলবানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; এ জন্য অদ্যাপি রাজদণ্ড ধারণ করিতেছেন। সকল অবস্থায় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ নহে।

এদেশে সরিতের প্রাচুর্য্য হেতু নদীর বিশেষ নাম নাই। তীরবর্ত্তী স্থানের নামানুসারে প্রবাহের সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আমরা তণ্ডুল ও চিপিটকাদি সংগ্রহ করিয়া কুচি যাত্রা করিলাম; মিষ্টান্নের মধ্যে নারিকেল লড্ডুক পাইয়াছিলাম। তাহা নাজারার নিকট ক্রীত হইয়াছে সন্দেহ হওয়ায় নিক্ষেপ করিতে হইল। সমুদ্র-বেলার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী প্রণালী-পথে দ্রোণী খানি মৃদুমন্দহিল্লোলে বটিভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি শ্যামল ছবিখানির বিস্তার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের পূর্ব্বদিন আহার না হওয়ায় সেদিকে লুব্ধদৃষ্টি নিপতিত হইল না। কোথায় উপযুক্ত ভূমি মিলিবে, এই চিন্তা হইতেছে, এমন কালে অনুকূল বায়ু উপস্থিত হওয়ায় নাবিক পাল তুলিয়া দিল। আমরা অপরিচিত স্থানে যে অজ্ঞাতকুলশীলকে সহায় করিয়া চলিয়াছি, তাহার সহিত ইঙ্গিত ভিন্ন কথোপকথনের উপায় না থাকায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে হইয়াছে। অবশেষে এক "ধানমারি" (নিম্নভূমি)তে অবতরণ করিয়া নারিকেল আম্র পনসের উদ্যানে পাকের আয়োজন করা হইল।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বাঙ্গালার মত। প্রাবৃট্ কালে ভূমি জলমগ্ন হয়; জল অপসৃত হইলে বিবিধ ধান্য বপন হইয়া থাকে, কোনটী সার্দ্ধদ্বিমাসে, কোনটি বা চারি মাসে পক্ব হয়। যাহা যথাসে পরিপক্ব হয়, তাহার শস্য

মঞ্জরীতে চৌদ্দটী, আর যাহা সার্দ্ধ দুই মাসে পাকে, তাহাতে সাতটি বীজ ধান্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক ভূমিতে বৎসরে দুইবার শস্য জন্মে।

আহারান্তে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নারিকেল উদ্যানের শোভা ততই গভীর দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র তটিনীর উভয় পার্শ্বে অবিরল নারিকেল বৃক্ষরাজী অবিরল ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়া নদীগর্ভে আনত হইয়াছে। পশ্চাতে একপংক্তি, তদনন্তর অন্যশ্রেণী চলিয়াছে। নারিকেলাভ্যন্তরে গুবাক আপন অঙ্গ মিশাইয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে। বৈচিত্র বিহীন হইলে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় না, সেই কারণে কৃশ পূগ তরু মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন করতঃ দণ্ডায়মান। নিম্নে আর এক স্তর না দিলে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল হয় না, তাই কদলী শাখা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বাঙ্গালা অপেক্ষা কেরল শ্যামরূপে অধিক পরিমাণে সুন্দর। ইহাতে "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটী সহসা হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল। সুর দিব্য মিলিতেছে, কাশ্মীরের পর এতাদৃশ তৃপ্তিদায়িনী শোভা আর দৃষ্ট হয় নাই। যাহা বারম্বার দর্শন করিতে বাসনা হয়, অথচ নিঃশেষিত হইতেছে না, তাহা কি প্রীতিপ্রদ! নদীকূলে শুষ্ক নারিকেলবৃন্ত বা কেতকীজাতীয় লতার বেড়া গৃহস্থের বাটীর সীমা নির্দ্দেশ করতঃ চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কেতকী ফলের আকার ঠিক আনারস ফল স্তবকের ন্যায়। নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থাপিত বলিয়া গৃহগুলিতে প্রখর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতে পারে না। এই কুঞ্জবনে ইডেন্ উদ্যানস্থ ইভের মত কেরলীগণ বিচরণ করিতেছে।

পত্রবিতান তমসাবৃত হইলে শয়নের আয়োজন হইল। নাবিকদ্বয় বিশ্রাম করিল না। সূর্য্যোদয় হইলে দুগ্ধ আহরণার্থ "পালু" (পয়স্) শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভৃত্যকে গাভীর অন্বেষণ করিতে নিয়োজিত করিলাম। কুত্রচিৎ দুই একখানি তৈলের পণ্যশালা দৃষ্ট হইল, কোন আপণে কদলীগুচ্ছ কনককান্তি বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে নারিকেলবল্কল রজ্জু উপযোগী করিবার জন্য কাষ্ঠতাড়ন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নারিকেলশস্য পেষণার্থ নরচালিত পেষণযন্ত্রখানি তদুপরিস্থ ছদিসমেত ভ্রাম্যমাণ। শিউলী কটিদেশে ভাণ্ড আবদ্ধ করিয়া নারিকেল বৃক্ষারোহণ-পর হইল। গৃহস্থ তস্কর অবরোধের জন্য বৃক্ষগাত্রে কণ্টকের বেষ্টন দিয়াছে। যে বৃক্ষের

ফল আপনি পতিত হইতে পারে, তন্নিয়ে করও প্রস্থাপিত হইয়াছে। এদেশের শ্রী নারিকেলের উপর নির্ভর করে, এজন্য দেশের নাম কেরল। মলয়পর্ব্বত হইতে মলয়ার নাম ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

বেলানগর যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তৈল ও রজ্জুসম্ভার-গৃহের সংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দূরে কতকগুলি খর্পরাচ্ছন্ন বৃহৎ গৃহ, উহাই কুচ্চি বন্দর। পশ্চাৎ সরিৎ হইতে অম্বুধি ও দূরবর্ত্তী গুণবৃক্ষ সমন্বিত বাষ্পীয় অর্ণবপোতের ক্ষুদ্রাবয়ব দৃষ্ট হইল। প্রণালীর আকার এখানে সমুদ্রবৎ।

কোন ভূতত্ত্ববিৎ সমভিব্যাহারে থাকিলে বালুকার স্তর পড়িতে আরম্ভ হইয়া এই দ্বীপ উৎপন্ন হইতে কি পরিমিত কাল অতিবাহিত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতাম। শতবর্ষে ভূমি আড়াই ফীট উচ্চ হয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন, পৃথিবীতে ছয় সহস্র বর্ষ হইল মানব-বসতি হইয়াছে। অধুনা মানবের উৎপত্তি কালের পরিমাণ তিন লক্ষ বৎসর বিবেচিত হইয়া থাকে। মামথ্ মৃগয়াকারী মনুষ্য এক লক্ষ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী জীব।

কুচ্চি বন্দর বোম্বাইবাসী গুজরাটীদের দ্বারা চালিত। কচ্ছ-মাণ্ডুই প্রদেশের হিন্দু ভাটিয়া, মুসলমান খোজা, কোকনস্থ ব্রাহ্মণ ও কোচিনী য়িহুদীতে নগর পরিপূর্ণ। ভাটিয়াগণ আফ্রিকা ও খোজাগণ মরিসস্ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়া থাকেন। জনৈক ভাটিয়া বণিক কহিলেন, তিনি নৌকাযোগে সপ্তবার আফ্রিকাখণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্রের বিনিময়ে গজদন্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইত। বন্য ক্রেতৃগণ কোন প্রকার প্রতারণা করিত না। বোম্বাই হইতে বস্ত্র গৃহীত হইত, তাহার মূল্য ষণ্মাস পশ্চাতে দেয় ছিল। ইদানীং আফ্রিকায় ইউরোপীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত ব্যবসায় রহিত হইয়াছে। যবনান্ন গ্রহণ করিতে হয় না বলিয়া এই গতায়াতে বঙ্গভাচারী বৈষ্ণবদিগের হিন্দুত্ব অব্যাহত রহে। বঙ্গদেশে ইউরোপ যাত্রাকারিগণ যদ্যপি আচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে জাতিচ্যুত হইবেন না। জাতিরক্ষা করিবার উপায় না করিয়া শাস্ত্রার্থ বলে সমুদ্রযাত্রার বৈধতা প্রতিপন্ন করিলে ফল হইবে না।

৯৪ বৎসর পূর্ব্বে বুচানন্ যখন মালয়রে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ১০০০ নারিকেলের মূল্য ১৩৷৷০ টাকা; ১০০০ সুপারি ৵০ আনা; মরিচ এক খন্ডি (খারি) ৮/৭ মূল্য ১২৫৲ টাকা; এলাচ্ এক খারি ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হইত।

১২৯৯ সাল

৩ অগ্রহায়ণ।

	প্রেরণ ব্যয় সমেত কোচিনে ১/০ মোণের মূল্য।	কলিকাতায়।
নারিকেল শস্য	৭৶০	অজ্ঞাত
নারিকেল তৈল	১২/০	১২৲
নারিকেল রজ্জু (স্থূল)	২৸৶০	৪৲
মরিচ	১৬৷৴০	১৫৲
এলাচ	৬৯৸৶০	অজ্ঞাত

কুচ্চি ও কলিকাতার মূল্যের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে না; তবে বাণিজ্যে লভ্য কি? কলিকাতায় কুচ্চি ভিন্ন অন্যত্র হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনীত হয়, এবং কুচ্চি হইতে কলিকাতা ভিন্ন অন্যস্থানে পণ্যসম্ভার গিয়া থাকে; এ কারণ সময় বিশেষে মূল্যের অনুপাত লাভজনক না হইতে পারে। কুচ্চি হইতে যাহারা কলিকাতায় দ্রব্য পাঠান, তাঁহারা টাকা না আনাইয়া তণ্ডুল ও থলে আনাইতে পারেন; ইহাতে কলিকাতায় প্রেরণ-ব্যয়ের উপর যে হুণ্ডীর বাটা ধরা হইয়াছে, তাহার হ্রাস হইবে। কুচ্চিতে ক্রয়কারী যদি অগ্রিম অর্থ দিয়া পণ্য গ্রহণের নিয়মসূত্রে আবদ্ধ থাকেন, হট্ট-মূল্য হইতে অবশ্য সুলভে গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে উপায়ান্তরাভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল বিষয়-তৃষ্ণা থাকিলেই বাণিজ্য হইতে পারে না; আশার সহিত সাবধানতা মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণী শক্তি শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। সকলে গণনা-কুশল হইতে পারেন না।

লোকাদরপ্রিয়তা, এবং আসঙ্গলিপ্সা প্রবল থাকা চাই। নতুবা স্বার্থবাহ অকৃত-কার্য্য হইবেন। গুর্জ্জরনিবাসী বণিক্‌গণ কেরল হইতে শ্বেত এলাফল বাঙ্গালায় লইয়া যান, এজন্য আমরা তাহাকে গুজরাটী এলাচ্ আখ্যা প্রদান করিয়াছি। মলয়ারে এলাচ্ রাজসম্পত্তি; ব্রিটিশ রাজের অহিফেণের ন্যায় সার্ব্বজনিক উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একটি বিভিন্ন পল্লীতে উপনীত হইলাম। জ্যোৎস্না-ময়ী য়িহুদী ললনাকুল গৃহদ্বার ও যবনিকাভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণের গুণে শ্বেত পরিচ্ছদ উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। মার্জ্জিত সুবর্ণের বর্ত্তুল-মালা দিব্য সাজিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দুই একটি পুমান্ দেখা দিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্কের মত য়িহুদীপল্লীতে শ্যামাঙ্গ দেশীয় য়িহুদীর দল রহিয়াছে। কলিকাতায় ইহাদিগকে কোচিনী কহে। শ্বেত ও কৃষ্ণয়িহুদীতে সঙ্কর বিবাহ হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মলয়ারে বাসের জন্য য়িহুদীগণ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট একটি স্থানের সনন্দ পাইয়াছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম এতদুভয় য়িহুদীধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ভাষা মাত্রেই পূর্ব্ব ভাষার সহিত সংস্রব রাখে, তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ছায়া লইয়া গঠিত হয় নাই, অবনীতে এমন কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। হজরৎ মহম্মদ কহিয়াছেন, আমি নূতন কোন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না; ইব্রাহিম যে প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিতেছি। মহম্মদের য়িহুদী এবং খৃষ্টান্‌ভার্য্যা ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের সার বিষয় এক। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব, ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি, শেষ বিচারের দিন ও ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ আস্থা করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে অবস্থিত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবাস-সাহসী "অঞ্জুবর্ণ" (পঞ্চমবর্ণ) জেরুজালেম নিবাসী য়িহুদী, ইয়ুরোপীয় খৃষ্টান্, এবং আরব্য মুসলমানবর্গ কেরলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কুচ্চি নগরের পরপারে আণাকোলমস্থিত রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণ ও বিদ্যা-মন্দিরের সৌধশিখর ইতিপূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; এক্ষণে সাগরপ্রণালী পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে চলিলাম। নিস্তব্ধ রথ্যা প্রশস্ত ও বালুকাময়ী, বৃষ্টিপাতে কর্দ্দমাক্ত হয় নাই। রাজকার্য্য উপলক্ষে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী ব্রাহ্মণগণ

এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। গত রাত্রে রাজমন্ত্রী মতাস্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য আমাদিগকেও কষ্ট পাইতে হইল। জানপদগণ তদীয় অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে ব্যস্ত আছেন। কেরলীরা নিজ বাসভবনে শবদাহ করিয়া থাকেন। "ইল্লোম" (বাস্তু) প্রাঙ্গণের এক অংশ নাগ দেবতা ও অপর অংশ শ্মশানের জন্য রক্ষিত হয়। দ্রাবিড়গণ কহেন, শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড় উপনিবেশী ছিলেন। তদীয় মাতৃ-বিয়োগ হইলে বহনকারীর অভাবে দেহ খণ্ডীভূত করিয়া বহির্দ্দেশস্থ-শ্মশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এতদ্দেশীয় বাটীর নিয়মানুসারে আমাদের বাসগৃহখানি এক নিকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। ভিত্তি খনিজ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, পনস কাষ্ঠের ছাদ, তদুপরি নারিকেলীপর্ণ-বিনির্ম্মিত ছদিবটক অলিন্দস্থ তালস্তম্ভোপরি বিন্যস্ত হইয়াছে। গৃহের উপর পূগ ও নারিকেল বৃক্ষের ছায়া; চতুর্দ্দিকে কদলী, পেঁপে, গোলাপ-জাম প্রভৃতি বৃক্ষ। গোলমরিচের সতেজ লতা বৃক্ষ বেষ্টন করতঃ উত্থিত হইয়া মঞ্জরী বিস্তার করিয়াছে। এখানে তাম্বুলবল্লী ঐ প্রকার বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া উত্থিত হয়। এলা গুল্ম পর্ব্বতোপরি স্নিগ্ধ স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের অঙ্গনে ক্রোটন্, পিন্‌কস্, তুলসী, আনারস ও কচু পত্রিকাদল বিস্তার করিয়াছে; মঞ্চোপরি শিম্বীলতার চন্দ্রাতপ; ইহাতে সূর্য্যকিরণ গৃহাভ্যন্তরে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; তজ্জন্য গৃহগুলি আর্দ্র। বহির্ভাগস্থ পয়ঃ-প্রণালীতে জল নিয়ত আবদ্ধ রহিয়াছে, নির্গমনের পথ নাই।

ছায়াবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর জলে অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণুজীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানা রোগের নিদান হইতেছে। দুই জন শর্ম্মণ্য দেশীয় যুবক নদীজল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যাস্তকালে ২০ বিন্দু জলে ১৬০টী উদ্ভিজ্জাণুজীব পাওয়া যায়। রাত্রিশেষে আলোকবিরহিত অবস্থায় জল বহুক্ষণ অবস্থিত হইলে উক্ত সংখ্যা ত্রিগুণিত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইলে উক্ত জীবাণু সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে। শ্লীপদ রোগকে কোচিনেরা পদ কহে। আমার সহচর এই ব্যাধির বীজ উদ্ভিজ্জাণুজীব সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দেহে নিত্য নূতন ঝিল্লী উৎপন্ন হইয়া পুরাতন ঝিল্লীকে অপসারিত করিয়া দেয়। শোণিত ঝিল্লী নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ। যদি শোণিত যথোপযুক্ত প্রাণবায়ু (অম্লজান) গ্রহণে অক্ষম হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা অবিশুদ্ধ ঝিল্লী গঠিত হইবে। কয়েক বৎসর পরে এমন একটি

রোগ-প্রবণ-দেহ নির্ম্মিত হইয়া যায় যে, সামান্য উদ্দীপক কারণে তাহাতে বিবিধ ব্যাধি আগমন করিয়া আশ্রয় লয়। সঙ্গী মহাশয় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে জ্বরোৎপাদক বাতাবরণে বাস করিয়া শরীরটী রোগ-প্রবণ করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য বাত রোগাক্রান্ত হইলেন।

ত্রিপুনিথুরী এখান হইতে ক্রোশ-চতুর-ব্যবহিত। রাজা তথায় বাস করেন। এক্ষণে সেখানে একপক্ষব্যাপী উৎসব চলিতেছে। আমরা হস্তচালিত ত্রিচক্ররথ-যোগে রাজপুরীতে উপনীত হইলাম। জনপদ ও প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। আমরা শিখাতিলকবিহীন ও অঙ্গরক্ষায় আবৃত দেখিয়া প্রহরী খ্রীষ্টান বোধে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। আর্ণাকোলমে এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তিনি কাশীতে আমাদের বাটীর পার্শ্বে বাস করিতেন। একত্র বিচরণ করিলে, তাঁহার খ্রীষ্টান সংস্পর্শ হইবে, এই অপবাদ ঘটে দেখিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কঞ্চুক উন্মোচন করিলাম, সহচর যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন করাইলেন, কিন্তু দৌবারিক সন্তুষ্ট হইল না; অবশেষে কোন পৌরকে ইংরাজী ভাষায় কষ্ট জ্ঞাপন করা হইল, তিনি প্রহরীর ভ্রম দূর করিয়া দিলেন। পুরমধ্যে এক অযাচিত বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম; তাঁহার ধারণা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত পরিচিত কোন লোক না পাইলে, আমরা পূর্ণত্রয়ীশের সম্মুখীন হইতে পারিব না। কুচিরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিকৃষ্টজাতিসম্ভূত হওয়ায় দেবদর্শন পান নাই। আমাদের হিতৈষী বহু আয়াসে সে প্রকার লোক মিলাইতে না পারিয়া এক বাটীতে প্রবেশ করিলেন। জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেরল ভাষায়াং পরিচয়ো নাস্তি ?" সংস্কৃত ভাষায় উত্তর ও আলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার আমাকে বৈদ্য বলিয়া বিশ্বাস হইল; কিন্তু সমভিব্যাহারে যাইতে সাহসী হইলেন না। তখন আমি দ্রুতপদে পুনর্ব্বার দেবায়তনে প্রবেশ করিলাম। একবার রক্ষীর দিকে নেত্রপাত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে নিষেধ করিল না।

প্রাচীরবেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যস্থলে মলয়ারী প্রণালীর সটুছদী-খর্পর মন্দির বিরাজমান। ইহার গঠন দ্রাবিড় প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাকার তোরণস্থ ক্ষুদ্র গৃহখানি এতদ্দেশের গোপুরম্। মন্দিরের বহির্গাত্রে অবিচ্ছিন্ন দীপাবলির পংক্তি রচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রস্তরের

তৈলাক্ত দ্বারপালচতুর দৃষ্ট হইল। আমরা সাহসে ভর করিয়া একবারে দীপা-বলির মধ্য দিয়া অভ্যন্তর ভাগে জংজীৎ গোপালের সম্মুখে উপনীত হইলাম। এখানে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না ; অসংখ্য দীপ পূর্ণত্রয়ীশের কনক-কান্তি উদ্ভাসিত করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে নিমজ্জিত, শিরে হিরণ্ময় শেষ সপ্তফণা বিস্তার করিয়াছে। যাহাতে অবলীলাক্রমে মূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান না হইতে পারে এই জন্যই বা গর্ভ-গৃহের কপাটদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত। যাহা হউক অদ্য আমার ক্রিয়া সফলা হইয়াছে।

কুসংস্কারের সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয়কারিগণ কহেন, প্রতিমার প্রতি সাধ-কের চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা উহাতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি উৎপাদন করা যায়; অবশেষে তাহার প্রভা বহির্গত হইতে থাকে ; ইহাতে পূর্ব্বে যাহা মৃত্তিকা বা কাষ্ঠমাত্র ছিল, সময়ক্রমে তাহা পরিত্রাতা, গুহ্যশক্তি ও প্রকৃত পূজার যোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এ প্রকারে কিন্তু, শাক্তদিগের পূজার সকল অনু-ষ্ঠান বিজ্ঞানসম্মত করা সুবিধাজনক হইবে না। কামরূপের কোচ রাজা নর-নারায়ণ কামাক্ষ্যাদেবীর ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ১৪০ নরবলিদান করতঃ তাম্রকুণ্ডে মুণ্ডস্থাপন করিয়া দেবীকে উপহার দেন। তদীয় ভ্রাতৃষ্পুত্র রঘুদেব ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে হয়গ্রীবের মন্দির পুনর্গঠন করাইয়া ভূসম্পত্তি প্রদানান্তে ১০০ নরবলি দিয়াছিলেন। ছিন্নমস্তকগুলি তাম্রপাত্রে রক্ষা করিয়া দেবসন্নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে কি আত্মত্যাগের শিক্ষা আছে কহিবেন? বৈষ্ণবগণ বলিপ্রদান অনুষ্ঠানে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিষণগড়ের রাজা সোমযাগ অনুষ্ঠান করিয়া পশুবধ করায়, পরম ভাগবত বল্লভাচারিগণ জৈন ও আর্য্যসমাজীদের সহিত মিলিত হইয়া নরপতিকে উক্ত খেদোচিত কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। জংজীৎ গোপালের মূর্ত্তি বদরিকাশ্রমের নারায়ণের অনুরূপ, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সহিত উভয়স্থানের সংস্রব থাকায় এই সাদৃশ্য ঘটিয়াছে।

অদ্য পর্ব্বাহের তৃতীয় দিবস। প্রাঙ্গণে দেববাহন পঞ্চদশ হস্তী স্বর্ণললাটিকা ও গ্রৈবেয়ক পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান। তদুপরি আস্তরণ বিস্তৃত রাহিয়াছে, তাহাতে ছত্র, চামর, ও ধ্বজধারী উপবিষ্ট। আড়ানীবাহী বালক মধ্যে মধ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া রৌদ্ররোধিনীদ্বয় ধরিতেছে। গজতার মধ্যস্থলে একটি

করিশিরে গোপালের প্রতিনিধি ভোগমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জনতার মধ্যে অসংখ্য ভেরী, তুরী ও সানাই বাদিত হইতেছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ রাজ বাটীর সহিত সংলগ্ন; দ্বিতল প্রকোষ্ঠে পীন উপাধানে আনত হইয়া কুচিরাজ বীর কেরল-বর্ম্মা উপবিষ্ট আছেন। রঙ্গ-বৈচিত্র্যের অভাবে বা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। পরিচ্ছদের মধ্যে কটিদেশে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র, মুণ্ডিত মুখশিরসোপরি পুরশ্চূড় উত্থিত। কিয়দন্তরে দৌবারিক স্বুবর্ণযষ্টিসহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পুরীর অপর দিক্ হইতে, রাজ-পরিবার রঙ্গভূমি নিরীক্ষণ করিতেছেন। মলয়ারিদের বর্ণ ও গঠন বাঙ্গালীর মত। মাদ্রাসীরা ইহাদিগকে অত্যন্ত সুন্দর কহে। রাজপরিবারের বর্ণ অপেক্ষাকৃত গৌর; পরিধেয় নিরতিশয় ধবল, যোষিৎগণের বস্ত্র এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের পাড় ও উত্তরীয় জরির ফুল বিশিষ্ট। এই সাম্যের দেশে কোন কোন সুন্দরীকে পুরুষের ন্যায় উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ব্যবহার করিতে দেখিতেছি। ললাটে কৃষ্ণ তিলক, গলে মণিমুক্তা লম্বন, সুকুমার দেহে বৃহৎ কর্ণিকা, সহ্য হইবার নহে; এজন্য দীর্ঘ কর্ণচ্ছিদ্র রিক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে থিরুবাঙ্কোড়ে হস্তে স্বুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। একটি নিরাভরণা গৌরাঙ্গী সন্তান বক্ষে করতঃ সৌধোপরি হইতে "সজলঘনরুচি কেরলি কেশ পাশ" উন্মুক্ত করিয়া যাত্রা দর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালার ন্যায় এখানে নারিকেল তৈল অভ্যঙ্গ করা রীতি। কেশ আকৃষ্ট করিয়া কবরী বন্ধনের বিধি না থাকায় ইন্দ্রলুপ্তের প্রাদুর্ভাব নাই।

রাজার সংসার ভগ্নী ও ভাগিনেয় দ্বারা গঠিত। পুত্র বা তদীয় জননীকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রাজার ভাগিনেয় যুবরাজ নামে অভিহিত। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা বিবাহ করেন না, রাজ-ভগিনীর বিবাহ আছে। কুচিরাজপরিবারে সবর্ণে ও থিরুবাঙ্কোড় রাজবংশে ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হয়। দিনত্রয়ের অধিক দাম্পত্য-বন্ধন রক্ষা করা অনাবশ্যক। এই বিবাহ পদ্ধতি ভিন্নদেশীয়দিগের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, তদ্দ্বারা কোন প্রকার স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। অনারেবল্ শঙ্কর মেনন্ "মরু মক্ক-ত্তায়ম্" (ভাগিনেয়াধিকার) রহিত করিয়া "মক্কতায়ম্" (পুত্রাধিকার) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটীশ মলয়ারে বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিধানের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া-

ছিলেন; কিন্তু তাহা সমর্থিত না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিকটের জীমরিণ ও নম্বুরীগণ প্রতিবাদ করেন। বিষ্ণু পরশুরাম অবতার পরিগ্রহ করিয়া, নম্বুরী ব্রাহ্মণদিগকে কেরল দান করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহাদের অনভিপ্রেত বিষয় বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। নম্বুরীদের বৈধবিবাহ-প্রথা, সুতরাং পুত্রাধিকার পদ্ধতি আছে; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্তে বিবাহ করিতে পায় না। এজন্ত তদিতরজাতীয় রমণীদিগকে চিরজীবন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিলে অসুবিধা হয়। সর্ব্বত্র দাম্পত্য-নিয়ম লঙ্ঘন করাকে ব্যভিচার কহে, কেরলে দাম্পত্য-নিয়ম পালন করা ব্যভিচার। নারী অনুলোম জাতির সহিত মিলিত হইলে সমাজে পতিতা হন।

তিরুপাট জাতীয় কুচ্চিরাজ ও থিরুবাঙ্কোড়াধিপ আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শেষাদ্রিয়াইয়ার অনুমোদিত থিরুবাঙ্কোড় পঞ্জিকাতে তাঁহাদের শূদ্রত্ব উল্লিখিত হয়। কেরল আলপাথি নামে একখানি মলয়ারি পদ্য-গ্রন্থ আছে। কথিত আছে শঙ্করাচার্য্য তাহার রচয়িতা। উহাতে থিরুবাঙ্কোড় পঞ্জিকার মতের পোষক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

শঙ্করাচার্য্য কেরলের কোল্লম্ অব্দ আরম্ভের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ অঃ ৭৭৫) কালাদি নামক স্থানে নম্বুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আলয়াই নদীর উত্তর তটে, আলয়াই নগরের ৪ ক্রোশ ব্যবধানে কালাদি পল্লী অবস্থিত। শঙ্কর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে শারীরক-ভাষ্য রচনা করতঃ একবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ৩২ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হন। চৈতন্য ৩৮ ও ঈসা ২৮ বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘকাল কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থান করা অনাবশ্যক।

শঙ্কর বেদান্তকে সাম্প্রদায়িক-শাস্ত্রত্ব প্রদান করিয়া স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত দণ্ডিসম্প্রদায় আর্য্যাবর্ত্তে বৈদান্তিক মত ও শাস্ত্র জীবন্ত রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন একত্রিত থাকায় সত্যের সহিত কল্পনা মিশ্রিত করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থান কালে ষড়্ দর্শন সংগৃহীত হইয়াছে; ঈশ্বর-নিরূপণ তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। জগৎ সৃষ্টির কারণ ঈশ্বর হইলে, তাঁহার স্রষ্টা

কে জিজ্ঞাস্য হইবে; তিনি স্বতঃসিদ্ধ কহিলে, আপনি থাকিতে পারে এমন একটি অবস্থা স্বীকার করা হইল। তাহা হইলে সৃষ্টি স্বতঃসিদ্ধ এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। দণ্ডিসম্প্রদায় বৈদান্তিক হইলেও শঙ্করের ন্যায় সাকার উপাসক। ঈশ্বর সাকার নহেন। আকারের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়, এই বলিয়া তাঁহারা স্বীয় অভ্যাস পরিত্যাগের অক্ষমতা সমর্থন করেন। যতিগণ দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস-পথ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে যিনি অধিকতর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল বিষয়ে উদাসীনতা দৃষ্ট হয়।

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতাং
কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

তিনি সুখ দুঃখে অনাসক্ত ও ইষ্টানিষ্টে সমজ্ঞান করেন। স্বয়ং চেষ্টা করিয়া বা নিজ হস্তে ভোজন করিবেন না। যে জাতীয় লোক হউক, মুখে যে খাদ্য তুলিয়া দিবে তাহাই ভোজনীয়। বস্ত্র পরিধান না করাইয়া দিলে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করেন। কাহারও সহিত আলাপ না করিয়া সদা তূষ্ণীম্ভাবে কালযাপন করিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ পরমহংসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নিরাকারবাদীর অভাব নাই। ঈশ্বর নিরাকার নহেন। চেতনাদি মানসিক বৃত্তি সকল শরীরবিযুক্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বিশ্ববীজ বা জগৎ শক্তিকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শক্তি কোন বস্তু নহে, তাহা পদার্থের ক্ষমতা অর্থাৎ "কারণনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদন যোগ্য ধর্ম্ম" মাত্র। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম শব্দে কেহ সেরূপ বুঝেন না, তাহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করেন। এই ব্যক্তিত্ব লইয়া আধুনিক নাস্তিক ও আস্তিকে প্রভেদ।

শঙ্করের মাতৃবংশ পালুর নামক স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আচার্য্যের জন্মভূমি বিধৌতকারিণী আলয়াই নদীর জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া কুচ্চিবেলা নগরে পানার্থ নৌকাযোগে আনীত হইয়া থাকে ও জানপদগণ অবগাহন করিবার জন্য উক্ত নদীতে গমন করেন।

কর্ণাটের চেরবংশীয় রাজার প্রতিনিধিস্বে চেরুমল পেরুমল কেরল শাসন করিতেন। পশ্চাৎ তিনি স্বাধীন হন। ৩১১ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র (বা ভাগিনেয় ?) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুচ্চি রাজ্যের বর্ত্তমান আয় ত্রয়োদশ

লক্ষ টাকা। ধনাগার ব্রিটিশ শিপাহি দ্বারা রক্ষিত। রাজ্যে দুই সহস্র যোধ আছে; কিন্তু ইংরাজের অনুমতি না থাকায় ব্যূহ দলবদ্ধ হইতে পারে না। ভারতেশ্বরীকে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। শাসন কার্য্যে রাজা স্বাধীন। ভূমির পরিমাণ ফল ১৩৬১ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৫৯৮৩৫৩। থিরু-বাঙ্কোড়পতির সহিত কুচ্চিরাজের বহুকাল হইতে প্রতিযোগিতা ছিল। থিরু-বাঙ্কোড়ের দেওয়ান রামআইয়া কহিয়াছিলেন, কুচ্চিকে অন্যান্য বৃত্তিভোগী রাজ্যের তালিকাভুক্ত করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিল। বটেভিয়া নিবাসী ডচদিগের সহিত সন্ধিকালে উভয় রাজ্যে মিত্রতা স্থাপন হয়। জিমরী-ণের সহিত যুদ্ধকালে কুচ্চিপতি শপথ করিয়াছিলেন, "আমি পেরুম্পাদপুস্বরূপম্ বংশীয় রোহিণী নক্ষত্রে জন্মা এই নামধেয় বীরকেরল বর্ম্মা রাজা স্বয়ং শচীন্দ্রমের স-তনুমূর্ত্তির সম্মুখে স্বীকার করিতেছি যে, আমি বা আমার উত্তরাধিকারী ত্রিপাপুরস্বরূপম্ বংশীয় কৃত্তিকা নক্ষত্র জন্ম নামক থিরুবাঙ্কোড়পতি বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত বিরোধ, বা তদীয় শত্রুর সহিত সন্ধি ও পত্র ব্যবহার করিব না।"

দিবাবসানে অর্ণাকোণম্ সাগরতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া একদা দুইটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ লাভ করি। আনন্দের সহিত তৎসমভিব্যাহারে ইউরোপীয় পান্থনিবাসে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। গতবার ভ্রমণকালে বরদায় মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবার রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদককে পাইলাম। রাজপ্রসাদ লাভেচ্ছায় আগমন করিয়া, তাঁহারা উভয়স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডাক বাঙ্গালার সম্মুখে সুদূরব্যাপী হট্টের পথ; পার্শ্বে বিবিধ পণ্যশালা; কচিৎ মলয়ারি খৃষ্টানদিগের ভোগার্থ বংশনালীর ছাঁচে ঢালা তণ্ডুলের পিষ্টক বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। এতদ্দেশে রজক ও নরসুন্দরের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। একখানি বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য এক আনা ও ক্ষৌরকার্য্যের জন্য প্রত্যেককে দেড় আনা দিতে হয়। চোল-মণ্ডল উপকূলের ন্যায় মলয়ার উপকূল সমশীতোষ্ণ প্রদেশ। ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। রাত্রে শয়ন কালে স্থূলবস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় মাত্র।

বাঙ্গালায় বসন্তকালে যে দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে, বাঙ্গালী কবি তাহাকে

মলয়ানিল কহেন। উহাতে কেরলে শীতগ্রীষ্মের সাম্য ব্যক্ত হয়। মলয়ায় স্বায়ত্ত-প্রেমের রাজ্য; বিয়োগবিধুর ব্যক্তি সুতরাং তৎসংস্পর্শে পরিতপ্ত হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! কথিত আছে—

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে্ত্বভোগা

দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশি ভবন্তি।"

কিন্তু আমরা পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, বাল্যবিবাহপরায়ণ, চির-সম্মিলিত দম্পতি কিরূপে সে উগ্রসুখের অধিকারী হইব?

দেশভেদে রুচি বিভিন্ন; তদনুসারে সৌন্দর্য্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এক স্থানে যাহা সুন্দর, অন্যত্র তাহা কদর্য্য বলিয়া পরিগণিত। জীবমিথুন পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সুন্দর হইতে চেষ্টা করে। সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে সহচর দুষ্প্রাপ্য হয়। কেরলিগণ "কল্যাণম্" (বিবাহ) বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতিক যৌননির্ব্বাচন বিসর্জ্জন দেন না; বোধ হয় সেইজন্য তাঁহারা দ্রাবিড় প্রতিবাসী অপেক্ষা সুরূপ। রূপজ মোহ প্রেমনামের যোগ্য না হইলেও প্রেমের নিদান বটে; ইহাতেও অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। গুণজনিত প্রণয় ভিন্ন স্থায়ী স্নেহ জন্মে না, এজন্য রূপলালসাকে পাশব-প্রেম বলে। যুবক উচ্চ আদর্শমত সংসারে গুণের অন্বেষণ করিতে গিয়া অকারণ-দুঃখ রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন। রূপ পুরাতন হয়, গুণের নিত্য নববিকাশ থাকে; কিন্তু সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন উপলব্ধি হইতে থাকে, "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।" উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন সুখের অন্য উপায় নাই; কিন্তু সুবিধা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই পুরুষার্থ, এবং ধরাধামে যোগ্যতর বিষয় বা যোগ্যতর প্রাণী ভিন্ন রক্ষা পাইতে পারে না। মলয়ারিদিগের পক্ষে রূপ গুণ বিবেচনা করিয়া যৌনসম্বন্ধ স্থির করা সুসাধ্য; প্রণয়াস্পদকে ভর্ত্তা হইতে হয় না, প্রেয়সী কেবল সঙ্গিনী মাত্র। হৃদয়ে একটি ভাব প্রবল হইলে তদ্বিপরীত স্থান পায় না। মানবকে ভক্তি, বাৎসল্য বা বৈরাগ্যের চক্ষে দেখা অভ্যাস করিতে পারিলে যৌনভাব সমুপস্থিত হইবে না। অভ্যাসের দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়।

মলয়ার প্রেম-সরোবরে এখনকার কালে গুল্‌জুন-জ্বালা যে নাই এমন নহে। যদৃচ্ছা ভোজন যেমন স্বাস্থ্যকর নহে, তেমনি স্বৈরাচার পরিণামশুভকর নহে।

উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শিক্ষা দেওয়া সমাজের উদ্দেশ্য। লোকের কল্যাণের জন্য সমাজ বা শাসন সৃষ্ট হইয়াছে। যুবতী স্বয়ং "গুণদোষকার" (নায়ক) বরণ করিতে অধিকারিণী নহেন, যুবক বা উভয়পক্ষীয় কর্ত্তার দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। দ্রবিড় সীমান্তস্থ পালঘাট অঞ্চলে নায়ক প্রথম দিন বরযাত্রীর মত আত্মীয় সমভিব্যাহারে "সম্বন্ধকারীর" (নায়িকার) গৃহে "কড়কা কল্যাণম্" (শয্যাবিবাহ) অনুষ্ঠান করিতে গিয়া থাকেন। যুবক বস্ত্র ও তৈল লইয়া উপস্থিত হইলে গৃহস্বামিনী পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করেন। কর্ত্রীর হস্ত হইতে বরবর্ণিনী ঐ দ্রব্য গ্রহণ করিবামাত্র "পোতমরি" ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কেরলের অন্যত্র কে কাহার নায়ক সাধারণে পরিজ্ঞাত থাকে না, ব্রাহ্মণ নায়ক মিলিলে কোন অঙ্গনা অপরকে বরণ করেন না। নায়িকা অন্যের অনুবর্ত্তিনী হইলে পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। নায়ক স্বজাতীয় হইলে প্রণয়িনীর গৃহে নিশাকালে অন্ন গ্রহণ করেন, এবং সম্ভব হইলে অলঙ্কার আদি প্রদান করিতে ত্রুটি করেন না। এতদ্দেশে পূর্ব্বে উচ্চ বর্ণের মধ্যে একাধিক নায়ক নিয়োগের নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড, নায়ার হইলে অস্ত্র গৃহদ্বারে রক্ষা করতঃ প্রবেশ করিতেন, তদ্দৃষ্টে অন্যে গৃহাভ্যন্তরে যাইতে বিরত হইত। অধুনা সে উদ্দালকের রাজ্য নাই, সভ্যতার উদ্রেকে দাম্পত্যধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন বন্যজাতিতে রমণী ব্যক্তিবিশেষের অনুবর্ত্তিনী বলিয়া গণ্য নহে। জন্তুবিশেষ সন্তানোৎপাদন-ঋতুতে বিযুক্তমিথুন হয় না; বানরকে বহুকাল যুগ্মতা রক্ষা করিতে দেখা যায়। কথিত বন্য মানব, সহোদর সহোদরায় মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না, উহাদের সন্তানের পিতা কে নির্ণীত হইবার উপায় নাই। অন্য রমণী সন্তান প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করায়, কদাচিৎ মাতার স্থিরতা হয় না; কেবল সে অমুক জাতীয় ব্যক্তি এইমাত্র তাহার পরিচয়ের স্থল। মাতৃবংশ প্রায়শঃ নিশ্চিত থাকে ও তদনুসারে পরিচিত হয়। কোন বনচর জাতিতে বহুপুরুষসহবাসিনী ললনা অতি সম্মানিতা।

আদিম অবস্থায় মনুষ্য সন্তানের ভরণপোষণে অক্ষম ছিল, এজন্য শিশুহত্যা করিতে হইত। পুত্র জীবন যাত্রায় সাহায্য করিতে পারে, কন্যা কেবল ভার মাত্র; ইহাতে শৈশবে বহু বালিকাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়; অপিচ

কথিত আছে, ভ্রূণ অধিকতর পুষ্ট হইলে কন্যাত্ব লাভ করে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের শারীরযন্ত্রের আধিক্য তাহার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। বোধ হয় সেই কারণে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে কন্যার আধিক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং আদিম কালে পুত্র সন্তানের ভাগ অধিক ছিল। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বহুজন এক নারীতে উপগত হইতে থাকে। নীলগিরিনিবাসী তোডা জাতি ও দ্রাবিড়ের নায়ারদিগের বহুস্বামী প্রথা আছে। তিব্বতীয় লাসা নিবাসিনী একটী মহিলা, ভারতের বহুপত্নী প্রথা শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুপত্যাত্মক মর্য্যাদা কি সুবিধাজনক? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহেন, ভগিনী গৃহের কর্ত্রী ও ভ্রাতৃধনাধিকারিণী। স্বামিগণ তাঁহাকে অতি স্নেহ করেন। যথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনাধিকারী হইতে পারে না, সেখানে পৃথক্ স্ত্রীবরণ করা দুষ্কর। ভ্রাতৃসমবায়ের এক স্ত্রী হইলে ব্যয়লাঘব হয়। কুন্তী ভিক্ষা বণ্টন করিয়া লইতে আজ্ঞা দেন। ভুটানে বহু-স্বামী প্রথা আছে, কয়েক ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক দার পরিগ্রহ করে। নেপালউপত্যকানিবাসিনী নেওয়ার কুমারীকে প্রথমতঃ বিল্ব ও গুবাক ফলের সহিত বিবাহিত হইতে হয়, তদনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে পাঁচটি পর্য্যন্ত পতিবরণ করিতে অধিকারিণী। পত্যন্তর গ্রহণের অভিপ্রায় না থাকিলে, বিল্বফল বারি-মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করা বিধেয়। পূর্ব্বে ইহাদিগের এক সময়ে বহুস্বামী গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। খাসিয়া ও গারো জাতিতে অদ্যাপি উক্ত ব্যবহার অব্যাহত আছে, তজ্জন্য পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কামরূপে পাতিব্রত্যের গৌরব আরম্ভ হয় নাই।

বহুস্বামী প্রথা যেমন অকারণে প্রাদুর্ভূত নহে, বহুস্ত্রী প্রথা তদ্রূপ আবশ্য-কীয় প্রয়োজনে উৎপন্ন। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ভাগ অল্প হইলে, এক নরে বহু নারী উপগত হইবে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। তবে পুংজাতির ক্ষমতাধিক্য প্রযুক্ত বহুপত্নী গ্রহণ কুত্রচিৎ প্রচলিত আছে। সিংহলবাসী বাদিয়া জাতীয় প্রধান লোকের একাধিক সীমন্তিনী না থাকিলে অপমানের বিষয়। বাঙ্গালায় কুমারীদের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করা দুষ্কর হইয়াছে, সুতরাং সমাজ-সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ কি করিয়া প্রচলন করিবেন?

কেরলে "নায়ক" বরণের পূর্ব্বে যে নিষ্ফল বিবাহের অনুকরণ করা হয়,

তাহাকে তালি-বন্ধন কহে; এ পদ্ধতি যজমানের ক্রিয়াবাহুল্য করিবার জন্ত পুরোহিতের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। দ্রাবিড় সধবা উভয় পদের মধ্যমাঙ্গুলিতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ত্রয় ও গলে মালাদ্বয় ধারণ করেন। ঐ মালাকে তালি কহিয়া থাকে, উহার এক গাছি পিতার, অপরটি স্বামী কর্ত্তৃক উদ্বাহকালে প্রদত্ত হয়। বৈষ্ণবের বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শৈবের মালো শিব-চিহ্নাঙ্কিত সুবর্ণ আলম্বন প্রদত্ত থাকে। কেরলি-বিবাহে তজ্জন্য কন্যার গলে তালিসূত্র আবদ্ধ করিতে হয়। বর দিনত্রয় অবস্থান করতঃ বিবাহ পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করেন; তদবধি পাত্রীর সহিত সম্পর্ক রহিত হয়।

জেমরিন্ রাজবংশীয়া কন্যার কোন ব্রাহ্মণের সহিত তালি বন্ধন হইলে পশ্চাৎ অন্য নম্বুরিকে বরণ করিয়া থাকে। নায়ার কুমারী বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে তালিবন্ধন করিবে, তদনন্তর নায়ক স্থিরীকৃত হয়, পুরুষের পক্ষে তালিবন্ধন সংস্কার অনাবশ্যক। কোন নায়ার রমণী তীর্থ ভ্রমণ ব্যতীত, মলয়ার সীমান্তে কোরপুজা নদের পর পারে যাইতে অধিকারিণী নহেন; সেইজন্য "সম্বন্ধকারণের" সহিত বিদেশ যাত্রা করিতে সক্ষম। দ্রাবিড়ে নাট কোট চেট্টীজাতীয়া রমণী ও কাশ্মীরে স্ত্রীজাতি স্বদেশের সীমা অতিক্রম করেন না। মলয়ারি গ্রাম্য শিক্ষক পত্তপত্তর জাতীয়া ননন্দা, বধূর গলে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। ভার্য্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পতিগৃহে বাস করে, পুত্র জন্মিলে বিধবাবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। গ্রহাচার্য্য কনিয়ার ও পণিক্কর জাতিতে ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া এক নারী গ্রহণ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার প্রভৃতি জাতিতে বহুস্বামী প্রথা আছে। নারিকেলি-আসব ব্যবসায়ী থিয়ার জাতি, এখানকার প্রথম উপনিবেশী। তাহাদের দম্পতীকে জীবন-সংগ্রামে একত্র থাকিতে হয় না। আতিপুরের থিয়ার ভ্রাতৃগণ এক স্ত্রী মনোনীত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মিলিত হয়।

মলয়ার স্বাধীন প্রেমের দেশ বলিয়া সন্তান পোষণের ভার মাতার উপর ন্যস্ত থাকে, তজ্জন্য ধনের উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে সাম্যনীতি প্রচলিত। "তারায়াদ" (একান্নবর্ত্তী পরিবার) মধ্যস্থ কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পারিবারিক সাধারণ ধনের সহিত মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পত্তির বণ্টন নাই। স্বোপার্জ্জিত বা পৃথকীকৃত ধনের দান বিক্রয়

নিষিদ্ধ নহে। পরিবারস্থ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা নারী "কর্ণবল্" (কর্ত্তা) হইয়া ক্ষমতা সঞ্চালন করেন। তাঁহার আচরণ গর্হিত হইলে পরিবারস্থ লোকে অপরকে অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারে। কর্ত্তা দায়াদগণের সম্মতিক্রমে স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে অধিকারী। তিনি স্বকীয় প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিলে পারিবারিক বিষয় তজ্জন্য দায়ী নহে। মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য ভাগিনেয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্বস্ত্রীয় পরিচয় স্থলে মাতুলের নাম লয়, কাহারও ভগিনীর অভাব হইলে দত্তক ভগিনী গ্রহণ করিবে। সমৃদ্ধ পরিবারে আবশ্যক হইলে, সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য সেই সঙ্গে একটি বালককেও দত্তক গ্রহণের রীতি আছে। পুত্রের ন্যায় কন্যা মাতার এক উদরে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য সে পরিবারের মধ্যে স্থান পাইতে অধিকারিণী। মলয়ারে ভগ্নী অতি আদরণীয়া ও তদীয় সন্ততি যত্নের সহিত প্রতিপালনীয়; অতএব স্বস্ত্রীয় উত্তরাধিকারী পদবাচ্য; তজ্জন্য রাজপরিবারে ভাগিনেয় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজভ্রাতা বা পরিবারস্থ অপর কেহ ভাগিনেয় অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিলে, "তারবাদ" নিয়মানুসারে তিনি রাজ্য অধিকার করেন।

কেরলের দায়ভাগ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। এই বিষয় কেবল পরম্পরাগত ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্ধ্র, কর্ণাট ও দ্রবিড়ে তিনখানি স্মৃতি প্রচলিত। ১ম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা; ২য়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্যের রচিত পরাশরমাধব্য নামক পরাশর সংহিতার টীকা; ৩য়, উক্ত শতাব্দীর বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্র কৃত স্বরস্বতী বিলাস।' ইহাতে কেরল দায়াধিকার নিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে দেশাচার নিয়মিত করা যায় না, দেশাচারকে আদর্শ করিয়া স্মৃতি রচিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাইলে স্মার্ত্তগণ শ্রুতি কল্পনা করেন; তজ্জন্য মিথ্যাবাদ অপকর্ম্ম বিবেচিত হয় না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বমত স্থাপনের জন্য বহু প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক কি না কেহ অনুসন্ধান করেন না। সভাস্থলে বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বপক্ষ ও অধ্যাপকেরা উত্তর পক্ষ গ্রহণ করেন। সত্যনির্ণয়, বিচারের উদ্দেশ্য না হইয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা অভিপ্রেত বিষয় হইয়া থাকে। নবদ্বীপের কুশদহ সমাজান্তর্গত ইছাপুর নিবাসী কোন স্মার্ত্ত কাশীধামে অধ্যাপনা কালে কহিয়াছিলেন যে, তিনি

যৌবনকালে এক গ্রাম্যীয় সভায় মত বিশেষ স্থাপন কালে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করতঃ তদুপযোগী একটি শ্লোক রচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের একটি পত্র পরিবর্ত্তিত করতঃ, উক্ত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত করেন, সেই পত্রের নবীনত্ব অপনোদনের জন্য গোময়ের মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল; পর দিন সভাস্থলে তৎপ্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিলেন। স্বাধীন মত সাধারণে গৃহীত হইবে না বলিয়া শাস্ত্রীয় টীকাকার আপন উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া মূল-গ্রন্থ ব্যাখ্যা করেন; উহা অধিকতর উপযোগী হয়, ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা মিতাক্ষরা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মলয়ারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনভ্যস্ত বলিয়া কেরল গার্হস্থ্য প্রণালী শাস্ত্রীয়তা প্রাপ্ত হয় নাই। মলয়ারে যখন নব ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, কালক্রমে ভাগিনেয়াধিকার সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইবে। পয়ন্থুর গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণবংশে "মরুমক্কত্তয়ম্" (ভাগিনেয়ের দায়াদত্ব) প্রচলিত।

পূর্ব্বকালে কেরলে ভূসত্ব সম্বন্ধে উদার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ভূমি সমাজের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। পর্য্যায়ক্রমে শস্যবপন প্রথা ও সাময়িক বিভাগের নিয়ম অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। পশ্বাদি জীবকেও পরস্পর সাহায্য করিতে দেখা যায়; মানব মণ্ডলীতে সহায়তার জন্যই সমাজের উৎপত্তি। জন্ম গুণে বা ঘটনা পরম্পরার আনুকূল্যে কেহ বিপুল ধনাধিকারী ও অপরে অন্না-ভাবে ক্লিষ্ট হইবে, ইহা সমাজনীতি বিরুদ্ধ হওয়া উচিত। ভরণ পোষণের অতি-রিক্ত সম্পদে সাধারণের স্বত্ব আছে। ইউরোপ সার্ব্বজনিক সমৃদ্ধিপ্রিয়তার জন্য বন্য। সে কালে ইউরোপ খণ্ডে সাধারণের জন্য বাণিজ্য হইত। ব্যবসায়ের উপযোগিতা এই যে প্রকৃতির কল্যাণে স্থান বিশেষে কোন দ্রব্য সুলভে উৎ-পন্ন হইয়া, অন্যত্র অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ করিয়া দিলেও তত্রত্য লোকের সুবিধা থাকে, সেই সুবিধার মূল্যকে লভ্য কহা যায়। এই লভ্য ইউরোপে জানপদ-গণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তদুপলক্ষে গ্রামান্তরবাসী সার্থবাহ আসিলে পৌরগণের অতিথিরূপে পরিগণিত হইতেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অধুনাতন ইউরোপীয় শ্রমজীবিদলের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, বণিক্ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, সাম্রাজ্য কর্ত্তৃক বাণিজ্য পরিচালিত হউক। তাহারা শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, সাম্রাজ্যের রাজকোষ তাহাদের ভরণ পোষণ

নির্ব্বাহ করিবে। যে আলস্য বশতঃ কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। পাশ্চাত্য সমাজ সাধারণতাপ্রবণ বলিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্ভূয়সমুত্থানের প্রাবল্য দেখা যায়। আমরা পরার্থপরতায় যে স্বকীয় হিত আছে, তাহা না বুঝায় সমবেত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই।

নব উপার্জ্জিত স্থানে উপনিবেশিগণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে, তাহারা সে অবস্থায় সকলেই সমকক্ষ; ইহাতে যোদ্ধৃতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ করিবার অগ্রে মলয়ার প্রদেশে সর্ব্বাঙ্গীন যোদ্ধৃশাসন প্রচলিত হইয়াছিল। কয়েকখানি "দেশম্" (গ্রাম) এক "দেশবলীর" অধীন থাকিত। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া "নাদ" গঠিত হইত, সেগুলি যাঁহার অধীন তিনি "নাদবলী" বা স্থানীয় নিয়ন্তা, তিনি "কোবিলগম্"এর (রাজার) অধীন ছিলেন। উত্তরাধিকারিবিহীন ভূমি, ভোগস্ব ভূমি, দ্রব্যজাত ও বিদেশীদের নিকট শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতির আয় হইতে "কোবিলগম্" অর্থ সংগ্রহ করিয়া কর্ণাটের চের সম্রাটকে প্রদান করিতেন। এই কর সংগ্রাহক রাজা জনসমাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ও তদধীনে কার্য্যকারক ছিলেন।

তৎকালে শূদ্রদিগের যে পল্লীসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা "তর" নামে অভিহিত। ভূমির সাধারণ অধিকার তদধীন ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উক্ত সংসদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে "কুত্তং" (সভা) আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য আলোচনা করিতে হইত, কালে রাজা পরাক্রান্ত হইলে তিনি পল্লীসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেন; ইহাতে সামাজিক বল হীনপ্রভ হইয়া পড়িত। ইদানীং পূর্ব্বতন পল্লীসমাজ একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরিজনতন্ত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যে পল্লীসমাজের অস্তিত্ব ছিল, মণ্ডলপতি, কোষ্ঠপাল ও পট্টলেখকের পদ দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইবে।

মলয়ারে ভূমির সাধারণ স্বামিত্ব, মহান্ গ্রামসত্ব হইতে সংকীর্ণ পারিবারিক সত্বে উপনীত হইলে পর, ব্যবহারিক বিষয়গুলি সামন্তবর্গের অধীন করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। ইহাতে রাজা ও স্থানীয় নিয়ন্তাদিগের সহিত জনসমাজের ভোগস্ব সম্পর্ক উদ্ভূত হয়। পরিজনতন্ত্র সম্পত্তির উপর প্রাদেশিক নিয়ন্তা ব্যক্তিগত সত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহার ফলে সংগ্রামের সময় সেনাপতিকে যে অর্থ সাহায্য করিতে হইত, ক্রমে তাহা ভূমির কর হইয়া দাঁড়াইল। দেবস্ব

ভূমির কৃষক ও ব্রাহ্মণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে ক্ষতি রহিল না। কর-সংগ্রাহক ও শাসনকর্ত্তা ভূম্যধিকারিত্ব লাভ করিলেন। নায়ারগণ প্রজারূপে পরিগণিত হইল; তদবধি তাহারা স্থায়িসত্ত্ববান হইয়াছে। যতকাল ভূমির উৎকর্ষ সাধনে বিরত না হয় ও কর প্রদানে সক্ষম থাকে, তদীয় স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে।

বৃটিশ মলয়ারে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের ন্যায় ভূম্যধিকারীর সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী নিয়ম হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রজার অধিকার বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইতেছেন। "বেরুম্ পাট্টাম্" সত্ত্বের প্রজা, শস্য উৎপাদনের ব্যয় গ্রহণ করতঃ উৎপন্ন সামগ্রী ভূম্যধিকারীকে দিয়া থাকেন। ভূম্যধিকারী প্রায়শঃ উৎপন্ন বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া কৃষকের নিকট একতৃতীয়াংশ অর্থ গ্রহণ করেন। "কানম্ পাট্টম্" প্রজা ভূস্বামীর নিকট কিঞ্চিৎ ধন বা ধান্য গচ্ছিত রাখিয়া অনধিক দ্বাদশ বৎসরের জন্য ভূমি গ্রহণ করে। তাহারা উৎপাদন ব্যয় ও বীজের মূল্য বিয়োগ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ ভূম্যধিকারীকে প্রদান করে, এবং স্বীয় গচ্ছিত অর্থের কুসীদ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ভূমির উপস্বত্ব আধ মণ রক্ষা করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহা "তট্টি" নামে অভিহিত, এই অর্থ ব্যবহারে কলাবৃদ্ধি নাই। ভূমি বিক্রীত হইলে উত্তমর্ণ সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিতে অধিকারী। হস্তান্তর করণের উপরিউক্ত বিধিত্রয়ের কোনটি অগ্রে অবলম্বিত না হইয়া বৃটিশ কেরলে ভূমি বিক্রয় হয় না। পুরস্কার বা কোন কার্য্যের বেতন স্বরূপ চিরস্থায়ী স্বত্বে যে ভূমি প্রদত্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে দাতা পুনঃপ্রাপ্ত হন। দেবস্ব সম্পত্তি পূর্ব্বে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, ইংরাজ রাজশক্তি গ্রহণ করিলে, তদধীন হইয়াছে। কচ্চি বৃটিশ মলয়ার ভুক্ত নহে, অত্রত্য ভূসত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

আমরা সুদূর ভারত সীমান্তে সাম্যের বিবিধ আকার পরিদর্শন করতঃ অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিতেছি। সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্য মাত্রে সমান। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সম্পত্তির অধিকারিত্বে তাবৎ লোক সমভাবাপন্ন। সভ্যতা বৃদ্ধি হইলে বৈষম্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনিষ্ট দেখিলে বন্যাবস্থা প্রীতিপদ বিবেচিত হইয়া থাকে। কখনও সাম্য,

কদাচিৎ বৈষম্য উন্নতিজনক। সাম্যের অবস্থায় বৈষম্য, এবং বৈষম্যের অবস্থায় সাম্যের জন্য আন্দোলন হয়।

আমরা দিনত্রয়ের ভোজ্য সংগ্রহ করিয়া ডোঙ্গাযোগে থিরুবাঙ্কোড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অম্বুধি হইতে প্রণালীর দূরতা বৃদ্ধি সহকারে জলের লবণাক্ততা হ্রাস হইতেছে। যে স্থলে মলয়পর্ব্বতনিঃসৃতা স্রোতস্বিনী সঙ্গম হইয়াছে সে জল সুমিষ্ট। আমরা এক বিশাল হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে দিনমণি মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। জলের সহিত গগন ও দিগ্বলয়ের সহিত নারিকেল বৃক্ষরাজী মিলিত হইয়া খ-গোল ও ভূ-গোলকে একত্রিত করতঃ অপূর্ব্বদর্শন হইয়াছে। আমরা একটি শ্যামল ব্রহ্মাণ্ডে যেন অণ্ডের মধ্যে ভাসিতেছি, কিম্বা গোলোকধাম সদৃশ গোলকে স্বশরীরে আরোহণ করিয়াছি। সমুদ্র নাতিদূরে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎকার নাই; রজনীতে গর্জ্জন শ্রুত হয়, মধ্যে সংকীর্ণ ভূভাগের ব্যবধান। থিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের পথ নির্দ্দেশক আলোকস্তম্ভ জলে প্রোথিত রহিয়াছে। আমাদের সহিত মাদকদ্রব্য আছে কি না শৌল্কিক কর্ত্তৃক বারদ্বয় পরীক্ষিত হইল। প্রাতঃকালে নারিকেলরজ্জু-ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলপালি নগরের উপকণ্ঠে উত্তীর্ণ হইলাম। পথ তটে কয়েকখানি বন্ধদ্বার ক্রয়শালা দৃষ্ট হইতেছে। পরদিন কোল্লম জনপদে তরণী প্রবিষ্ট হইল। সম্মুখে রজ্জু বা তৈল প্রস্তুতের জন্য আনীত বাষ্পীয় যন্ত্র অযত্নে স্থাপিত রহিয়াছে। ধান্য বিক্রেতার গৃহে কৃষ্ণাব্রীহিস্তূপ ও নৌকাপংক্তি প্রস্তুত। ক্ষুদ্র নৌকাবাহীগণ যাতায়াতে নিরত আছে। মাতা ও তরুণী কন্যা তরণী বাহিতেছে। উন্নত বক্ষোরুহ বিমুক্ত রাখিয়া উত্তরীয় বসন শিরোভাগ হইতে তদীয় পৃষ্ঠে লম্বমান্ হইয়াছে।

অন্য এক স্থানে অন্নপান সংগ্রহের জন্য নাবিকদ্বয় উড়ুপ রক্ষা করিল। উচ্চ তটে নানাজাতীয় বৃক্ষ আতপতাপ দূর করিবার জন্য দণ্ডায়মান। তন্নিম্নে শ্বেত, পীত ও লোহিত পুষ্পাচ্ছন্ন গুল্ম শয্যা। অবসর পাইয়া উপরিভাগে গমন করতঃ, একটি প্রাচীন দেবালয় দর্শন করিয়া আসিলাম। দেবমন্দির গ্রামের শোভা বৃদ্ধিকারক; এতদ্দেশে নব বসতি স্থাপন করিতে হইলে, তথায় একটি দেবায়তন নির্ম্মাণ করা প্রয়োজনীয়। স্থান বিশেষে দেবালয়, চিকিৎসালয়ের উপযোগিতা ধারণ করিয়া থাকে।

মনের একাগ্রতায় অবশ্য পীড়া আরোগ্য হইতে পারে, একাগ্রতা দ্বারা তাবৎ শরীরযন্ত্র উত্তেজিত হয়। মলয়ারে নীচজাতীয় লোক ভেরী ধ্বনি করতঃ অপদেবতাকে দূর করিতে চেষ্টা পায়। তাহাতে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। সিংহলের বাদিয়া জাতি ঔষধ ব্যবহার করে না, দৈবজ্ঞের সাহায্যে পীড়ার প্রতিকার করে। বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্য লাভ অসম্ভাবিত নহে, আহ্লাদ বা শোক সংবাদ মিথ্যা হইলেও তদ্দ্বারা চিত্তবিকার সাধিত হইয়া শরীরের ভাবান্তর উপস্থিত করিবে। তারকেশ্বরে "ধন্না" দিয়া বা তাঁহার জন্য মানসিক ব্রত গ্রহণ করিলে, যাহার শরীরে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সে নিরোগী হইতে পারে। বিশ্বাসে দৈহিক ব্যাধি উপশমিত হয়, কিন্তু যান্ত্রিক পীড়া প্রতিকার লাভ করে না। বাত ও পক্ষাঘাত তদ্দ্বারা অতি চমৎকাররূপে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। মানসিক উত্তেজনা দৈহিক শক্তির উপরে বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ষণ্ড আক্রমণ করিলে পঙ্গুর পক্ষে দ্রুতবেগে পলায়ন অসম্ভব হইবে না। অঙ্গারের গতি অর্থাৎ সঞ্চালন বৃদ্ধি পাইয়া যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্কের গতি প্রভাবে তদ্রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে, সুতরাং চৈতন্য ও জড় এক প্রকার ব্যাপারের বিভিন্ন অবস্থা, কিন্তু সেই গতি ব্যাপার কিসে উদ্ভূত হয় তৎসম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ।

গোধূলিকালে একটি তড়াগ প্রাপ্ত হইলাম। সমুদ্র তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আপনার উত্তাল সফেণ তরঙ্গ লইয়া আগমন করিতেছে। কিন্তু তরঙ্গমালার প্রতি নবমটি, উচ্চতা ও প্রসারে দীর্ঘ হওয়ায়, প্রবেশ দ্বার অপেক্ষা তদীয় আয়তন বৃহত্তর বলিয়া আহত হইয়া যেন প্রতিগমন করিতেছে। সুদূরে অর্ণবযানের দুই চারিখানি গুণ বৃক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছে। হ্রদবক্ষে এক খানি সমুদ্রগামী নৌকা অবস্থিত আছে। এক পল্লী হইতে অন্য পল্লী গমন করিতে হইলে নৌকার সাহায্য গ্রহণীয়। আমরা কি পুনর্ব্বার কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইলাম? "অঙ্কার" হ্রদোপম জলোপরি বীরণ বন, নলিনী দল ও কহ্লার দলিত করিয়া চলিয়াছে। আমার কাশ্মীর-সহায় এবার সমভিব্যাহারে নাই, এ সাদৃশ্য তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না তজ্জন্য দুঃখ রহিল। প্রমোদ তরীবাহী নম্রাঙ্গী সুশ্রী যুবকগণ সমপ্রকৃতিক ও বিশ্রামদায়ক সুরে গান করতঃ অতি দ্রুত ক্ষেপনী সঞ্চালন করিয়া গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। রাত্রিতে পাতাল

পুরীতে আমাদের নৌকা উত্তীর্ণ হইল। সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখি সুড়ঙ্গ মধ্যে দীপালোক প্রজ্বলিত, খিলানের পার্শ্বে অজস্রধারে ও ঊর্দ্ধ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি নির্গত হইতেছে। এ যেন বরুণলোক। পথের দূরতা হ্রাস করিবার জন্য বহুস্থানে কৃত্রিম প্রণালী প্রস্তুত করিয়া প্রাকৃতিক সমুদ্র প্রণালীর সহিত মিলিত করিতে হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে এখানে ইষ্টউইক্ সাহেবের ভ্রমণ পথ নির্দ্দেশক পুস্তক রচনার পরে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

যথারীতি রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরূপি নারিকেল বৃক্ষ পরম্পরা দর্শন দিল। কতকগুলির আকার নিতান্ত হ্রস্ব, বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ফল স্পর্শ করা যায়। উহার ফল তেমনি ক্ষুদ্রাকার ও কোনটি রক্তবর্ণ। যে স্থানে মৃত্তিকা আঁঠাল, তথায় বৃক্ষমূলে বালুকা প্রদান করা হইয়াছে। দীর্ঘবৃক্ষে আরোহণ সৌকর্য্যের জন্য বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া পাদপীঠ করিয়াছে।

বৈশাখ মাসে "পরুম" (বৃক্ষবাটিকা) ঘেরিয়া তন্মধ্যে দশ হস্ত অন্তর করিয়া দেড় হস্ত গভীর ও সেই পরিমিত প্রশস্ত গর্ত্ত খনন করিয়া অভ্যন্তর দেশে একটি ছিদ্র করতঃ নারিকেল চারা, লবণ ও ভস্ম সংযোগে রোপিত হয়। মূলে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রদান করিয়া অল্প জল নিষিক্ত করিবে। গর্ত্তের চতুর্দ্দিক্ কণ্টকাবৃত করা আবশ্যক। ২১দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার বারিসেক বিধেয়, তৎপরে তিন বৎসর কাল দুইদিন অন্তর একবার করিয়া জল দিলেই হইল। প্রতি মাসে একবার মূলে ভস্ম প্রদান কর্ত্তব্য। তৃতীয় বর্ষে আষাঢ় মাসে মূলের দেড় হস্ত ব্যবধান রাখিয়া একহস্ত গভীর খাত করিবে। ইহাতে প্রাবিট্‌কালে তরুণ তরু সন্নিকটে বারি সঞ্চিত রহে। বর্ষাপগমে কার্ত্তিক মাসে উদ্যান কর্ষণ করতঃ খাত সমতল করিতে হয়। তদনন্তর প্রতিবর্ষে বর্ষাগমের পূর্ব্বে পুনঃ খাত উৎপাদন, অপিচ বৃক্ষমূলে একঝুড়ি ভস্ম প্রদান কর্ত্তব্য। উদ্যানাধিকারীর গবাদি পশু সম্বৎসর কালের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষিত ও বৃক্ষ বাটিকায় উদ্ভূত তৃণশষ্প চৈত্রমাসে দগ্ধ করিবার প্রথা থাকায় সার প্রদানের উপকারিতা সুসিদ্ধ হয়।

এবার আমরা যে কুল্যায় প্রবেশ করিয়াছি তাহার দৃশ্য বিভিন্ন। উভয় পার্শ্বে প্রহরীবৎ দণ্ডায়মান বৃক্ষশ্রেণী ফলভার লইয়া নিবিড় বন রচনা করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেতকী সদৃশ বৃক্ষে আনারসের মত ফলস্তবক আলম্বিত ;

লবণের অভাব বশতঃ ভৃত্য তটে অবতরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সেই দ্রব্য ও পয়সা দেখাইল। এখানে তাবা অকর্ম্মণ্য। পণ্য-জীবির ইঙ্গিতে বুঝিলাম এ পয়সা চলিবে না। বৃটনেশ্বরীর নাম যাহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে তাহা অচল হয়, এই প্রথম দেখিলাম। যত অগ্রসর হওয়া যায় অরণ্য ক্রমে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে। অগ্রে ক্ষুদ্র, পরে নাতিদীর্ঘ, তৎপশ্চাৎ উচ্চ বনতরু তট সমাচ্ছন্ন করিয়া উত্থিত। তদনন্তর উচ্চ বালুকাময় প্রান্তরের আরম্ভস্থান গুল্ম ও সৌরভপূর্ণ কুসুম বৃক্ষে পরিপূর্ণ। মধ্যাহ্নকৃত্যাভিলাষে উত্থিত হইয়া দেখিলাম অদূরে মলয়গিরি কিম্বা গন্ধমাদন মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মরীচিমালা বিশাল সৈকত ভূমিকে উগ্রভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কদাচিৎ রৌদ্র ভেদ করিয়া বনচরদিগের কুটীর হইতে ধূম উত্থিত হইয়া বসতি নির্দ্দেশ করিতেছে। স্রোতবিহীনা তটিনী এক নিপতিত প্রশস্ত, সরল ও অতি দীর্ঘ দর্পণের প্রথবৎ প্রতিভাত হইতেছে। আমরা ভিন্ন সে পথে অন্য পথিক নাই। জল স্থল সমান নিস্তব্ধ। বিহঙ্গম পল্লবের ছায়ায় আসীন হইয়া কুজন করিতেছে। শব্দের মধ্যে অস্মদীয় নৌচালকের দণ্ড-নিক্ষেপ ধ্বনি, লয় সংযুক্ত শ্রুত হইতেছে। নাবিক রাত্রিতে নৌচালনায় অনিদ্রিত ছিল, অধুনা মাধ্যন্দিন আতপকালে পর্য্যুষিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া তাম্বুল সেবন করতঃ ক্ষেপনী সঞ্চালন স্থানে নারিকেলপত্রের চাল খানি টানিয়া দিয়া কোচিনের প্রসিদ্ধ স্থূল পাদবিস্তৃত করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। তদীয় পুত্র মীরণ্ণার হস্তে এখন তরী সঞ্চালনের ভার। ইহারাও এই নৌকায় রন্ধন করে। বহির্দ্দেশ হইতে লঙ্কা, হরিদ্রা ও নারিকেল শাঁস একত্রে পেষণ করিয়া আনয়ন করতঃ গলদা চিংড়ীর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কুঞ্চস্থালিতে অন্ন ভোজন করে। কাঞ্জিক মিশ্রিত ভাত ব্যবহার করিবার সময় দারুহস্তক সহকারে অন্ন উত্তোলন করে। নৌচালনে ক্লান্ত হইলে এক চুমুক কাঁজি খাইয়া সঞ্জীবিত হয়। অপরাহ্নে যে স্থানে দৃষ্ট হইল খাল শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটি অনন্ত শয়ন বা ত্রিকবাঙ্কোড়ের রাজধানী ত্রিবন্দরম্। তৎপর ঘট্টচত্বরে অবতরণ করা গেল।

বেঙ্কট্রাওকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কোটগুল্মক বিশিষ্ট রাজপুরীর প্রাচীর সন্নিকটে, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ উপনিবেশিবর্গের পল্লীতে, রাজকীয় পান্থনিবাসে উপনীত হইলাম।

এক্ষণে যাঁহারা মলয়ারি, কাল বিশেষে তাঁহারাও উপনিবেশী ছিলেন। পোলিয়ার জাতি এতদ্দেশের আদিম নিবাসী, তাহারা ব্যবসায়ে "শূদ্রম"। ব্রাহ্মণের বাটিতে পুরুষানুক্রমে—দাসত্ব করিয়া থাকে। চেরুমার প্রভৃতি আর কয়েকটি আদিম জাতি পশুচারণ করিয়া দিনাতিপাত করে। পিয়ার প্রভৃতি প্রথমে, তদনন্তর নায়ার এবং সর্ব্বশেষে নম্বুরীগণ কেরলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ তদিতর জাতিকে শূদ্র জ্ঞান করিতেন, কিন্তু যাহারা বাহুবলের সহিত জ্ঞান ও ধনবল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকে অচির কালমধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেণীরূপে গ্রহণ করিতে হইল।

কেরল নায়ার-প্রধান দেশ। জনসংখ্যা সাত লক্ষ। তাহাদের পক্ষে আমিষভোজন ও বারুণীসেবন নিষিদ্ধ নহে।

দ্রবিড়-ভূমি হইতে নায়েক উপপদধারী, বর্ত্তমান বণিয়ার জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ মলয় প্রদেশে আগমন করিয়া নায়ার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। নায়ার অর্থে নারীপর্য্যায়। তাহারা যোদ্ধৃতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়া সুজলা সুফলা মলয়া ভোগ করিতে থাকে। এক্ষণে কেহ কেহ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। ত্রিবান্দ্রম অনন্তপুরের রাজপথে একদল নায়ার সেনাকে রণবাদ্যোদ্যমসহকারে ধ্বজদণ্ড অগ্রে করিয়া অভিযান করিতে দেখিয়াছি। ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, বঙ্গে কোন স্বতন্ত্র প্রাচীন রাজ্য বর্ত্তমান থাকিলে মৎস্যান্নভোজী বাঙ্গালীও তক্রান্নভুক্ তিলঙ্গা অপেক্ষা রণবিদ্যাভ্যাসে অপটু হইত না।

সমস্ত মালয়ালি ব্রাহ্মণের আচার একবিধ। ব্রাহ্মণের মধ্যে নম্বুরীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শূদ্রযাজী ভিন্ন অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে নম্বুরী পুরুষের আপত্তি নাই। রমণীদিগের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু সূতিকাগারে নায়ার-রমণী কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন গ্রহণ করিলে ইঁহাদিগের শুদ্ধাচার ভ্রষ্ট হয় না। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ গোল আলু ভক্ষণ করিলেও, ব্রাহ্মণী তদ্ভোজনে বিরত থাকেন।

নম্বুরীগণ চতুঃষষ্টিপ্রকার আচারশৃঙ্খলে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা স্নান করিতে বাধ্য হন। নম্বুরীদিগের পক্ষে অপর

শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করা নিষিদ্ধ। শিব ও বিষ্ণু উভয় দেবতার উপাসনাও এক ব্যক্তির করা অকর্ত্তব্য। পর্য্যুসিত জল ও অন্ন ইঁহাদিগের অব্যবহার্য্য। নক্ষত্র-অনুসারে ইঁহারা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

নম্বুরীগণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া বেলা এগারটা পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তৈলাভ্যঙ্গসহকারে স্নান করিয়া দেবস্থানে গমন করেন। রাত্রি নয় ঘটিকার পর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে সুখ অনুভব করেন। দেবালয়ে অবস্থানকালে উপাসনা ও অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক কার্য্যের জন্য অপরাহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। মধ্যাহ্নে তাঁহারা কিঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন।

বয়ঃস্থা না হইলে কন্যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয় না। সকল পুরুষের বিবাহ করিবার অধিকার না থাকায়, বহু মহিলাকে অনূঢ়া বা সপত্নীবেষ্টিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। অগ্রজ নিঃসন্তান না হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারেন না। পারিবারিক ধন এ দেশে অবিভাজ্য, সুতরাং সকলের পক্ষে বিবাহ শ্রেয়স্কর নহে। বেদব্যাসস্মৃতি নামে খ্যাত "অশৌচপ্রায়শ্চিত্তম্" অনুসারে ধর্ম্মাধিকরণে পূর্ব্বে বিচার হইত। স্বজাতির মধ্যে ব্যভিচার, অখাদ্যভোজন বা নরহত্যাজনিত পাপে রাষ্ট্র হইতে তাড়িত ও সমাজচ্যুত হইলে, মুসলমান হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতেন; এখন সে অবস্থায় খৃষ্টান হইয়া পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। অদ্যাপি শাস্ত্র ও সদাচার লইয়া কালাতিপাত করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। নগরে বাস করিলে শুদ্ধাচারিতার ব্যাঘাত হইবে বিবেচনা করিয়া, গ্রামাভ্যন্তরে বসতি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। টিপু সুলতান তাম্বুরী রাজ্য গ্রাস করিলে ইঁহারা কালিকট প্রদেশ হইতে পলায়নপর হইয়াছিলেন। ইংরেজাধিকারে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, ইঁহারা পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এই শুদ্ধাচারিগণ রজকালয়াগত বস্ত্র অধৌত অবস্থায় দেবতাকে পর্য্যন্ত পরিধান করাইয়া থাকেন। ইংরাজি বিদ্যামন্দিরে এক জন নম্বুরী ছাত্র প্রবিষ্ট হইলে, তাহা বিদ্যালয়ের বিশেষ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয়। এ দেশে ক্রমশঃ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হেতু রাজকীয় কর্ম্মে দ্রাবিড়দিগকে নিযুক্ত না করিয়া, যাহাতে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা

হয়—এই মর্ম্মে সম্প্রতি রাম রাজার নিকট আবেদন করা হইয়াছে। এ দেশে ব্রাহ্মণজাতিকে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেরলে বিবাহবন্ধন অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশে মহিলাগণকে দক্ষিণাপথের নিয়মবিরুদ্ধ অবরোধ-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মুসলমানগণ কহেন, বিদেশীয় লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কুর্গপর্ব্বতবাসিনী মুসলমান রমণীগণ অদ্যাপি অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন না। অধিকন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে নারীযোদ্ধা দৃষ্ট হয়। আর্য্যাবর্ত্তবাসিনী-দিগকে অনুকরণলালসাপরিতৃপ্তির জন্য অথবা প্রয়োজনবশে আবরণ ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। কেরলী ব্রাহ্মণী লোকান্তরালে অবস্থিতি করায় অন্তর্জনা নামে প্রসিদ্ধ।

মলিয়ালীগণের মতে শঙ্করাচার্য্য নম্বুরী ছিলেন। তিনি বদরিকাদ্রিতে কোনও ব্যাসের সহিত বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, স্বদেশের আচারসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পরশুরামসংস্থাপিত নিয়মে উপেক্ষা করিলেন। সংস্কারকেরা সকল দেশেই সাধারণের নিগ্রহভাজন হইয়া থাকেন। শঙ্করা-চার্য্যের অন্তরঙ্গগণও তাহার বিরোধী হইলেন। শঙ্করকে সমাজচ্যুত করিয়া, শূদ্রজাতিকে তদীয় সেবা হইতে বিরত করা হইল ; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে আচা-র্য্যের ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য হইয়াছে। তাঁর অনুশাসনবলে এক্ষণে অন্তর্জনাগণ বক্ষঃস্থল আবৃত করেন। ভট্টির-উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের কামিনীগণ অদ্যাপি তামিল-প্রণালীতে বস্ত্রপরিধানপ্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। পরপুরুষের মুখ-দর্শন নিষিদ্ধ থাকায় বহির্গমনকালে তালপত্রের ছত্র অন্তর্জনাদিগের সমভি-ব্যাহারে থাকে ; অগ্রবর্ত্তিনী নায়ার দাসী সতর্ক করিয়া দিলে, তাহারা আত-পত্র দ্বারা মুখাবরণ করেন। এ দেশে দেবতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখীন হইলে, পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই গাত্র অনাবৃত করা বিধি। পুরুষের পক্ষে গাত্র বস্ত্র কটিদেশে বেষ্টন করা সম্মানপ্রদর্শনের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত। এ রীতি কি দেশের শৈত্যহীনতার ফলে উদ্ভূত নহে ?

এ দেশে দাম্পত্যনিয়মলঙ্ঘনের দণ্ড অতি কঠিন। দোষ প্রমাণিত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে জাতিচ্যুত হইতে হয়। অপরাধের প্রমাণাভাব ঘটিলে মীমাংসক সাধ্বীর চরণে প্রণিপাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই প্রক্রি-

য়ার নাম—"ক্ষমানমস্কারম্"। তদনন্তর "শুদ্ধিভোজনম্" করাইতে হয়। নম্বুরিগণ অন্তর্জনাকে ব্যভিচার স্বীকার করাইবার জন্ত অসম্পূর্ণ আহার দিয়া বা ধনের প্রলোভন দেখাইয়া, বৎসর-ব্যাপী বিচার-বিড়ম্বনা, কুটুম্ব রাজপ্রতিনিধি ও স্মার্ত্তবর্গের ভোজ্যান্নব্যয় প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। নারী দোষ স্বীকার করিলে এক জন নায়ার-পুরুষ তাহার মুখাবরক ছত্র গ্রহণ ও উপস্থিত জনগণ করতালি প্রদান করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অপবিত্রতা অধিকতর ঘৃণ্য। তাহার কারণ কেবল পুরুষের প্রাধান্য নহে, নারীকে গর্ভধারণ করিতে হয়, তদুৎপন্ন সন্ততির উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে।

জনকের অপেক্ষা জননীর যত্ন সন্তানের জীবনরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তাই উদ্দাম স্ত্রী-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ইউরোপেও অনূঢ়া যুবতী একাকিনী ভ্রমণ করিতে অনুজ্ঞাত হন না, এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাদিগের স্বানুবর্ত্তিতা চলে না। রমণীর সতীত্বরক্ষার জন্য কঠোর বিধি না থাকিলে মলয়ারে ব্রাহ্মণের পক্ষে পুত্রপর্য্যায়ে বংশপ্রণালী কদাচ রক্ষা পাইত না।

এই স্বেচ্ছাচারিতার দেশেও বিবাহকে "কল্যাণম্" কহে। বর হস্তে সূত্র বন্ধন করিয়া বংশদণ্ড পরিগ্রহ করতঃ দেহরক্ষক সমভিব্যাহারে পাত্রীর বাটীতে উপস্থিত হন। দ্বারদেশে বৃষলী ব্রাহ্মণীর বেশে বরকে স্বাগতসম্ভাষণ ও আরতি করিয়া অষ্টবিধ বশীকরণক্রিয়া সম্পাদন করেন। বরকন্যার আহার হইলে পাত্র বংশদণ্ড পুনর্গ্রহণ করেন, এবং পাত্রী দর্পণ ও ক্ষৌর হস্তে লন। অতঃপর কন্যার পিতা বরের পাদপ্রক্ষালন করেন। অবরোধপ্রথার কঠোরতাবশতঃ নম্বুরীদিগের মধ্যে কন্যার মাতা বরের সম্মুখীন হইতে পারেন না। কাজেই কোন নায়ার-রমণী কন্যার মাতার প্রতিনিধিরূপে বরকে পুনরায় আরতি করেন। বর সভায় উপনীত হইলে কন্যা তাহার পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া গলদেশে মাল্য সমর্পণ করেন। তার পর শুভদৃষ্টি। মহিলাগণ যবনিকার অন্তরাল হইতে উলুধ্বনি করিতে থাকেন। কন্যার পিতা দুহিতার হস্ত যৌতুক সহ বরের করে সমর্পণ করেন। বরকন্যা সপ্তপদগমনানন্তর উপবিষ্ট হইলে হবন করিতে হয়। সেই দিবসেই কন্যাকে শ্বশুরগৃহে যাইতে হয়।

চতুর্থ দিবসে একটি কক্ষে সিতবস্ত্রোপরি ধান্যের স্তূপ করিয়া পান সুপারি রাখা হয়। অপর পার্শ্বে মছলন্দ মাদুরের ন্যায় শয্যা বিস্তৃত থাকে। তাহার

চতুষ্পার্শ্বে ধান্যের আলি দেওয়া হয়। নব দম্পতি সেই শয্যা গ্রহণ করিলে পুরোহিত বহির্দ্দেশে গর্ভাধানের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। পঞ্চম দিনে বর হস্তস্থিত মঙ্গলসূত্র ও বংশদণ্ড পরিত্যাগ করিলে অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়। পয়ন্থর-গ্রামবাসী নম্বুরীদিগের কুলে ভাগিনেয়-গত উত্তরাধিকারপ্রথা বর্ত্তমান আছে বলিয়া নম্বুরী সম্প্রদায় ঐ বংশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে পতিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের উদ্বাহসংস্কারকালে স্ত্রী-আচারের সময় জায়াপতির কোন সরোবরে গমন করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মৎস্য ধৃত করিবার প্রথা আছে। তদ্দর্শনে পাশ্চাত্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পরশুরাম ধীবরের হস্তস্থিত জাল গ্রহণ করিয়া সূত্রনিষ্কাশনান্তে তদীয় স্কন্ধে আরোপ করিয়া উপনিবেশী ব্রাহ্মণের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, নাগ দেবতার উপদ্রবে উপনিবেশী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ একবার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমি শ্রীরঙ্গমে অগ্র-শিখাধারী ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়াছি; বোধ করি, তাঁহারা প্রত্যাবৃত্তদিগের বংশ-ধর হইবেন। জনৈক সদাচারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, এক রাজা প্রতিযোগিতাপরবশ হইয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন। সন্নি-কটে তৎপরিমিত ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অন্বেষণকারিগণ ক্ষেত্রস্থ মঞ্চোপরি সমাসীন অপর বহু ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। নরপতি তাহা-দিগকে ব্রাহ্মণবৎ সমাদর করিলেন। ইহাতেই তরুয়া পাঁড়ে ও মাচুয়া পাঁড়ে প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়। তৎশ্রবণে তীর্থজীবী সাদৃশ্য দিলেন, উৎকলবাসী হলচালননিরত পনিয়ার ব্রাহ্মণ তদ্রূপ। বৃক্ষস্থাপন হেতু অদ্যাপি পূর্ব্ববাঙ্গালায় নৌকাযোগে আগমন করায় "ভরার মেয়ে" নামে খ্যাত কন্যার পাণিগ্রহণের রীতি আছে। "ভাদ্র মাসে যে চর্ম্ম শুষ্ক হইতে চারি দিন অতিবাহিত হয়, শ্রাবণে তাহা তিন দিনে শুকায়,"—এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ননন্দার সন্দেহ হয়, তবে কি বধূ চর্ম্মকারদুহিতা? ভট্টনারায়ণের পুত্রের নাম বারেন্দ্রমতে আদিগাই ওঝা। ওঝা উপাধিদৃষ্টে অনুমিত হইবে, তদীয় পিতা কান্যকুব্জ হইতে না আসিয়া মিথিলা হইতে আগমন করিয়া থাকিবেন। আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারা ৮২১ বৎসরে ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান জনসংখ্যা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্ম-

পাল কর্ত্তৃক নারায়ণভট্টকে প্রদত্ত দানপত্রে লিপিব্যবসায়ী জ্যেষ্ঠ কায়স্থের পদ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, কনোজ হইতে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও সমভিব্যাহারী কায়স্থ ভৃত্যপঞ্চকের আগমন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। অথবা তদতিরিক্ত আদিপুরুষ স্বীকার্য্য।

কন্যাকুমারী হইতে গোনর্দ্দ (গোয়া) পর্য্যন্ত কেরল। তদনন্তর কঙ্কণ বেলাভূমির প্রারম্ভ। কেরলের ন্যায় কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরশুরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত উক্তবংশে পেশোয়া জন্ম গ্রহণ করায় চিত্তপাবনগণ মহারাষ্ট্রীয় সমাজে ধন্য হইয়াছেন। ত্রিপুণীথুরাতে আমরা যে অযাচিত বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনি কহেন, আমি তোমাদিগকে পূর্ণত্রয়ীশের সম্মুখীন করিতে অক্ষম। আমি কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ, সুতরাং এতদ্দেশে ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইতে পারি না।

পূর্ব্বকালে এখানকার পোলিয়ার এবং চেরুমার জাতি ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইত। পুরুষের মূল্য ১৪৲ টাকা ও স্ত্রীর ৭৲ টাকা ছিল। ক্রীতদাসের সন্ততি প্রভুর সম্পত্তিমধ্যে গণ্য হইত। অন্যের দাস দাসী আবশ্যক হইলে প্রভুরা তাহাদিগকে ভাড়া দিতেন। কিন্তু ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রসাদে দাস মতান্তরে দীক্ষিত হইলে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া বেতন পাইবার অধিকারী হইত। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ মানব-লীলা সংবরণ করিলে নিকটস্থ শূদ্রদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়; তাহারা উপস্থিত হইয়া উদ্যানস্থ আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া বাটীর দক্ষিণভাগে চিতা সজ্জিত করিয়া আপনাদের আদরণীয়তা রক্ষা করেন।

থিয়ার জাতি সাধু, নারিকেল ও তাল বৃক্ষের রসসংগ্রহ ও তাহা হইতে খণ্ডশর্করা প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। অধুনা তাহারা দেশস্থিতি রীতি প্রকরণে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে। পাঁচ লক্ষ থিয়ারের মধ্যে দশ জনমাত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে কয়জনের অদ্যাপি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাহাদিগের সংস্পর্শে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু থিয়ার পণ্ডিত যদি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া খৃষ্টানোচিত নামে অভিহিত হয়, তবে তাহার রাজকর্ম্ম পাইবার বাধা হয় না। ইতরজাতীয় ব্যক্তি মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হইলে তাহার নিকৃষ্ট ভাব অপনোদিত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যে অন্ত্যজের ছায়ায় দশ হস্ত ব্যবধানের মধ্যে পদক্ষেপ করিলে অশুচি হন, তিনি উহাকে অভিবাদন করিতে কুণ্ঠিত হন

না। বোধ হয়, এই কারণে দক্ষিণভারতে অষ্টত্রিংশবৎসরব্যাপী কালের মধ্যে সব লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়াছে।

থিয়ারগণ সিংহল বা ভারতমহাসাগরস্থ অপর কোন দ্বীপ হইতে এখানে আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কথিত আছে, উহারা নারিকেল তরু এ দেশে প্রথম আনয়ন করে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সাগরের বিপরীত-স্রোতবাহিনী তরণীতে মালয় (*Malay*) দ্বীপের আচরণ এই মলয় প্রদেশে আনয়ন করা অসম্ভব নহে।

সুমাত্রা দ্বীপে "সমন্দেই" অর্থে মাতৃত্ব, ও কেরলে "সম্বন্ধকারী" শব্দে পত্নীত্ব বুঝায়। উভয় শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিতে বোধ হয় ক্ষতি নাই। সুমাত্রায় (মালয়ে) গৃহস্থালীতে কেবল "সমন্দেই"গণ বসতি করেন। সে দেশেও পুত্র কন্যা ও কন্যার সন্ততি লইয়া পরিবার গঠিত হয়। পতি আপনার স্বতন্ত্র ভবনে বাস করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সন্তানগণকে দেখিতে আসেন ও পত্নীর কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা, ভগ্নী বা ভগ্নীর সন্তানেরাই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, আপন সন্তানেরা কিছু পায় না। ভার্য্যার সহোদর ভাগিনেয়ের ভরণপোষণের ভার লয়, মাতামহী সর্ব্বোপরি কর্ত্রীত্ব করেন। এই পদ্ধতি কেরলের "তারয়াদের" "মরুমক্কতায়ম্" প্রণালীর অনুরূপ সন্দেহ নাই। বোধ হয় আদিমকালে অনেক স্থলে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান না থাকায় প্রথমতঃ নারীপর্য্যায় বংশপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। কালক্রমে বিবাহপদ্ধতি স্থাপিত হইলে পুরুষপর্য্যায় আরব্ধ হইয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসীরা ইদানীং নারীপর্য্যায় রহিত করিবার সংকল্পে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে; তাহাতে পতিগৃহবাসিনার পুত্রসন্তানপরম্পরায় উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তে। আমেরিকার কালি ফর্ণিয়াসীমান্তে অদ্যাপি আদিম অধিবাসীদিগের জাতিবিশেষে স্বামী ভার্য্যার পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করে; নিতান্ত যোগ্রহীন না হইলে প্রণয়িনী নায়ককে প্রত্যাবৃত্ত করেন না। এরূপ অবস্থায় উত্তরাধিকার নারীপরম্পরাগত থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্সল্যাণ্ডবাসী কোন কোনও বন্যজাতি যে রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহারই স্বজাতি হইয়া পড়ে। এইরূপে পুত্র বিজাতীয়ত্ব লাভ করিলে উভয় জাতিতে যদি সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন পিতা পুত্রের নিধন সাধন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না

আর্য্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যেমন অনার্য্য বংশ আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তেমনই মুসলমানদিগের অভ্যুদয়সময়ে এক মৎস্যজীবী জাতির সমগ্র লোক ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বহুপত্যাত্মক বিবাহপ্রথার ফলে এ দেশে বৈদেশিক খৃষ্টান ও মুসলমান পুরুষের সংস্রবে দেশীয় নীচকুলোদ্ভূতা নারীর গর্ভে নাজারা ও মুপ্লালা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ জোনমুপ্লা ও খৃষ্টানেরা নসরানীমুপ্লা নামে বিখ্যাত। পোর্ত্তুগীজদিগের আগমনের পূর্ব্বে সিরীয খৃষ্টানেরা হিন্দু আচার পালন করিত। তাঁহারা গোমাংসভক্ষণেও বিরত ছিল, তাহাতে এ দেশে উহারা পঞ্চম বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষণে বৈদেশিক আচারের প্রতি অধিক অনুরক্ত হওয়ায় তাহাদিগের সে সুযোগ অন্তর্হিত হইয়াছে।

এ দেশে খৃষ্টানেরা পণ্যজীবী। ত্রিচুরে কেহ রবিবাসরে গতাসু হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সে দিন বস্ত্রক্রয় করা অসম্ভব হয়; খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মুপ্লাই কৃষিকার্য্যনিরত। ইহাদিগের মধ্যে ভাগিনেয় দায়াদমধ্যে গণ্য। উত্তর মলয়ার নিবাসী মুপ্লারা মুসলমান প্রথানুযায়ী উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়। মুসলমানের অত্যাচারে কোন কোন স্থানের বসতি উৎসাদিত হইয়া বনে পরিণত হইয়াছে। মুপ্লাগণ অতীব হঠকারী। যেমন পঞ্জাবে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে শিখমতের উৎপত্তি হইয়াছে, বঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে যে প্রকারে ব্রাহ্মমতের প্রাদুর্ভাব হইল, তদনুসারে বৈদেশিক ধর্ম্ম দক্ষিণাপথে সাধারণ দেশীয় ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দেশ বিজাতীয়ের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে, পরের হৃদয়কে আপন হৃদয় করিতে পারা যায় না।

গান্ধার এক্ষণে আর আর্য্যদেশ নহে; সেইরূপ কেরলও আর অনার্য্যভূমি নাই। হিন্দুস্থানের পরিসর আর্য্যাবর্ত্তে হ্রস্ব হইয়া দাক্ষিণাত্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেইরূপ, হিন্দুধর্ম্ম অনৈসর্গিকতা পরিহার করিয়া যাহাতে নৈসর্গিকতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, তৎপক্ষে সহৃদয়গণের চেষ্টা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

স্মারক লিপি।

১২৯৯। ২৪ আশ্বিন। প্রয়াগ। শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায়—তারাপ্রসন্ন সান্ন্যাল ও চণ্ডীচরণ মজুমদার বান্ধবগণের সহিত বাস।

৩ কার্ত্তিক। ত্রিপতি। কোচি বেঙ্কট রাওর আতিথ্য গ্রহণ। শেষাচলে বেঙ্কট রাম দর্শন। পর্ব্বতোপরি অন্নপ্রসাদ গ্রহণে জাতিভেদ বিচার করা হয় না।

৬ কার্ত্তিক। কাঞ্চিপুরম। চোল রাজের নির্ম্মিত শিবকাঞ্চির বরদ রাজ বিগ্রহের সহস্র স্তম্ভ নামক মণ্ডপের বিচিত্র কারুকার্য্য দর্শন।

৭ কার্ত্তিক। মান্দ্রাজ। সমুদ্র তীরে ভ্রমণের রমণীয়তা ও হাইকোর্ট দর্শন।

২০ কার্ত্তিক। মহাবলিপুরম। প্রস্তর খোদিত শৈলমন্দির দর্শন।

২২ কার্ত্তিক। বেঙ্গলুর। কর্ণাট রাজের প্রাসাদ ও চিত্রশালিকা দর্শন। লাল বাগের সুন্দর দৃশ্য ও উকিল কৃষ্ণ স্বামীর সৌজন্য স্মরণীয়।

২৪ কার্ত্তিক। মহিসূর। চামুণ্ডা পর্ব্বত, গবর্ণর জেনারেলের আগমন উৎসব, হ্রদবক্ষে রঙ্গিন আলোকের প্রতিবিম্ব দর্শন ও দেউড়ীর সম্মুখে সৈনিক উৎসব বর্ণনীয়।

২৯ কার্ত্তিক। শ্রীরঙ্গ পত্তন। শ্রীরঙ্গের সুন্দর মূর্ত্ত। কাবেরী তীরে স্নানার্থ গমন; চন্দন কুঠি, দৌলৎ দরিয়া, উদ্যান ও ভগ্ন দুর্গ প্রাকার প্রধান দর্শনীয় বস্তু।

২ অগ্রহায়ণ। ত্রিচুর।

৪ অগ্রহায়ণ। কোচিন।

১২ অগ্রহায়ণ। ত্রিবন্দরম্। পদ্মনাভের আরতি দর্শন। চের রাজ মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য শেষশয়নকে সম্প্রদান করিয়াছেন। দক্ষিণার্ণব দর্শন। ত্রিভুবন মণ্ডপের ভাস্কর কার্য্যের সমৃদ্ধি মনমুগ্ধকর।

১৮ অগ্রহায়ণ মাদুরা। পাণ্ড্যরাজ তনয়া মীনাক্ষী ও জামাতৃ সুন্দরেশের

অপূর্ব্ব বিমান সমাবৃত দেবস্থানের মাসিক আয় ৬৫০০। নগরবাসী কর্তৃক মন্দিরের ট্রষ্টি নিয়োগ হয়। নরসিংহ আইয়ঙ্গরের সৌজন্য ও লক্ষ দীপোৎসব দর্শন।

২৯ অগ্রহায়ণ। রামেশ্বরম্। পাম্বন সমুদ্র। গন্ধমাদনের উপর হইতে চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত দ্বীপের শোভা ও রামনাথের আরতি দর্শন।

৩ পৌষ। মদুরা। টেপ্পকোলমে ভ্রমণ।

৭ পৌষ। ত্রিচিনাপলি। শ্রীরঙ্গম্ সপ্তপ্রাকার, জম্বুকেশ্বর বা আপো-লিঙ্গ দর্শনীয়।

৯ পৌষ। কুম্ভকোনম্। সারঙ্গ পাণির মন্দিরের গোপুরম্ সংলগ্ন অশ্লীলতা উদ্বোধক মূর্ত্তি দর্শন, সর্ব্বজ্ঞকে আমার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় তাহার অপারগতা প্রমাণিত হইল।

১০ পৌষ। মাদ্রাজ। চিনা পত্তন। আদ্রা দর্শন নামক উৎসবে উপস্থিতি। অন্নদাচারী পণ্ডিতের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা। গোপীনাথ ঠাকুরের সহিত চা পান।

২৩ পৌষ। সমুদ্র। ক্ল্যান্ মেকিন্টস্ আরোহণে কলিকাতা যাত্রা। কেবিনের পারিপাট্য প্রশংসনীয়। লণ্ডন হইতে আগত হিরাচাঁদ চিন্তামণি ও তাঁহার কন্যা মুখ্যা বাইয়ের সহিত আলাপ। উড্ডীয়মান মৎস্য দর্শন। অস্তকালে সূর্য্য যেন গলিয়া পড়িতেছেন বোধ হইল আলোকের তারতম্য অনুসারে সাগরের নীলবর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

২৬ পৌষ। স্যাণ্ড হেডস্ হইতে যাত্রা করিয়া বহুদিন পরে বাটী ফিরি-তেছি, সেই জন্য বাঙ্গালা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলাম।

সমাপ্ত।